Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কবিতার ভাষা

বিমলকৃষ্ণ মতিলাল
রোমান য়াকোবসন / ক্লোদ লেভি-স্ট্রাউস
শিশিরকুমার দাশ
মিখায়েল বাখ্‌তিন / পাভেল মেদভেদেভ
পবিত্র সরকার
য়ুরি লোৎমন
উদয় নারায়ণ সিংহ
অঞ্জন সেন
অমিতাভ গুপ্ত
প্রবাল দাশগুপ্ত

সম্পাদনা : অঞ্জন সেন । সম্পাদনা (ভাষাবিজ্ঞান) উদয় নারায়ণ সিংহ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

D 6948.

9 OCT 1996
J-176/124/1

FORWARDED FREE OF COST, AND WITH
THE COMPLEMENTS OF THE DEPARTMENT OF
EDUCATION, GOVT. OF INDIA, NEW DELHI

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কবিতার ভাষা

সম্পাদনা
অঞ্জন সেন
ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক সম্পাদনা
উদয় নারায়ণ সিংহ

গাঙ্গেয় পত্র
২৩৯ লেক রোড
কলকাতা-৭০০০২৯

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর, ১৯৮৬
শোভন সংস্করণ
প্রকাশক ঃ অঞ্জন সেন
গাঙ্গেয় পত্র, ২৩৯ লেক রোড, কলকাতা-৭০০০২৯

মুদ্রণ ঃ অমি প্রেস
৭৫ পটলডাঙা ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯

© গাঙ্গেয় পত্র

KAVITĀR BHĀSĀ (The Poetic Language) : Collection of Essays in Bengali on Poetics, Literary Theory and Poetic Language. Contributors :

Bimalkrisna Motilal, Sisir Kr. Das, Pabitra Sarkar, Udaya Narayana Singh, Probal Dasgupta, Roman Jakobson / Claude Lévi-Strauss, Mikhail Bakhtin / P. N. Medvedev, Yuri Lotman, Amitabha Gupta, Anjan Sen ; Terms & Definitions.

EDITED & PUBLISHED BY : Anjan Sen,
Editor : Linguistics—Udaya Narayana Singh
gaNgeo pOttro : 239 Lake Road,
Calcutta-700029.

Price : 30/-
দাম ঃ তিরিশ টাকা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সূচীপত্র

বিমলকৃষ্ণ মতিলাল

কাব্যের ভাষা-বক্রোক্তি ৫

শিশিরকুমার দাশ

কবিতার ভাষা : বিপ্রতীপ ক্রম ৯

প্রবাল দাশগুপ্ত

গদ্যের কড়া হাতুড়ি ১৮

অঞ্জন সেন

কবিতার ভাষা—কয়েকটি সূত্র ৩৪

অমিতাভ গুপ্ত

ন্যগ্নে নব্যসা বচস্তনূষু শংসমেষাম্ ৬৪

উদয় নারায়ণ সিংহ

কবিতার ভাষাতত্ত্ব এবং আজকের বাংলা কবিতা ৭৭

য়ুরি লোৎমন

বহুমুখী শৈল্পিক সংকেত প্রণালী ৯৮

রোমান য়াকোবসন / ক্লোদ লেভি-স্ট্রাউস

শার্ল বোদল্যেয়রের লে শা ১০৬

পবিত্র সরকার

শৈলীবিজ্ঞানী স্ট্রাকচারালিস্ট প্রাগ্‌ ভূমিকা ১২৭

মিখাইল বাখ্‌তিন / পাভেল মেদভেদেভ

কবিতায় ধ্বনির সমস্যা ১৩৫

পরিভাষা/সংজ্ঞা ১৪২

লেখক পরিচিতি ১৪৬

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কৃতজ্ঞতা Acknowledgements

Prof. Claude Lévi-Strauss
Prof. Jurij Lotman
Prof. Albert J. Wehrle
The Johns Hopkins University Press, Baltimore.
Prof. I. R. Titunik
Prof. Ralph Cohen
New Literary History (Journal)
Prof. Michael Riffaterre

গণেশ পাইন
প্রবাল দাশগুপ্ত
বীরেন্দ্র চক্রবর্তী
অমিতাভ গুপ্ত
অম্লান দাশগুপ্ত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রাক্‌ভাষ

যেসব সমালোচকের থলেতে থাকে কিছু বিশেষণ মাত্র, কবিতার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ বা রীতিগত অনুধাবন যাদের কাছে অশ্লীলতার পর্যায়বাক্‌, তাঁদের পক্ষে আজকের ক্রমবর্তমান কবিতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমালোচনা করা দিনকে দিন দুরূহ হয়ে উঠছে। আজকের কবিতা পাঠকদেরও পাঠের শ্রম, বোধের ঈপ্সা ও অনুভূতির দুমে রোহনের কষ্ট স্বীকার করতে শেখায়। প্রসবের বেদনার ভাগ কবির হলেও লালনের ভার থাকে পাঠকের ওপর ; কবিতার কথা, কথানক, ন্যাস, শিল্প, শব্দ—অর্থাৎ, কবিতার 'বিষয়'-ভার যদি কবির ওপর ন্যস্ত হয় তো তার 'আশয়'-বোধ বা অর্থায়ণের দায়িত্ব রয়েছে তার পাঠকের ওপর। যত দিন যাচ্ছে, একথা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে কবিতার ভাষাতত্ত্ব (যার মধ্যে পড়বে কবিতার সমাজভাষাতত্ত্ব ও কবিতার শৈলীবিজ্ঞান) সম্ভবও বটে এবং বোধ করি অপরিহার্যও। ভারতীয় সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে একথা আরেকবার ঝালিয়ে নেয়া বোধ হয় অনুচিত হবে না যে আমাদের একই সঙ্গে বিদেশী চিহ্নবিজ্ঞানী ও সাহিত্যতত্ত্ববিদদের কাজ নিয়েও আলোচনা করতে হবে এবং একটা স্বকীয় স্বতন্ত্র ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্ব গড়ে তুলতে হবে। কিছুটা এইসব উদ্দেশ্য নিয়েই দীর্ঘ দিনের প্রস্তুতির পর 'কবিতার ভাষা' প্রকাশিত হলো।

এই সংকলনে কবিতার ভাষা নিয়ে রচিত সাতটি মূল ও তিনটি অনুবাদ-নিবন্ধের মাধ্যমে কবিতার পশ্চিমা ও পূরবী ভাষাতত্ত্ব ও কাব্যালোচনা হয়েছে সন্নিবিষ্ট। যেমনটা বিজ্ঞানের নিয়ম—যতোটা উত্তর আছে তৈরি, প্রশ্ন তুলতে হবে তার থেকেও বেশি, মৌলিক ও বহুবিধ। এখানে তাই আমরা দেখছি কবিতার ভাষাতত্ত্ববিষয়ক এবং বিশেষ করে বাংলা কবিতার ভাষা নিয়ে তোলা হয়েছে অনেকগুলি প্রশ্ন।

যেমন, বাক্যেবাক্যে ঘর্ষণে ও মিলনে আছে গদ্য ভাষার শক্তি এবং পদ্যে আছে বর্তন ও চরণগ্রন্থির চপলতা—এমন পার্থক্য-নির্দেশ কি অতি-সরলীকরণ? (দ্রঃ প্রবাল দাশগুপ্ত ঃ গদ্যের কড়া হাতুড়ি) কবিতা নিরাভরণা হোন কি সালংকারা, বাচের বক্রতাই কি তার প্রাণ ভ্রমর? (দ্রঃ বিমলকৃষ্ণ মতিলাল ঃ কাব্যের ভাষা—বক্রোক্তি) কবিতার ভাষার পদক্রম কি গদ্যভাষার বিন্যাসের তুলনায় বিপ্রতীপ, নাকি এই প্রত্যনীকতা বিশেষ করে উত্তর-আধুনিক গদ্যরীতিরও বৈশিষ্ট্য? (দ্রঃ শিশিরকুমার দাশ ঃ কবিতার ভাষা ঃ বিপ্রতীপ ক্রম) কাব্য কি নিগড়ে গড়া যার গুণই হলো 'বিশৃঙ্খলং শৃঙ্খলকা প্রতস্থিরে'? আর সেই তুলনায় কবিতা কি প্রচলিত ছন্দ ভাঙার শিল্প? কবিতা কি নীরবতার অধিরাজ, ভাষিক

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
চিহ্ন ব্যবহার করেও যা উপালক্ষিত অচিনভূমি—'না চিহ্নে মানুখ, নিমিখ নাই'? ব্যক্তিভাষার শব্দে আকরণই কি কবিতার ভাষার চরিত্রগুণ? এখনকার বাংলা কবিতার ভাষা কি 'আরোপিত লালিত্যময়তা'র হাত থেকে মুক্ত হতে শিখেছে? (দ্র. অঞ্জন সেন : কবিতার ভাষা—কয়েকটি সূত্র)।

ভাষা কি 'যাদূঈ চিরাগ' যার মোহ-ঈষায় কর্ষিত হবে সাহিত্যের অস্পৃষ্ট জমি যা হতে জন্ম হবে নতুন প্রজন্মের কবিতা? এও কি আশ্চর্যের নয় যে এই একই ভাষায় জীর্ণযৌবন কবিকুল আজও কবিতার নামে ছন্দমেঘ গড়ে তোলেন; ভাষায় ও ভাবে চারভাগের দেড় ভাগ যৌনতা, আধখানা বিদ্রোহ, তিন পোয়া তেল আর সোয়াভাগ হতাশা মিশিয়ে? আজকের বাংলা কবিতায় কি এমন স্রোতও আছে যা এই উচ্ছিষ্ট আধুনিকতা থেকে আছে বহুদূরে? (দ্র. অমিতাভ গুপ্ত : ন্যগ্নে নব্যসা বচস্তনূষু শংসমেষাম্)।

কবিতা যদি হয় ব্যক্তিভাষার জায়া এবং সংগঠনতত্ত্ব যদি বিজ্ঞানভিত্তিক তত্ত্ব কিংবা জ্ঞানাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি, তাহলে নৈর্ব্যক্তিকতার ফিতে দিয়ে ব্যক্তিশিল্পের পরিমাপ কিভাবে সম্ভব? সাহিত্য, বিশেষ করে কবিতাকে যদি ভাষার একটি নির্মিতি বলে মনে করি তাহলে ভাষাবিজ্ঞানে ভাষাবিচারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-বিশ্লেষণকেও অপরিহার্যরূপে বিচার্য বিষয় বলে মনে করা উচিত কি না? প্রবহন যদি কথাবার্তার ভাষার মুখ্য চরিত্র হয় এবং প্রমুখনকে যদি কবিতার ভাষার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে মনে করি, তাহলে প্রশ্ন ওঠে: এই প্রমুখনের মূল নীতি কি? (দ্র. পবিত্র সরকার : শৈলীবিজ্ঞান : স্ট্রাকচারালিস্ট প্রাগ্ ভূমিকা) সাহিত্যকে ভাষারই রূপবিশেষ ও সম্প্রসারণ হিসেবে দেখলে ভাষাতত্ত্বের নানা নীতি ও সূত্রকে সাহিত্যতত্ত্বের ও সাহিত্য-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। অতএব, প্রশ্ন ওঠে, কবিতার ভাষাতত্ত্ব সম্ভব ও জরুরী কি না? সাহিত্যবিচার করতে গিয়ে কি আজ স্রষ্টামানসের গঠন এবং সর্জনপ্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণকেও গ্রহণ করবো না? পাঠক ও কবিকে পরস্পরের কতোটা কাছাকাছি আনা যায় এবং কবিতার রচনা ও পাঠের উপভোগে দুজনেরই কতোটা দায়িত্ব, সে বিষয়েও কি আমাদের সচেতন হওয়া দরকার নয়? জানা দরকার নয়, মহান শিল্প-সাহিত্য নির্মিতির পিছনের ছবিটা ঠিক কেমন? কবিতার ছাত্রের পক্ষে বাগর্থতত্ত্বের নাভিমূলে প্রবেশ প্রয়োজন কি না? সবচেয়ে বড়ো কথা, কবিতায় কি রূপ ও অর্থের বিন্যাসের সন্তুলন একান্তই আবশ্যক, নাকি নৈরাজ্যও এক ধরনের সার্থক কবিতা হতে পারে? (দ্র. উদয়নারায়ণ সিংহ : কবিতার ভাষাতত্ত্ব এবং আজকের বাংলা কবিতা)।

যেকোনো ভাষার বা ভাষাবহির্ভূত অর্থহীন ধ্বনিপ্রবাহও আনন্দদায়ী; তবে কথাবার্তার ভাষায় ধ্বনির ভূমিকা যেমন অর্থবোধের সহায় মাত্র, কবিতায় ধ্বনির গঠনগত তাৎপর্যের সূত্রায়ন কিভাবে সম্ভব? (দ্র. মিখাইল বাখতিন / পাভেল মেদভেদেভ : কবিতায় ধ্বনির সমস্যা) সাহিত্যকর্ম মানেই কি কৃতিতে পাঠকের আবিষ্করণ, অথবা কবিতা কি সেই ঘটনা যা তখনই ঘটে যখন একজন পাঠক কবিতা পড়েন। কবিতার ভাষা ও কবিতা কি সম্পূর্ণরূপে মানসিক বিষয়বস্তু

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
না কি তা রয়েছে বহিপৃথিবীতেও? পাঠক-কবি বা গ্রাহক প্রেরকের ভাষার সংঘর্ষে জয় হয় কার, পরাভব কোন জনের? একটি শিল্পিত কৃতিতে সৃজনের অনিশ্চয়তার পরিমাপ কিভাবে সম্ভব? (য়ুরি লোৎমন: বহুমুখী শৈল্পিক সংকেত প্রণালী)

শুধু একটি অনুবাদ নিবন্ধেই নেই প্রশ্ন; রোমান য়াকোবসন ও ক্লোদ লেভি স্ট্রাউসের বোদলেয়র বিষয়ক নিবন্ধ একটা আকরণবাদী সাহিত্য বিশ্লেষণের আদর্শ উদাহরণ রূপে রাখা হলো। আশাকরি, আগামী দিনে আমরা ইউরোপ, আমেরিকা এবং এশিয়ার অন্যত্র যেসব সাহিত্যতত্ত্বের স্কুল বা গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে, যেমন মস্কো স্কুল, প্রাগ স্কুল, প্যারীর স্কুল, এস্তোনিয়ার তাতু বিশ্ববিদ্যালয় গোষ্ঠী, বেলজিয়ামের লিজে বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউ গোষ্ঠী কিংবা জর্জ লেকফ দ্বারা অনুপ্রাণিত আমেরিকার পোয়েট্‌স এ্যাণ্ড লিংগুইস্টস পত্রিকা গোষ্ঠী—এঁদের সঙ্গে নব্য ভারতীয় ভাষায় যে ধ্রুপদী কাব্যতত্ত্ব গড়ে উঠেছে তার সংযোগ-স্থাপন করে বাংলা শৈলীবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন কাজের ধারাপাত করতে পারবো। আপাতত এই নিবন্ধ-সংকলন সেইসব তরুণ ও অজাত কবি-আলোচকদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হলো যাঁরা সৃষ্টির আগুনে নিজেদের দগ্ধান, দগ্ধাবেন এবং যাঁরা আবহমান কাল থেকে বলে এসেছেন—ন্যগ্নে নব্যসা বচস্তনূষু শংসমেষাম; হে অগ্নি, আমাদের জন্য নতুন কবিতা রচনা কর।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিমলকৃষ্ণ মতিলাল

কাব্যের ভাষা-বক্রোক্তি

কুন্তক তাঁর 'বক্রোক্তিজীবিত' গ্রন্থে বলেছেন যে 'শাকটিক বাক্য' সমূহ দিয়ে কাব্য তৈরি হয় না। 'শাকটিক বাক্য' অর্থাৎ শকট চালকের বাক্য বা ভাষা যাকে আমরা চলিত কথায় 'গাড়োয়ানের ভাষা' বলতে পারি। 'গাড়োয়ানের ভাষা' কথাটার মধ্যে বোধহয় একটা অবজ্ঞার ভাব আছে। আমাদের মার্কসীয় পণ্ডিতেরা এখানে বুর্জোয়া শ্রেণী কর্তৃক শোষণ ও উৎপীড়নের চিত্র খুঁজে পাবেন। গাড়োয়ান অর্থাৎ গাড়ি চালায় যারা তারা নিঃসন্দেহে সমাজের অনেক উপকার করে, তাদের ভাষা কাব্য তৈরির উপযুক্ত নয় একথা বলে তাদের আমরা বঞ্চিত রাখতাম এবং তার ফলেই রচিত কাব্য ও সাহিত্য বিশ্বজনীন হয়ে ওঠে নি। এ ধরনের সাহিত্য ছিল শাসকগোষ্ঠীর হাতে শোষণের যন্ত্র। আরো এগিয়ে গিয়ে হয়ত বলা যায় এ ধরনের কাজ তত্ত্বসমীক্ষা আজকের যুগে অচল ও নিষ্প্রয়োজন।

'শকট চালকের ভাষায় কাব্য হয় না'—এই একটা উক্তির উপর নির্ভর করে সমাজতত্ত্ব ও রাজনীতিতত্ত্বের এত বড় একটা 'থিয়োরি' বা মতবাদের মাধ্যমে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ হয়ত ক্ষুরধার বুদ্ধির পরিচায়ক হতে পারে কিন্তু কুন্তকের আশয় বোধহয় তাতে মোটেই পরিষ্কার হয় না। ধরে নেওয়া গেল কুন্তক দশম বা একাদশ শতকের লেখক। প্রাচীন যুগে এবং কুন্তকের যুগেও যে শ্রেণীশোষণ প্রভৃতি চলত না তা নয় বরং শ্রেণী-বিভাগ ও বর্ণাশ্রমশাসিত সমাজ বোধহয় পুরো মাত্রায় বর্তমান ছিল। কিন্তু তার পরিপ্রেক্ষিতে কুন্তকের এই উক্তির আলোচনা করলে মনে হয় কিছুটা সত্যের অপলাপ হবে। কারণ কুন্তক 'শকট চালকের বাক্য' বলতে ঠিক শকট চালকের বাক্যকেই বোঝান নি। মনে হয় যারা শকট চালায়, যারা ধান রোপণ করে, যারা অন্যরকম শ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জন করে তাদের প্রতি কুন্তকের কোন বিশেষ বিদ্বেষ ছিল না (অবশ্য শ্রেণী-শাসিত সমাজে কোন সামান্য বিদ্বেষ বা বিতৃষ্ণা নিম্নশ্রেণীর প্রতি উচ্চশ্রেণীর থাকতেও পারে, তার কথা বলছি না)। কুন্তক শুধু বলতে চেয়েছেন যে সাধারণভাবে সাধারণ বিষয় নিয়ে আমরা অর্থাৎ জনসাধারণেরা যে ভাষায় আলোচনা চালাই কাব্যের ভাষা তার থেকে স্বতন্ত্র। ঠিক চলতি কথাবার্তা থেকে কাব্য বা কবিতা হয় না। সংবাদপত্রের বিবরণ থেকে সাহিত্যের রচনা পৃথক। এমনকি 'শাকটিক বাক্য' থেকেও কাব্য রচনা হতে পারে যদি বিশেষ পরিবেশের মধ্যে সেটি নিবিষ্ট হয় এবং তাতে 'প্রকরণ বক্রতা' (নিম্নে দ্রষ্টব্য) থাকে। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের পঞ্চম অঙ্কের বিস্কম্ভকে দেখা যায়, জেলে পুলিশ দারোগা প্রভৃতির বাক্যও উৎকৃষ্ট কাব্য রচনার (নাটককে সংস্কৃত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
আলংকারিকেরা দৃশ্যকাব্য বলে থাকেন) অঙ্গীভূত হয়েছে। কাজেই মনে হয় 'শাকটিক বাক্যে'র উল্লেখ করে কুন্তক শ্রেণীশোষণের সমর্থন করছিলেন (তখনকার সমাজে এটা মেনেই নেওয়া হত)—একথা না বলে, বলতে হবে কুন্তকের আশয় কি। দৈনন্দিন ব্যবহার্য ভাষা যাকে চলতি বাংলায় আমরা 'আট-পৌরে' ভাষা বলতে পারি তা থেকে কাব্যের ভাষা একটু স্বতন্ত্র বা পৃথক। এই পার্থক্যকে চিহ্নিত করে 'বক্রোক্তি'। কাজেই সেই বক্রোক্তিকে বলতে হয় 'কাব্য-জীবিতম্' অর্থাৎ কবিতার প্রাণ।

কুন্তকের বক্রোক্তিবাদটি আমাদের অলংকারশাস্ত্রের ঐতিহাসিক পটভূমিতে রেখে বিচার করা উচিত। সমগ্র অলংকারশাস্ত্রের ইতিহাসের বিবরণ দুরূহ ও দীর্ঘায়ত। তার অবতারণা এখানে অবান্তর হবে। পি. ভি. কানে, সুশীল দে প্রমুখ পণ্ডিতেরা এ সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেছেন, সুতরাং এ বিষয়ে তাঁদের গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। অলংকার-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতির সামান্য পরিচয় এখানে দিলেই চলবে।

অলংকারশাস্ত্রকে আমাদের দেশে 'লক্ষণশাস্ত্র' বলা হয়েছে। লক্ষণের একটা লক্ষ্য থাকে। ব্যাকরণকেও 'লক্ষণশাস্ত্র' বলা হয়। ব্যাকরণ-রূপ লক্ষণশাস্ত্রের লক্ষ্য শব্দ অথবা সাধু-শব্দ যা ভাষায় প্রয়োগ করা হয়। ব্যাকরণ এই অর্থে শব্দানুশাসন। ব্যাকরণের দ্বারা শব্দের অর্থাৎ ভাষায় প্রযুক্ত শব্দের সাধুত্ব অসাধুত্বের পরীক্ষা হয়। অলংকারশাস্ত্র সেই রকম লক্ষণশাস্ত্র, তার লক্ষ্য সাহিত্য বা কাব্য (শুধু কবিতা নয়) অথবা যাকে বলতে পারি 'কবিকর্ম'। 'কবিকর্মে'র বিচার অনুশীলন রসাস্বাদ আনন্দমীমাংসা—এই সবই সম্ভব হয় অলংকারশাস্ত্রের মাধ্যমে। কাব্যানুশীলনে তাই অলংকারশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা আছে, সাহিত্যপাঠে তাই সমালোচনা সাহিত্যের উপযোগিতা আছে।

এখন প্রশ্ন তুলতে পারা যায় যে ভাল করে ব্যাকরণ না জেনেও তো ভাষা জানা যায়। এমন অনেকে আছেন যাঁরা শুধু মাতৃভাষাই নয় অন্য ভাষাও ভাল ভাবে জানেন অর্থাৎ বলতে বা পড়তে পারেন কিন্তু ব্যাকরণের জ্ঞান তাঁদের নগণ্য। সেই রকম কাব্য যা সাহিত্যের রসাস্বাদনের জন্য, তা পড়ে আনন্দ পাবার জন্য সাহিত্যমীমাংসা বা সমালোচনা সাহিত্য পড়ার বা জানার প্রয়োজন কি? সাহিত্য পাঠ ও হৃদয় দিয়ে অনুভব করলেই তো চলবে। এমন কি অনেকে আরো এগিয়ে গিয়ে বলবেন—সাহিত্যের চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ যা সাহিত্যমীমাংসা বা অলংকার শাস্ত্রের বিষয়বস্তু তার হাতে পড়ে আসল সাহিত্যপুরুষের মৃত্যু ঘটে। বিশ্লেষণের শাণিত তরবারির আঘাতে সাহিত্যের অপমৃত্যু ঘটে। কাজেই 'লক্ষণশাস্ত্র' রূপ এই অলংকারশাস্ত্রের প্রয়োজনই নেই। তা না থাকলে সাহিত্যের রস আস্বাদনে বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয় না। ব্যাকরণের সূত্র ভুলে গেলেও যেমন আমরা ভাষা ভুলে যাই না, সেরকম অলংকারের সূত্র ভুলে গেলেও আমাদের সাহিত্যপাঠের ও রসাস্বাদনের কোন ক্ষতি হবার কথা নয়।

এই ধরনের যুক্তি কিছুটা সত্য আর কিছুটা বিভ্রান্তিমূলক। তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া গেল যে ব্যাকরণের সূত্রবিষয়ক জ্ঞানের অপরিহার্যতা নেই, তা ভালভাবে অর্থাৎ সচেতনভাবে না জেনেও ভাষা জানা যেতে পারে। অর্থাৎ দৃষ্টান্তটি আপাতত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মেনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু দার্ষ্টান্তিক অর্থাৎ যা প্রমাণের জন্য এই দৃষ্টান্তের প্রয়োগ তার মধ্যে ভুল আছে। অলংকারশাস্ত্রজ্ঞান নিরপেক্ষভাবে সাহিত্যের আলোচনা, অনুশীলন ও রসাস্বাদন চলতে পারে বটে, কিন্তু তাতে সাহিত্যসৃষ্টির আসল লক্ষ্য যা অর্থাৎ আনন্দদান তার একটা বড় অংশ বাদ চলে যায়। অলংকার-শাস্ত্র হচ্ছে আনন্দমীমাংসার শাস্ত্র। সাহিত্যমীমাংসার সূত্রগুলিকে না জানলে সাহিত্যপাঠের মুখ্য উদ্দেশ্যের বেশিরভাগই ব্যর্থ হয়। 'চর্বনা'কে সাহিত্য অনুশীলন থেকে আনন্দলাভের অন্যতম উপায় বলা হয়। সাহিত্যমীমাংসার শাস্ত্রজ্ঞান এই চর্বনার সামর্থ্য জোগায়। আসলে সাহিত্যপাঠের এবং সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য থেকে সাহিত্যমীমাংসাশাস্ত্রের অর্থাৎ অলংকারশাস্ত্রের উদ্দেশ্যকে একেবারে পৃথক করা যায় না। প্রাচীন সংস্কৃত আলংকারিকেরা তাই অলংকারশাস্ত্রকে কাব্য বা সাহিত্যেরই 'অঙ্গ' বলেছেন। সাহিত্যমীমাংসা বা সমালোচনাসাহিত্য সাহিত্যপাঠেরই সহায়ক।

সাহিত্যের প্রয়োজন যে আনন্দ—এ বিষয়ে প্রাচীনদের মধ্যে সকলেই প্রায় এক-মত ছিলেন। 'কাব্যং যশসে অর্থকৃতে শিবেতরক্ষতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে' ইত্যাদি সাহিত্যের নানা উদ্দেশ্যের বা প্রয়োজনের কথা বলা হলেও আনন্দ দান ও আনন্দ আস্বাদন 'সকল প্রয়োজনমৌলিভূত'। এর দাবি সর্বাগ্রে। এই আনন্দ দান ও আস্বাদনের মধ্যে সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও সাহিত্যমীমাংসা বা অলংকারশাস্ত্রের উদ্দেশ্য এক হয়ে গেছে। ব্যাকরণজ্ঞান নিরপেক্ষ ভাষাজ্ঞান হয়ত সম্ভব কিন্তু অলংকারশাস্ত্রের জ্ঞান ছাড়া সাহিত্যের পূর্ণ রসাস্বাদন সম্ভব হয়না। দুধের স্বাদের আশা হয়ত ঘোলে মিটতে পারে কিন্তু তাতে দুধের স্বাদ পাওয়া যায় না। চর্বনা ছাড়া রসাস্বাদন হয় না, পান বা ভোজন হয়ত চলতে পারে। অলংকারশাস্ত্রের বিশ্লেষণ বা সাহিত্য মীমাংসার লক্ষণ সূত্রগুলি সাহিত্যের সৌন্দর্যকে নষ্ট করে না বরং সেই সৌন্দর্য উপভোগের আনন্দকে বাড়িয়ে দেয়।

আনন্দ আমাদের একটা মানসবৃত্তি। এর গতি প্রকৃতি ভিন্ন ধরনের। নানা উপকরণের সহায়তায় এবং পারিপার্শ্বিকতার গুণে যেমন ভোজনের আনন্দ বাড়ে অলংকারশাস্ত্রের নানা আলোচনা বিশ্লেষণ বিচার বিতর্কের মাধ্যমে সেই রকম সাহিত্যের আনন্দ বৃদ্ধি পায়, উপভোগের ব্যাপকতা আসে। কাজেই অলংকার বা সাহিত্যমীমাংসার প্রয়োজন আছে।

কুন্তকের কথায় ফিরে আসি। বক্রোক্তিবাদ স্বভাবতই আমাদের তার বিরুদ্ধ মতবাদের কথা মনে করিয়ে দেয়। বক্রোক্তির সাধারণ প্রতিশব্দ স্বভাবোক্তি। বক্রোক্তি যদি 'বাঁকা কথা' হয় স্বভাবোক্তি হবে 'সোজা কথা'। প্রাক্-কুন্তক যুগে স্বভাবোক্তির আলোচনা হয়েছে। দণ্ডী প্রমুখ স্বভাবোক্তিকে একটি বিশেষ অলংকারের পর্যায়ভুক্ত করেছেন। স্বভাবোক্তি হচ্ছে ঘটনা বস্তু বা বিষয়ের যথাযথ বর্ণনা। দণ্ডী বলেছেন, "নানাবস্থং পদার্থানাং রূপং সাক্ষাদ্ বিবৃণ্বতী।" ফলত নিরাভরণ বর্ণনাই স্বভাবোক্তি। একে অলংকার বলাটা অনেকটা "সোনার পাথর-বাটি"র মতো। কিন্তু দণ্ডীর মতে যাতে কাব্যের শোভা বাড়ে তাই অলংকার, আর বামন বলেছেন—সৌন্দর্যই অলংকার। কাজেই সুন্দর বা মনোরম দৃশ্যের যথাযথ বর্ণনাতেও শোভা থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি? এইভাবেই দণ্ডী স্বভাবোক্তির

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
অলংকারত্ব সমর্থন করেছেন। বলেছেন এই ধরনের স্বভাবের আখ্যান শাস্ত্রের সর্বত্রই করা হয় বটে কিন্তু কাব্যেও এর স্থান আছে :

"শাস্ত্রেষ্বস্যৈব সাম্রাজ্যং কাব্যেষ্বপ্যেতদীপ্সিতম্।'

ভামহ স্বভাবোক্তিকে অলংকার হিসেবে মানতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তাঁর মতে এটা 'বার্তা' অর্থাৎ আধুনিক ভাষায় খবরের কাগজের খবর, কবিকর্মের মধ্যে এটা পড়ে না। ভামহ অবশ্য বক্রোক্তিকে অলংকারের প্রাণ বলেছেন—কবিকর্মের একটি মৌলিক গুণ-বক্রতা। কাজেই তাঁর কাছে বক্রোক্তি কোন বিশেষ অলংকার নয়, সকল অলংকারের সামান্য ধর্ম।

দণ্ডী তাঁর রচনার শেষ দিকে একটা সমাধান করেছেন :

"ভিন্নং দ্বিধা স্বভাবোক্তি বক্রোক্তিশ্চেতি বাঙ্ময়ম্।" ২।৩৬৩

কবিকর্ম দুভাগে ভিন্ন-স্বভাবোক্তি ও কবিকর্ম। কারণ কবি যখন স্বপ্রতিভাবলে স্বভাবের বর্ণনা করেন তার মধ্যে সৌন্দর্য না এসে পারে না। আর উপমা প্রভৃতি সব অলংকারেই বক্রোক্তি আছে—তাও কবিকর্ম।

দণ্ডী ও ভামহ কুন্তকের পূর্বসূরী। তাঁর সমালোচনাশৈলী একটু ভিন্ন ধরনের। তিনি বক্রোক্তিকেই কবিকর্মের প্রধান গুণ বলেছেন এবং বক্রোক্তির লক্ষণ ও বিভাগ করে এই বক্রতা অনুসন্ধানের ভিতর দিয়ে কি রকমভাবে কাব্য বা সাহিত্যের অনুশীলন ও আস্বাদন হয় তা দেখিয়েছেন।

কুন্তক বলেছেন—স্বভাব বর্ণনা কাব্যের শরীর—যাঁকে প্রাচীন আলংকারিকেরা শব্দময় কাব্যশরীর বলেছেন। আর এই কাব্যশরীর অলংকৃত হয় বক্রোক্তির দ্বারা অর্থাৎ বক্রোক্তিই কাব্যশরীরের সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে দেয়। কাজেই স্বভাবোক্তিকে অলংকার বললে অলংকার্যকেই অলংকার বলার দোষ হয়। যাকে অলংকৃত করার জন্য কবিকর্ম তাই যদি অলংকার হয় তবে নিজেও নিজের কাঁধে চড়া যায় :

"শরীরং বেদলংকারঃ কিমলঙ্কুরুতেঽপরম্।
আত্মৈঃ নাত্মনঃ স্কন্ধম্ ক্বচিদপ্যধিরোহতি ॥" ১৩

এর পরে কুন্তক কবিকর্মের ছয় রকম বক্রতার কথা বলেছেন—বর্ণবিন্যাসবক্রতা (যা অনুপ্রাসাদির নামান্তর), পদপূর্বার্ধবক্রতা (প্রথমটিতে পর্যায় শব্দ চয়নের কৌশল, দ্বিতীয়টিতে প্রত্যয় প্রয়োগাদির নৈপুণ্য), বাক্যবক্রতা (এতে সমগ্র অর্থালংকার অন্তর্ভুক্ত), প্রকরণবক্রতা (বিভিন্ন প্রকরণ বা অধ্যায়ের রচনা ও সন্নিবেশের কৌশল) এবং প্রবন্ধবক্রতা (রচনার সামগ্রিক রূপের মধ্যে অভিনব অখণ্ড সৌন্দর্যসৃষ্টির নৈপুণ্য)। সমগ্র 'বক্রোক্তিজীবিত' গ্রন্থ এই ছয় প্রকার বক্রতার আলোচনায় ও উদাহরণে সম্পূর্ণ।

কাজেই দেখা যাচ্ছে 'বাঁকা কথা' এখানে হেয় নিত্যনৈমিত্তিক বাঁকা কথা নয়। বক্রিমা এখানে শোভাশালিতার নামান্তরমাত্র। এই বক্রিমা কবি সাহিত্যিকদের লোকোত্তর প্রতিভা থেকে উৎপন্ন। কবি-প্রতিভা যে বক্রতার জনক তা সৌন্দর্য-শালিতার আধার হবে—এতে আশ্চর্যের কি আছে ? আর সৌন্দর্যসৃষ্টি ও আনন্দদান ছাড়া সাহিত্য হয় না—বক্রোক্তিবাদের এটাই মূল কথা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শিশিরকুমার দাশ

কবিতার ভাষা : বিপ্রতীপ ক্রম

একটা সময় ছিল যখন জোর করে বলা চলত যে পদ্যের ভাষার সঙ্গে গদ্যের ভাষায় একটা বড় পার্থক্য তার অন্বয়ে, বা আরো স্পষ্ট করে বললে, তার পদক্রমে। গদ্যের পদক্রম ছিল নির্দিষ্ট, বাক্যের শেষে ক্রিয়া, বাক্যের গোড়ায় কর্তা। রামমোহন রায় নির্দেশই দিয়েছিলেন যে পর্যন্ত না বাক্যের ক্রিয়া পাওয়া যাবে ততক্ষণ বাক্য শেষ হয়নি মনে করতে হবে। অর্থাৎ গদ্যের ক্রমে নড়চড় হবার উপায় নেই। অথচ পদ্যে বা কবিতায় এই ক্রমের অবিরল পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি আমরা, রামমোহনের আগে, তাঁর সমকালে, তাঁর পরে। এমনকি তাঁর নিজের পদ্যেই। তিনি স্বচ্ছন্দে লিখলেন, "অশ্রু পড়ে বাসনার দম্ভ করে হাহাকার মৃত্যুর স্মরণে কাঁপে কাম ক্রোধ রিপুগণ"। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী গদ্যক্রম হবে * বাসনার অশ্রু পড়ে, দম্ভ হাহাকার করে, কাম ক্রোধ রিপুগণ মৃত্যুর স্মরণে কাঁপে। গদ্যের জন্য যে নির্দেশই তিনি দিন, বা গদ্যের জন্য যেটা স্বাভাবিক বলে আমরা সকলে মানি, পদ্যে তার ব্যতিক্রমকে অস্বাভাবিক মনে করিনা। বরং স্বীকার করেই নেওয়া হয়েছে পদ্যের পদক্রমের বিপ্রতীপতা কবিতার ভাষার বৈশিষ্ট্য মাত্র।

গদ্যের মধ্যে পদক্রমের এই নির্দিষ্টতা তার পেছনে কি কোনো অনুশাসন আছে? গদ্যের ভিত্তি যে মুখের ভাষা, যাকে বলা চলে "বচন", সেই বচনের স্বাভাবিক ক্রমকে মেনে নিয়েছে গদ্য। সব ভাষাতে পদক্রম এক নয়, ভাষায় ভাষায় ভিন্ন। বাংলায় কর্তা কর্মক্রিয়া স্বাভাবিক ক্রম। ইংরেজিতে কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম স্বাভাবিক। বাংলায় কাব্যের শেষে আসে নঞর্থক অব্যয়, ক্রিয়ার পরে। হিন্দীতে নঞর্থক অব্যয় বসে ক্রিয়ার আগে। এই সব ভাষার গদ্যেও এই ক্রম মেনে চলা হয়। পদ্যও যে এই স্বাভাবিক ক্রমকে মানে না তা নয়, হাজার হাজার লাইন তুলে দেখানো যাবে এই স্বাভাবিক ক্রম গদ্য যেমন সর্বদাই মেনে চলে, পদ্যও অধিকাংশ সময় মেনে চলে। রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন—

রবি অস্ত যায়
অরণ্যেতে অন্ধকার আকাশেতে আলো।

কিংবা সুধীন্দ্রনাথ লেখেন "পাতী-অরণ্যে কার পদপাত শুনি?" তখন তো স্বাভাবিক পদক্রমই ব্যবহার করেন তাঁরা। কিন্তু পাশাপাশি দেখা যায় "সন্ধ্যাত নতআঁখি ধীরে আসে দিবার পশ্চাতে", কিংবা "জানি কোনও দিন ফিরবে না ফাল্গুনী"। তখন বুঝি পদ্য কোনও বিশেষ প্রয়োজনে বিপ্রতীপ ক্রম ব্যবহার করে, তাই "দম্ভ হাহাকার করে" উল্টে যায়, আমরা শুনি "দম্ভ করে হাহাকার"।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কবিতার অন্বয়ের ইতিহাসের আদিপর্ব থেকেই দেখা যাবে বিপ্রতীপ ক্রমের বিপুল আধিপত্য। যতদূর জানি পৃথিবীর সব কবিতার ভাষাতেই তার প্রাচুর্য। অন্য ভাষার কথা যদি আপাতত বাদ দিই, বাংলা ভাষা সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবেই বলতে পারি, একেবারে প্রাচীনতম বাংলা পদ্য থেকে আজ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ ছত্রে এই বিপ্রতীপক্রম। চর্যাপদের "চঞ্চল চীত্র পইঠো কাল", শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের "কে না বাঁশি বাএ বড়াই কালিনী নই কূলে", চণ্ডীদাসের "সই কে বা শুনাইল শ্যামনাম", বিজয় গুপ্তের "হাসি বনে চণ্ডী আই" থেকে শুরু করে মণিভূষণ ভট্টাচার্যের

পরমায়ু অবিশ্বাস ক'রে
খোঁপা থেকে ঝরে যায় ফুল
চাঁদ ওঠে বালির প্রান্তরে
নীরবতা জড়ায় আঙুল

এই হাজার বছর ধরে বাংলা কবিতার বাক্যে বিপ্রতীপ ক্রম দেখা দিচ্ছে। এই তথ্যের ভিত্তিতে যদি কেউ বলেন বিপ্রতীপক্রম বাংলা পদ্যের অন্বয়ের বিশেষ লক্ষণ তা মেনে নিতে আমরা বাধ্য।

২

কিন্তু গদ্যে কি বিপ্রতীপ ক্রম নেই। একদিন ছিল না, আজ দেখা দিয়েছে এবং বিপুল সমারোহেই দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গদ্যেই তার সবচেয়ে স্পষ্ট সূচনা। তাঁর গদ্যেই প্রথম তার ব্যবহারের প্রাচুর্য। বিশেষ করে তিনি যেদিন থেকে 'সাধুভাষা' বিসর্জন দিয়ে 'চলিত ভাষা'-কে পুরোপুরি গ্রহণ করলেন, সেদিন থেকে বিপ্রতীপ ক্রম তাঁর গদ্যের একটি স্বাতন্ত্র্য-লক্ষণ হয়ে দাঁড়াল বলতে পারি। তাঁর আগে বাংলা গদ্যে কখনই বিপ্রতীপ ক্রম ব্যবহৃত হয়নি এমন কথা বলাটা ঐতিহাসিক দিক থেকে ঠিক হবে না অবশ্যই। কিন্তু সেগুলি ছিল ব্যতিক্রম, স্বাভাবিক নিয়ম ছিল বিপ্রতীপ ক্রমের ব্যবহার না-করা।

গত শতাব্দীতে যখন পদ্যের পাশাপাশি গদ্য লেখা চলছিল প্রবল প্রাচুর্যে, তখন কোনও গদ্য লেখক ভাবেননি যে তাঁরা কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার ক্রম উল্টে দিতে পারেন। অথচ কবিতায় তার ব্যবহার দেখতে অভ্যস্থ ছিলেন তাঁরা। গদ্য-পদ্য দুইই লিখেছেন যাঁরা, যেমন দীনবন্ধু মিত্র কি মাইকেল মধুসূদন, বিহারীলাল কিংবা নবীনচন্দ্র সেন, তাঁরাও পদ্যে ব্যবহার করছেন বিপ্রতীপ ক্রম, কিন্তু গদ্যে তাকে পরিত্যাগ করেছেন। অথচ একদিন গদ্যে, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের গদ্যে বিপ্রতীপ ক্রম দেখা দিল। গদ্যেও বিপ্রতীপ ক্রম কেন দেখা দিল, কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ করল এই স্বাধীনতা, সেই প্রশ্নেরও আগে প্রশ্ন আছে। বিপ্রতীপ ক্রম আদৌ দেখা দিয়েছিল কেন? যেহেতু পদ্যেই তার সূচনা, তাই প্রশ্ন তুলব পদ্যে বিপ্রতীপ ক্রমের ব্যবহার হয়েছিল কেন? আজও হয় কেন?

স্বাভাবিক ক্রম কি পদ্যের বাধা? বাধা নিশ্চয়ই নয়, কারণ পদ্যের অসংখ্য বাক্যই স্বাভাবিক ক্রমে লিখিত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সই কে বলে পিরীতি ভাল
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া কান্দিতে জনম গেল

ভাবিয়া দেখিলাম এ তিন ভুবনে আর কেহ মোর আছে
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই, দাঁড়াব কাহার কাছে

এদের কতকগুলি অংশে স্বাভাবিক ক্রম, কিন্তু কতকগুলি অংশে বিপ্রতীপ ক্রম। এদের থেকে প্রতিপন্ন হয় যে স্বাভাবিক ক্রমে কবিতা লেখার কোনো বাধা যেমন নেই, বিপ্রতীপ ক্রমের প্রয়োজনও তেমন আছে কবিদের। একথা শুধু প্রাচীন কবিদের সম্বন্ধে সত্য নয়, সব যুগের কবিদের পক্ষেই সত্য। বড়ো কবি-ছোটো কবির ব্যাপার নয়, ক্ষমতা-অক্ষমতার ব্যাপার নয়, কবিমাত্রই স্বাভাবিক ক্রম এবং বিপরীত ক্রমে তাঁদের বাক্য রচনা করে থাকেন।

কিন্তু কেন? একটা কারণ বলতে পারি অনেক ক্ষেত্রে বিপ্রতীপ ক্রম ব্যবহার করার দরকার হয় মিলের জন্য।

বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল
আমায় করেছ দান
আমি তো দিয়েছি ভরা শ্রাবণের
মেঘমল্লার গান।

বাংলা কবিতায় ক্রিয়াপদে-ক্রিয়াপদে মিল হয় না তা নয়, অনেক ক্ষেত্রেই কবিরা সে ধরনের মিল দিয়েও থাকেন। তবু দিলাম-নিলাম, চেয়েছি-পেয়েছি জাতীয় মিলকে কবিরা সাধারণত এড়িয়ে চলতেই চান। মিলের প্রয়োজনে তাই অনেক সময় বাক্যের শেষ থেকে ক্রিয়াপদটিকে এগিয়ে দিতে চান কবিরা। শুধু মিল নয়, ছন্দের প্রয়োজনও আছে। "আমায় করেছ দান" না লিখে "আমায় দান করেছ" লেখা চলে নিশ্চয়ই, কিন্তু তাতে এই কবিতার ছন্দের চালটা বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। এই কবিতায় ছমাত্রার পর্ব বিভাগে একটা স্পন্দন সৃষ্টি হয়েছে। "বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল আমায় দান করেছ" লিখলে হঠাৎ সেই স্পন্দন ভেঙে যাবে, ছন্দের দিক থেকে এই লাইনটিকে স্বীকার করা যাবে না। সেই প্রয়োজনেও "আমায় করেছ দান" লেখেন কবি। অসংখ্য উদাহরণ আমরা পাব কবিতার ইতিহাসে যেখানে দেখব বিপ্রতীপ ক্রমের প্রধান প্রয়োজন, মিলের জন্য, ছন্দের জন্য। অর্থাৎ কবিকে যেহেতু একটা বিশেষ ছন্দোবন্ধনের মধ্যেই বাক্য ব্যবহার করতে হয়, ঐ বন্ধনের প্রয়োজনে বাক্যের স্বাভাবিক ক্রমটাকে উল্টেপাল্টে দিতে হয়। ছন্দের মাপা গঠন স্বাভাবিক "বচন" বা "গদ্যের গঠন" থেকে পৃথক। তাই কবিতার বাক্যের ক্রমও পৃথক হয়ে ওঠে।

মিল ও ছন্দের দাবীর কাছে কবি তাহলে কখনও অধীন। তাঁর স্বাধীনতা নেই গদ্যলেখকের মতো। তাই তিনি বাধ্য হয়ে বিপ্রতীপ ক্রম ব্যবহার করেন? এমন কি হতে পারেনা যে তিনি স্বাধীনভাবেই বাক্যে পদক্রম বদলান। যেখানে মিলের প্রয়োজন নেই, ছন্দের কোনো বিশেষ দাবী নেই, সেখানে তো স্বাভাবিক ক্রম ব্যবহার না করার যৌক্তিকতা নেই তাহলে। তাহলে কেন তিনি সেখানেও বিপ্রতীপ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ক্রম ব্যবহার করেন ?

জেলেনৌকো এল ঘাটে
ঝুড়ি কাঁখে জুটেছে মেছুনি,
মাথার উপরে ওড়ে চিল।

'আরোগ্য'-এর একটি কবিতার এই তিনটি লাইনকে কি এইভাবে লেখা যেত না ?

জেলে নৌকো ঘাটে এল
ঝুড়ি কাঁখে মেছুনি জুটেছে
মাথার উপরে চিল ওড়ে।

এই কবিতায় মিল নেই, অতএব মিলের প্রয়োজনে বিপ্রতীপ ক্রমের ব্যবহার করা হয়েছে একথা বলা চলবেনা। স্বাভাবিক ক্রমে লিখলে, ছন্দের কোনো ত্রুটি হবেনা। তাহলে কেন রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিক ক্রমকে বদলাচ্ছেন ?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলব, বিপ্রতীপ ক্রম ব্যবহার করেন কবি, শুধু মিল ও ছন্দের প্রয়োজনে নয়, তাঁর আরো প্রয়োজন আছে। একটা বাক্যে শব্দের ক্রম আমরা নানাভাবে সাজাতে পারি—যে পর্যন্ত না বাক্যের অভিপ্রেত অর্থ নষ্ট হয়। সব ভাষায় ক্রম বদলাতে পারিনা। ইংরেজি বাক্য 'John Loves Mary'—এর ক্রম আমরা বদলাতে পারিনা 'Mary loves John'। এই বাক্যটি ব্যাকরণগতভাবে শুদ্ধ কিন্তু অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা লিখতে পারিনা* loves John Mary' কিংবা* 'John Mary loves' কারণ ব্যাকরণভাবে এই ক্রম ইংরেজিতে অস্বীকৃত। কিন্তু বাংলায় আমরা কতকগুলি বাক্যে পদক্রম বদলাতে পারি। সেখানে আমরা যেভাবে একটা চিন্তার কিংবা ঘটনার বিভিন্ন অংশগুলির উন্মোচন দেখাতে চাই, পদক্রমের মধ্যে তাকে সেইভাবে প্রতিফলিত করতে পারি। এটা আমাদের বাক্য-নির্মাণের একটা শক্তি। কবি সেই শক্তির ব্যবহার করেন। 'জেলে নৌকো এল ঘাটে' আর 'জেলে নৌকো ঘাটে এল' দুটো বাক্যের অর্থ মোটামুটি এক, কিন্তু পার্থক্য বিশেষ শব্দের প্রতি জোরে। প্রথম বাক্যে জোরটা পড়ছে ক্রিয়ার চেয়েও স্থানে, দ্বিতীয় বাক্যে স্থানের চেয়েও ক্রিয়ায়। 'ঝুড়ি কাঁখে জুটেছে মেছুনি'—বাক্যে আছে একটা বক্তব্যের জন্য প্রত্যাশার বিলম্বীকরণ। 'মেছুনি জুটেছে ঝুড়ি কাঁখে' যদি লিখি, তাহলে প্রথমেই ঘোষণা করে দিচ্ছি বাক্যের কর্তাকে। রবীন্দ্রনাথের বাক্যে কর্তা আসছে বিলম্বে। ঠিক তেমনই 'মাথার উপরে ওড়ে চিল' বাক্যটিতে। অর্থাৎ বাক্যগুলির দুটি সম্ভাব্য রূপের অর্থ মূলত এক হলেও সূক্ষ্মভাবে তাদের ভিন্নতাও আছে। কবি যখন একই বাক্যের দুটি সম্ভাব্য রূপের একটিকে বেছে নিতে চান, তখন তিনি নিশ্চয়ই এই সূক্ষ্ম ভিন্নতাকে তাৎপর্যপূর্ণ মনে করেন।

আরো একটি উদাহরণ দিয়ে কথাটি পরিষ্কার করার চেষ্টা করি। 'আরোগ্য' থেকেই এই অংশটি দেখা যাক।

হিংস্র রাত্রি আসে চুপে চুপে,
গতবল শরীরের শিথিল অর্গল ভেঙে দিয়ে
অন্তরে প্রবেশ করে,

এখানে প্রথম বাক্যে আছে বিপ্রতীপ ক্রম। স্বাভাবিক ক্রমে 'হিংস্র রাত্রি চুপে চুপে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
আসে' লিখলে ছন্দের ক্ষতি হতনা। কিন্তু কবি যদি বলতে চান, কেমন করে রাত্রি আসে, যদি তাঁর পাঠকের কাছে রাত্রির আসার প্রকৃতির ওপর জোর দিতে চান, তাহলে বাক্যে 'চুপে চুপে' শব্দের আবির্ভাব সকলের শেষে হলেই তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ একটি ঘটনার ঘটার ক্রমকে তিনি বাক্যের পদক্রমের দ্বারা প্রতিফলিত করতে চাইছেন। এই যে বাক্য এর সম্ভাব্য পদক্রম ছটি

হিংস্ররাত্রি চুপে চুপে আসে
হিংস্র রাত্রি আসে চুপে চুপে
চুপে চুপে হিংস্ররাত্রি আসে
চুপে চুপে আসে হিংস্র রাত্রি
আসে হিংস্ররাত্রি চুপে চুপে
আসে চুপে চুপে হিংস্র রাত্রি

এর মধ্যে প্রথম বাক্য ছাড়া সবই বিপ্রতীপ ক্রমে গঠিত। প্রত্যেকটির অর্থ এক, অন্তত এদের পার্থক্য সাধারণ কাজকর্মে, সাধারণ ভাববিনিময়ের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। কিন্তু কবি তাঁর প্রয়োজনে এই সম্ভাব্য গঠনগুলির যে কোনো একটি-কেই ব্যবহার করবেন। কোনো একটি ক্রম অন্য ক্রমগুলির চেয়ে বেশি "কবিত্বময়" বলে যে তিনি সেটি বেছে নেন, তা নয়। কোনো একটির সাহায্যে তাঁর চিন্তা সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট হবে, সব চেয়ে বেশি মূর্ত হবে বলেই সেটি বেছে নেন। যখন তিনি স্বাভাবিক ক্রমকে নেন, তখন সেটি নেন ঐ একই কারণে।

এই কবিতাংশের পরের দুটো লাইনে স্বাভাবিক ক্রম। যে কোনও গদ্যেও এদের ব্যবহার হতে পারত, এবং এদের বিশেষ কবিত্বময় অন্বয় বলে কেউ ভুল করবেন এমন সম্ভাবনাও নেই। অথচ কবি কি লিখতে পারতেন না

ভেঙে দিয়ে গতবল শরীরের শিথিল অর্গল
অন্তরে প্রবেশ করে

অথবা অন্তরে প্রবেশ করে
ভেঙে দিয়ে গতবল শরীরের শিথিল অর্গল

কিংবা গতবল শরীরের শিথিল অর্গল ভেঙে দিয়ে
অন্তরে প্রবেশ করে।

পারতেন, কিন্তু লেখেননি। তার কারণ তাতে তাঁর উদ্দেশ্য পুরোটা সার্থক হত না। এখানে যে পদ্ধতি রবীন্দ্রনাথ নিয়েছেন তাকে আমি বলব "বিলম্বীকরণ"। যে ঘটনার বর্ণনা তিনি করছেন তার একটা ক্রম আছে। সেই ক্রমের মধ্যে ঘটনার কোনো কোনো অংশ তিনি আগে বলছেন, কোনো কোনো অংশ বলছেন পরে। সমস্ত ঘটনার মধ্যে আছে ক্রম—ঘটার ক্রম। একসঙ্গে তো পুরো ব্যাপারটা ঘটছে না, ঘটছে সময়ের মধ্য দিয়ে। তাই সমস্ত ঘটনার ক্রমকে কালখণ্ডে টুকরো টুকরো করে ভাগ করা চলে। রবীন্দ্রনাথ তাই করেছেন এবং সেই টুকরো টুকরো ঘটনাকে তাদের ঘটার ক্রম অনুসারে সাজাচ্ছেন। 'ভেঙে দিয়ে' ক্রিয়ায় যে বাক্য তিনি আরম্ভ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করেননি তার কারণ "ভাঙা" ব্যাপারটাকে তিনি বিলম্বিত করতে চান, তিনি ঘটনার যে process, তার ক্রমটাকে দেখাতে চান ধীরে ধীরে। এখানে তিনটি ক্রিয়ায় (ব্যাকরণের ক্রিয়া নয়, বাস্তবের ক্রিয়া) সমস্ত ঘটনাটিকে ভাগ করেছেন : হিংস্র রাত্রির আসা, শরীরের শিথিল অর্গল ভাঙা এবং শেষ পর্যন্ত অন্তরে প্রবেশ করা। এর মধ্যে একটি প্রতিমাও আছে। সে প্রতিমা এক হিংস্র কিন্তু সাবধানী দস্যুর। তার সম্পূর্ণ ক্রিয়াকে তিনটি ক্রিয়াখণ্ডে ভাগ করেছেন কবি। প্রথম বাক্যে 'আসে'-র পর 'চুপে চুপে' বসিয়ে, পাঠকের মনে তার আসার প্রকৃতি সম্বন্ধে যে কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছেন, তারই নিবৃত্তি হচ্ছে পরবর্তী বাক্যে—অন্তরে প্রবেশ করার সে ক্রিয়ার সমাপ্তি 'গতবল শরীরের শিথিল অর্গল ভাঙায়' সে ক্রিয়ার পূর্ববর্তীস্তর। এই অন্বয়ে, এই পদক্রমে তাই লক্ষ্য করি এক অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলা।

বাক্যে পদক্রমের মধ্যে ব্যাকরণের অনুশাসন যেমন আছে, তেমন অনেক সময়ই প্রতিফলন হয় চিন্তার ক্রমের। অর্থগত দিক থেকে ক্রমের প্রথমে দ্যোতিত হচ্ছে সূচনা। ক্রমের শেষে ঘোষিত হচ্ছে সমাপ্তি। অর্থগত এইটেই হল যৌক্তিক অন্বয়। বাংলাভাষায় কতকগুলি বাক্যে পদগুলির ক্রমান্তরে মূল অর্থের বদল হয়না। 'বাঘ আমবনে থাকে' আর 'বাঘ থাকে আমবনে'—অর্থ একই। কিন্তু একটা পার্থক্য আছে, তা হল সূচনা ও সমাপ্তির প্রকৃতিতে। এই সঙ্গে আর একটা কথা বলা দরকার, তাহল কবি যে অনেক সময়ই বিপ্রতীপ ক্রমকে গ্রহণ করছেন তা এই যৌক্তিক অন্বয়ের জন্য নয়, গঠন সৌষম্যের জন্য। প্রশ্ন করতে পারি, গঠন সৌষম্য তো একই ধরনের ক্রমের পুনরাবৃত্তিতেই গড়ে উঠতে পারে, শুধু স্বাভাবিক ক্রমে কিংবা বিপ্রতীপ ক্রমে। যেমন

অন্ধকার মধ্যদিনে বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে।
বৃষ্টি ঝরে রুক্ষ মাঠে, দিগন্ত পিয়াসী মাঠে, স্তব্ধ মাঠে,
মরুময় দীর্ঘ তিয়াসার মাঠে, ঝরে, বনতলে,

বৃষ্টি পড়ে মধ্যদিনে অবিরল বর্ষাধারাজলে ॥

সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
যেখানে ছিলাম আমি,

'বৃষ্টি ঝরে' এবং "অনেক ঘুরেছি আমি"—"সেখানে ছিলাম আমি" জাতীয় অংশের —(শুধু বিশেষ পদের নয়, বিশেষ গঠনের) পুনরাবৃত্তিতে একটা তীব্রতা আসে (আবার বহুবার পুনরাবৃত্তিতে একটা তিক্ততারও সৃষ্টি হতে পারে)। আপাতত ভাবের তীব্রতার চেয়েও যে লক্ষণটির প্রতি দৃষ্টি দিতে বলি, তা হলে গঠনের সৌষম্য। এই সৌষম্য সৃষ্টি হয়েছে একই ধরনের গঠনের পুনরাবর্তনে। কিন্তু কখনও কখনও সৌষম্য সৃষ্টি হয় বিপরীতের টানা পোড়েনে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর ॥

এই যে কবিতা, তার প্রথম বাক্যটির মধ্যে দুটো অংশ : 'ঘর কৈনু বাহির' আর 'বাহির কৈনু ঘর'। এ'দের গঠন এক। কিন্তু পদগুলির স্থানান্তর ঘটেছে, গঠনের ক্রম বদলায়নি, বদলে গেছে অর্থ। তার ফলে বাক্যের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে এক টানাপোড়েন। কবিতার বক্তব্যও তাই, সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেছে রাধার জীবনে, বদলে গেছে তার জীবনে মূল্যবোধের ক্রম। অর্থ এখানে বিচ্ছুরিত হচ্ছে অন্বয়ের মাধ্যমে। আবার দেখা যাক ভারতচন্দ্রের

নখে নখ বাজায়ে নারদমুনি হাসে।
কান্দে রানী মেনকা চোখের জলে ভাসে ॥

'নারদ মুনি হাসে'—এই বাক্যাংশের ক্রম স্বাভাবিক। কিন্তু 'কান্দে রাণী মেনকা'-র পদক্রম বিপ্রতীপ। একজনের হাসি, অন্যজনের কান্না এই আচরণের বৈপরীত্যকে যেন কবি দ্যোতিত করছেন অন্বয়ের মধ্যে বৈপরীত্যের টানা-পোড়েন সৃষ্টি করে। একেই বলছি গঠন সৌষম্য। কবি যখন দেখেন বিপ্রতীপ ক্রমের সাহায্যে তিনি গঠনে এবং অর্থের মধ্যে টানাপোড়েন সৃষ্টি করতে পারেন, তখন তিনি স্বভাবতই তার পূর্ণ ব্যবহার করতে চাইবেন। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা নেওয়া যাক

রূপনারানের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়,
সত্য যে কঠিন ;
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,
সে কখনো করেনা বঞ্চনা।

প্রথম বাক্যের শেষ একটি ক্রিয়াপদে, দ্বিতীয় আরম্ভ একটি ক্রিয়াপদে। তৃতীয়, চতুর্থ বাক্যের ক্রিয়ার ক্রম বিপ্রতীপ, কিন্তু সেখানেও তাদের অবস্থানের বৈপরীত্য। আর যেভাবে শেষ হয়েছিল প্রথম বাক্য, সেইভাবেই শেষ হল সর্বশেষের আগের বাক্য—'কঠিনেরে ভালোবাসিলাম'। 'জেগে উঠিলাম', 'জানিলাম', 'দেখিলাম', 'চিনিলাম', 'ভালোবাসিলাম'—এই পাঁচটি ক্রিয়াপদের ব্যবহারের মধ্যে কখনও

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
ক্রমের বৈপরীত্য কখনও ক্রমের নিয়মিত স্বাভাবিকতা, এই নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গড়েছেন একটি সৌষম্য।

'রক্তের অক্ষরে দেখিলাম আপনার রূপ'—এই গঠনের সঙ্গে সমান্তরালভাবেই আসতে পারত আঘাতে আঘাতে চিনিলাম আপনারে। কিন্তু কবি এখানে ক্রম বদলে দিলেন। সেইরকমই 'সত্য যে কঠিন' এবং 'কঠিনেরে ভালোবাসিলাম'। অর্থাৎ আমি যাকে বলেছি 'বিলম্বীকরণ' এবং সম্পূর্ণ ক্রিয়াকে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে উদ্ভিন্ন দেখতে চাওয়া এবং দেখাতে চাওয়ার যে চেষ্টা, তা নিয়ন্ত্রিত করছে এই কবিতার অন্বয়কে। রূপনারানের কূলে জেগে ওঠা একটা ঘটনা, কিন্তু ঘটনার তাৎপর্য একটা বিশেষ বোধে, বিশেষ জ্ঞানে। সেই জ্ঞানের উদ্বোধন ঘোষিত হচ্ছে 'জানিলাম'-এর আবির্ভাব—এই ক্রিয়াপদকে এবং জানার বিষয়টি আসছে তারপরে। দেখিলাম এবং চিনিলাম ক্রিয়াপদের কর্মের পূর্বে আগমনও ঐ একই যুক্তিতে। এই কবিতায় জানা, দেখা, চেনা এই তিনটিই রূপনারানের কূলে জেগে ওঠার সঙ্গে যুক্ত। ক্রমশ আমরা দেখি কবিতা এগিয়ে যায় আর একটি বোধে, ঘোষিত হয় 'সত্য যে কঠিন'। এবং তারপর সমস্ত ক্রিয়ার অবসান হয় ধীরে ধীরে, 'কঠিনেরে ভালোবাসিলাম'। ভালোবাসাটাই সমাপ্তি। এই কবিতার সৌন্দর্য ও মহত্ত্বের আরো অনেক কারণ আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এর গঠন সৌষম্য, আর এর গঠনের মূলে আছে স্বাভাবিক ক্রম ও বিপ্রতীপ ক্রমের দ্বন্দ্ব, যে এর মহিমাকে বাড়িয়েছে তাও সন্দেহাতীত।

৩

কবি কোথায় পেলেন বিপ্রতীপ ক্রমের ধারণা ? গদ্যের আগে পদ্য কেন ব্যবহার করল বিপ্রতীপ ক্রম ? কবি কি বিপ্রতীপ ক্রমকে আবিষ্কার করেছিলেন পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে ?

পরীক্ষার মধ্য দিয়ে কবি অবশ্যই বিপ্রতীপ ক্রমের শক্তি নানাভাবে ব্যবহার করতে শিখেছেন কিন্তু তিনি এই ক্রম সৃষ্টি করেননি। এই ক্রম ছিল 'বচন'-এর মধ্যে। আর 'বচন' কবিতার ভাষা ও গদ্যের ভাষা দুই-এরই উৎস, দুই-এরই ভিত্তি। আমরা যাকে স্বাভাবিক ক্রম বলছি বাংলা অন্বয়ের, তা কেন স্বাভাবিক ? এই জন্য তো যে সেই ক্রম প্রকৃতি নিজেই গড়ে দিয়েছে। ক্রমের সঙ্গে স্বভাবের কোনো যোগ নেই। তা স্বাভাবিক কারণ তা স্বীকৃত, ইংরেজিতে যাকে বলে 'নর্ম্'। তা সংখ্যাগত দিক থেকে বহুল প্রচলিত। কিন্তু এর মানে এই নয় যে ভাষায় ক্রমান্তরের, বা বিপ্রতীপতার কোনো চিহ্ন ছিল না। 'রাম ফুল তোলে' এই গঠনটাই বহুল ব্যবহৃত, তাই স্বীকৃত, তাই এটাই 'নর্ম্।' কিন্তু কোনো মানুষ কোনো একটি মুহূর্তে যদি বলে ওঠে 'রাম তোলে ফুল' কিংবা 'ফুল তোলে রাম' তাকে অ-স্বাভাবিক বলব না। আমাদের স্বীকৃত ক্রমে বলি 'এক রাজা ছিল, তার এক রানী ছিল'; কিন্তু গল্পকারের কণ্ঠে তা একদিন বদলে গিয়ে হল "এক ছিল রাজা, তার ছিল তিন রানী'। আমাদের অন্বয়ের মধ্যে যে সম্ভাবনা, তা সাধারণ মানুষই খুঁজে পেয়েছে, ব্যবহার করেছে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। সেই বিশেষ ক্ষেত্র হল মূলত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আবেগের, মূলত প্রাত্যহিকের বাইরে বৈচিত্র্য সন্ধানের। আর সেই কারণেই কবিতার মধ্যে তার আবির্ভাব হল আগে, আর কবি তার বিচিত্র সম্ভাবনাকে কবিতার ভাষার সঙ্গে জুড়ে দিলেন। এই হল কবিতার ভাষার ভেতরের ইতিহাস। তাই বিপ্রতীপ ক্রম কবিতার ভাষার অন্বয়ের একটি বড়ো স্বাতন্ত্র্য-লক্ষণ।

কিন্তু গদ্যে কেন দেখা দিলনা বিপ্রতীপ ক্রম অনেক দিন পর্যন্ত, আর কেনই বা একদিন দেখা দিল ; আর তার ফলই বা কি ? এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে যেতে হবে গদ্যের ইতিহাসে। সে প্রসঙ্গ এখন নয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রবাল দাশগুপ্ত

গদ্যের কড়া হাতুড়ি

কবিতার ভাষা স্বতন্ত্র কীসে, এ প্রশ্ন তোলে আমাদের বৈশেষিক যুগ। এ যুগে আমরা সবাই বিশেষ বিশেষ অঙ্গনে বিভক্ত পরিশ্রম করি। আর নিজের অঙ্গনের স্বতন্ত্র বিশিষ্টতা জাহির করতে চাই। আশা করি সেই বিশিষ্টতায় আমরা স্বাধীন কর্মী হিসেবে নিজেরাও শামিল। এ আশা আরোই ব্যাকুল হয়ে ওঠে যখন দৈনন্দিন আটপৌরে খাটনিকে স্রেফ বেগার খাটা ভাবতে শিখে তার পাশে আমরা কবিতা বা নাটকের মতো স্বেচ্ছায় বেছে নেওয়া শিল্পে কোনো খাঁটি স্বাধীনতার মঞ্চ খুঁজি। আশাটা হঠাৎ উলটো মেরুতে চলে যায়, রেগে উঠি, যখন সেই মঞ্চকেও মনে হয় সাজানো আজাদীর ফাঁকি।

সেই রাগের এক প্রকাশ দেখতে পাই সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতায়ঃ 'হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয় / এবার কঠিন, কঠোর গদ্যে আনো / পদ-লালিত্য-ঝঙ্কার মুছে যাক / গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো / প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা / কবিতা, তোমায় দিলাম আজকে ছুটি / ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় / পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি'।

কবিতার সীমায় বসে লেখা কবিতা থেকে উঠে আসে 'গদ্যের কড়া হাতুড়ি'। গদ্যের কঠোরতার ব্যাপারখানা কী, এই প্রশ্ন যখন গদ্যেই তুলতে হয়, তখন এ হাতুড়ি যেন সেই কাজের নিশান হয়ে দাঁড়ায়। কোমল কারাগার থেকে সুকান্তের সাহিত্য খালাস পেতে চেয়েছিল। আজ অন্য এক আজাদীর কথা উঠেছে। হয়ত সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'ভেঙো না কো, শুধু ভাঙা নয়'-এর মতো বিস্মৃত আকর-কবিতার দিকে তাকানোর সময় এসে গেল।

সেরকম কোনো কবিতা অবশ্য এ লেখার আশু বিবেচ্য নয়। সুকান্ত যখন বলেন 'হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়' তাতে যে সময়চেতনার পরিস্ফুটন সেখান থেকেই রওনা দেওয়া যাক। 'আর' এ কাব্য নয়, 'এবার' গদ্য আনো, এই সময়-জ্ঞানে এক বর্তমান এসে পড়েছে, 'মহাজীবন'-চিহ্নিত এক বর্তমান, যে বর্তমানে লোকায়ত জীবনের 'উপলব্ধির বিষণ্ণতা ক্রমে আত্মনির্ভরের উজ্জ্বলতায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে' (পৃ. ৫৪, জীবনানন্দ দাশ, 'কবিতার কথা' ; কলকাতা :- সিগনেট প্রেস, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৮০)। এই জীবনের শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকে 'ওদেশ' (কবিতার কথা', পৃ. ৬৫) আর 'সেকালের সমাজ' (পৃ. ৬৯) ; এ-ও-সে-র স্থানাঙ্কের হিসেব এত স্পষ্ট যে ও দেশ বলতে যে পশ্চিমকে বোঝায় আর সেকাল মানে যে সনাতন ভারত সে নির্দেশ বাহুল্যবোধে বাদ পড়ে যায়। যে বর্তমান বাস্তব সুকান্তের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বর্তমান, তার সহকর্মী বা গুরু হয়ে জোটে ওদেশের প্রেম অপ্রেম আর সেকালের সুরাসুর, এই দুই চিহ্নতন্ত্র। চিহ্নতন্ত্রের এই আধিপত্যই কি আজকের সাহিত্যমনস্ক কয়েকজনকে চিহ্নবিজ্ঞানের বা semiotics-এর দিকে প্রবণ করে তুলছে ?

আমাদের কবি আর বোদ্ধারা যে, সাধারণ বাচনেই হোক আর চিহ্নবিজ্ঞানের নতুন কাব্যতত্ত্বের পটভূমিতেই হোক, কবিতার ভাষার বৈশিষ্ট্যের কথা তোলেন, সে গরজে ইন্ধন জোগায় সেকাল আর ওদেশ। সেকালে অলংকার, রীতি আর ধ্বনির কথা প্রচলিত ছিল। আর ওদেশে চিহ্নের চিহ্ন নিয়ে খুঁচিয়ে তোলা হচ্ছে নতুন নতুন খোঁচা—কোন চিহ্ন কী ধরনের চিহ্ন, কোন রূপ কী তাৎপর্য কীভাবে বহন করে, এই পুরোনো প্রশ্নগুলো ওদেশে নতুন এক সেমিয়টিক্স অর্থাৎ চিহ্নবিজ্ঞানে পুনর্বিন্যস্ত হচ্ছে। সেকালের মন আর ওদেশের মন একটা ব্যাপারে কাছাকাছি ঃ দুই মনই কথা আর মানে এ দুয়ের এক সাংকেতিক সম্পর্কের (অর্থাৎ চিহ্ন-চিহ্নিত বা বাচক-বাচ্য সম্বন্ধের) ধাঁচ মোটামুটি সহজেই এঁচে নেয়, তারপর দরকার মতো সে ধাঁচের সংস্কার বা পরিবর্তন করে। তাতেই ব্যাখ্যার কাজ চলে। সাহেবী মন আর সংস্কৃত মন কার্য-কারণ-ব্যাখ্যা আর কথার মানের ব্যাখ্যা নিয়ে যুক্তি-নিয়ন্ত্রিত চিন্তা-শৃঙ্খলায় অভ্যস্ত। সেই পাণ্ডিত্যের অভ্যাসকে আমরা শ্রদ্ধা করি, তাতে অপেক্ষাকৃত সহজে সাড়া দিই, এটা হয়ত ঠিকই করি। তবে তার হাতে আমাদের ধাতটাকে সঁপে যে দিই নি সেটা বোধহয় এক দিক থেকে ভালোই। ব্যাখ্যাপন্থী সাহেবী আর সংস্কৃত অনুসন্ধানকে সহায়ক সঙ্গী হিসেবে নিই, এমনকি গুরুত্ব দিতে দিতে গুরু বলে মেনেও ফেলি। তবু স্বতন্ত্র এবং হয়ত স্বাধীন এক প্রস্থানভূমি আমাদের রয়ে যায়। নাহয় সংস্কৃত ভাষার চেনা কোনো শাশ্বত মহাজীবনকেই সুকান্ত বলছেন আধুনিক 'আজ'-কের দিনে, 'এবার', গদ্যকে কঠোর স্ফূর্তি দিতে। কিন্তু সংস্কৃতের চিরকাল আর ইংরিজির ইহকালীনতার মধ্যে যে ফাঁকটুকু, তার সুযোগে প্রকাশ খোঁজে তাঁরই আকাঙ্ক্ষার নিজস্বতা। এই ব্যক্তিগত খোঁজার সঙ্গে সেকেলে বা ওদেশী দস্তুরমাফিক অনুসন্ধানের শেষ পর্যন্ত মিল হয় না।

সুকান্তের কবিতায় যে খোঁজার শুরু, তার পথ-চলা নতুন নতুন বাঁক নিয়েছে অনেক। নানা ধারার মধ্যে আপাতত বিশেষ করে চোখে পড়ে আজকের দিনে এই ধরনের চিন্তাকে মৌলিক রূপ দেবার দুটো চেষ্টা : বাদল সরকারের দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্মারক বক্তৃতা 'থিয়েটারের ভাষা' (কলকাতা ঃ অপেরা, ১৯৮৩) আর শিশিরকুমার দাশের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা 'গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব' (কলকাতা ঃ দে'জ, ১৯৮৫)। প্রথমটায় ঝোঁক কর্মযোগের দিকে। তবু দুই সাধনারই ইষ্ট পরমার্থ একই—এমন কোনো মুক্তি বা মোচন যার সঙ্গে ভাষার উন্মোচনের কথা জড়িয়ে আছে, যদিও ভাষার বাইরে থেকেই, মানুষের পূর্ণাঙ্গতায় উপনীত হওয়ার ইচ্ছে থেকেই, তাগিদটা আসা চাই এবং তাই আসছেও। এ মিল দেখে বুঝি যে সুকান্তের খোঁজাটাই আজও চলছে ; সে কথা বুঝি প্রশ্ন তোলার ধরনের একটা মিল দেখেও। সুকান্তের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল ধরে নেওয়া যে হৃদয়বৃত্তির প্রকাশের সংগত মাধ্যম কবিতা ; বাদল সরকারের পক্ষে তাঁর প্রথম

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
পর্বের নাটকের প্রসীনিয়াম মঞ্চের 'ন্যাচারালিস্টিক থিয়েটার'-কে এবং শিশির-কুমার দাশের পক্ষে সাধারণ লেখায় প্রযুক্ত গদ্যকে তেমনিই স্বচ্ছ এবং স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশমাধ্যম বলে ধরে নেওয়া হয়ত স্বাভাবিক হতো। কিন্তু সুকান্ত বাদল শিশির এই স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। সুকান্ত কবিতা লিখে বলেন 'কবিতা, তোমায় দিলাম আজকে ছুটি'। বাদল সরকার আর শিশিরকুমার দাশ প্রবন্ধাকারে আলোচনা করে দেখান যে আমরা যদিও ধরে নিই যে গদ্য লেখা মানে লোকে এমনিতে যেভাবে কথা বলে সেভাবেই লেখা এবং প্রসীনিয়াম মঞ্চের নাটক বাস্তব জীবনেরই নির্ভুল প্রতিকৃতি, আসলে কিন্তু 'স্বাভাবিক' জীবনের এই দুই প্রতিকৃতি —গদ্য আর 'স্বাভাবিকবাদী' (ন্যাচারালিস্টিক) নাটক—তৈরি-করা জিনিস যা চিরকাল ছিলও না এবং যাকে সৃষ্টিশীল রচনার বা নাটকের সবচেয়ে সোজা বা স্বচ্ছ রীতি বলে আর বেশিদিন বহাল রাখাও যাবে না। ধরে নেওয়া জিনিস নিয়ে প্রশ্ন তোলার এই ধরনটার দাম কতখানি সেটা যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে অর্ধেক রাজ্য জয় হয়ে যাবে তাতেই।

বাদল সরকারের আর শিশিরকুমার দাশের উপস্থাপনে তৃতীয় যে মিল চোখে পড়ে সেটা তাঁদের নিজস্ব, সুকান্ত-পরবর্তী, অগ্রগতির ধাপ। এই ধাপ পেরোতে হবে আমাদেরও। ওঁদের কাজের খেই ধরে এ ব্যাপারটা বুঝে নিতে চেষ্টা করব ভেবেই আপাতত কলম ধরা। দুজনের একটা করে প্রধান কথা যদি পর পর বলি, আসল মিলের জায়গাটা হয়ত নজরে পড়বে সোজাসুজি, বিনা মন্তব্যেই।

বাহ্য ঘটনার হুবহু প্রতিকৃতি মঞ্চে দেখানোর যে চেষ্টাটাকে ন্যাচারালিজম বা স্বাভাবিকবাদ বলে, নাটকের ইতিহাসে, বাদল সরকার লক্ষ করিয়ে দেন যে সেই স্বাভাবিকবাদ ব্যাপারটা চলচ্চিত্রের আগেকার যুগের জিনিস। কিন্তু আজকের পরিস্থিতি তো অন্য। আজ 'ঘটনার বাস্তব রূপ সিনেমা যতোটা দেখাতে পারে, থিয়েটারের পক্ষে তার ধারে কাছেও যাওয়া সম্ভব নয়' ('থিয়েটারের ভাষা', পৃঃ ৩৭)। 'আজকের দিনে বেশ কিছু টাকা খরচ করে দৃশ্যসজ্জায় যথেষ্ট বাস্তবানুগ পরিবেশও যদি সৃষ্টি করা যায়, তবু সবচেয়ে বেশি প্রশংসা পেতে পারি—"প্রায়" সিনেমার মতো' (পৃঃ ৩৮)। এই অবস্থাতেও পুরোনো ধরনে নাটক করে যাওয়া একরকম অভ্যাসের দাসত্ব, যা দেখলে 'একটা পুরোনো গল্প মনে পড়ে···একটা ভরা নদী হেঁটে পার হবার সময় লোকে কাপড় খুলে মাথায় বেঁধে পার হতো এক সময়ে। তারপর নদী গেছে শুকিয়ে, তবু লোকে সেই নিয়মটা মেনে চলেছে, ভুলে গেছে কী কারণে নিয়মটা হয়েছিল' (পৃ ৩৯)। নিয়ম বদলানোর সময় এসেছে বুঝে আজ প্রসীনিয়াম থিয়েটারের বদলে অন্য মঞ্চ, অন্য নাটক, অন্য উপস্থাপন খুঁজছেন অনেক নাট্যকর্মী। তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন যে সেটাই স্বাভাবিক, মানুষের স্বভাবমুক্তির সেটাই এক প্রধান পথ।

এখানে আপাতত এই কথাটুকুর উপর জোর দিচ্ছি যে স্বাভাবিকবাদী নাটকের যুগে মঞ্চে স্বাভাবিকতার এক প্রতিকৃতি তৈরি করার রেওয়াজ চালু হয়, কৃৎ-কৌশলের অগ্রগতিবশত পরে সেই কাজ চলচ্চিত্রের হাতে চলে যাওয়াতে নাটক সে কাজ থেকে ছুটি পেয়ে এক নতুন বর্তমান কালে প্রবেশ করতে পারছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
শিশিরকুমার দাশ যে গল্প বলছেন সেটা মন দিয়ে শুনলে সেখানেও একই ধরনের পালাবদলের খবর পাব।—'শুধু পদ্যই নয়, যাকে গদ্য বলা হয় সেও··· মুখের ভাষার থেকে পৃথক। পদ্যের মতো গদ্যও একটা তৈরি করা জিনিস। যতক্ষণ সেই জিনিষটা তৈরি হয়নি, ততক্ষণ তার ব্যবহার হবে কী করে ? যে সব ভাষায় পদ্যের আবির্ভাবের অনেক পরে গদ্যের নিদর্শন পাই, সে সব ভাষায় নিশ্চয়ই গদ্য অনেক পরে তৈরি হয়েছে' ('গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব', পৃঃ ১০)। অধিকাংশ ভাষাতেই 'সাহিত্যের ইতিহাস খুললে দেখি, ইতিহাসের আদি স্তরে গদ্যের নিদর্শন নেই', প্রায় সবারই 'পুরোনো সাহিত্য মোটামুটি পদ্যে লেখা' (পৃঃ ৯)। এক কালের সর্বেসর্বা পদ্য পরে তার জমির খানিকটা গদ্যকে ছেড়ে দিল। গদ্য হয়ে উঠল মুখের ভাষায় এক তথাকথিত স্বাভাবিক প্রতিকৃতি, যেভাবে অন্য ইতিবৃত্তটাতে উঠে আসে 'স্বাভাবিকবাদী নাটক।

তারপর গদ্যের অন্তর্গত ভাঙনের পালা ঃ 'গদ্যের ইতিহাস এই বৈশেষিকতা সৃষ্টির ইতিহাস—দর্শনের গদ্য, ইতিহাসের গদ্য···এদের প্রত্যেকের প্রয়োজন স্বতন্ত্র প্র-ভাষার বা meta-language-এর। অন্যপক্ষে পদ্যের কোনো meta-language নেই। পদ্য ভাষাকে শুধু মাধ্যম হিসেবেই গ্রহণ করে না, শেষ পর্যন্ত সে ভাষাকেই নতুন করে সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত আমরা যাতে মুগ্ধ হই তা ওই ভাষার ব্যবহারে, ভাষার রূপে। ভাষাটাই হয়ে ওঠে একটা সৃষ্টি। বা বলতে পারি, ভাষা ও অভিজ্ঞতা দুয়ে মিলে যায় এমনভাবে যে তাদের পৃথক করা সম্ভব নয় আর। গদ্যে যখন এমনটি হয়, বা যে গদ্যে এমনটি হয়, তখনই যথার্থ সাহিত্যিক গদ্যের সৃষ্টি। আর সেখানেই হয় গদ্য-পদ্যের দ্বন্দ্বের—মিলন ও বিরোধের—সূচনা' (পৃঃ ২৭-২৮)।

হাজার বৈশেষিকতায় ছড়িয়ে গেলে কেজো গদ্যের অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতা, এ ঘটনা ঘটল গদ্যেরই শরীরে, কিন্তু এর প্ররোচনা ছিল মুদ্রণনির্ভর প্রযুক্তির যুগের খণ্ডবহুল কাজ-ভাগে। সেভাবে ভাবলে গদ্যের সহস্রবিধ চেহারায় যেন চলচ্চিত্রের আগমনের দোসরকে চিনতে পারি। এবং নাটকের মতো সাহিত্যিক গদ্যও রচয়িতা আর দর্শক-শ্রোতা-পাঠকের মধ্যে যোগাযোগের ধরনটাকে, অর্থাৎ ভাষা-টাকেই, নিছক মাধ্যমের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রতায় আটকে না রেখে কেন 'নতুন করে সৃষ্টি করে' তার আঁচ পাই।

আধুনিক যুগের শুরুতে সাজানো স্বাভাবিকবাদী নাটক আর তৈরি করা স্বচ্ছন্দ গদ্য ছিল সাহিত্যের অন্যতম আম দরবার। সাময়িক সমস্যার অস্থায়ী সমাধান ছিল সেই প্রকাশ্য মজলিশ। বাদল সরকার আর শিশিরকুমার দাশ আপাতদৃষ্টিতে স্বচ্ছন্দ সেই সমাধানের অতীত ভবিষ্যতের চেহারা খানিকটা দেখিয়েছেন। এতক্ষণ এটার উপরেই জোর দিয়েছি যে দুজনেরই দেখিয়েছেন অভিনব প্রযুক্তির নতুন 'আলো'-র (চলচ্চিত্রের, বৈশেষিক-জটিলতা-বিচ্ছুরিত পারিভাষিক গদ্যের) ধাক্কায় ওই সরল স্বচ্ছতা কীভাবে মিলিয়ে যাচ্ছে, আজকের নিরীক্ষায় থিয়েটার আর গদ্যসাহিত্য কীভাবে মানুষের ভাষার নতুন এক স্বাধীনতার চৌকাঠ অবধি পৌঁছচ্ছে। এই দিকটা ভবিষ্যতের ; এ বিষয়টাতে ফিরে আসব পরে। তার আগে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাকিয়ে নেওয়া দরকার অতীতের দিকে। এখানেও একই সঙ্গে (এবং একই ধরনের) সাহায্য করেন বাদল সরকার আর শিশিরকুমার দাশ। বইয়ের অক্ষর ধরে ধরে না এগিয়ে মোদ্দা কথাগুলোই বলি। সব জটই যে ওঁরা ছাড়িয়ে দেন তাও নয়। যে লেখক পাঠককে শ্রদ্ধা করতে শিখেছেন তিনি পাঠকের কল্পনাশক্তিকে কাজ করার কিছু সুযোগ তো দেবেনই ; 'আমরা সবাই রাজা'-র সুরে বলা চলে, লেখক পাঠককে 'দেন মান, সে মান আপনি ফিরে পান'।

এঁরা নানা সূত্র ধরিয়ে দেন, ফলে আমরা দেখতে পাই যে গোটা খেলাটা উপভোগ্য সাহিত্যের চেহারা নেওয়ার আগে এমন এক যৌথতায় বৃত ছিল যেখানে অনুষ্ঠান আর কাজের মধ্যে তেমন মোটা দাগ টানা ছিল না। বাদল সরকার মনে করিয়ে দেন যে আদি জননী উপচার (রিচুয়াল) থেকে নাটকের জন্ম, আর নাটকের ইতিহাসে স্বাভাবিকবাদ ব্যক্তিযুগের জিনিস। শিশিরকুমার দাশ বলেন, এক কালে ভাষার সব রকম বয়ান তৈরির কাজ পদ্যে হতো ; পদ্যের ক্ষেত্র সংকোচ করে গদ্য বেরিয়ে আসে লিপির প্রসারের পর। এবং বাহুল্যবোধে একথা বলে দেন নি যে ছাপাখানা হবার পর বই বাড়ল, উপন্যাস এল, খবরের কাগজ হলো, এই গতির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক আধুনিক সমাজের উত্থান। নাটক আর গদ্যের গল্পটা একই। সমাজের আদিতে ছিল যৌথ ছন্দের তাল যার নাচ সমাজটারই সমগ্রকে স্মরণীয়ভাবে প্রকাশ করত—ছন্দের আবর্তনের ফলে মনে থাকত সহজে, এবং তাই সমাজে নতুন নতুন যেসব বাচ্চা মানুষ হচ্ছিল, সমাজের সভ্য হয়ে উঠছিল, তারা সহজে মনে রাখতে শিখত, সামাজিক স্মৃতির ছাপ বারবার পেয়ে তাদের এক সহজ মন তৈরি হতো। তারপর নানা জটিলতার ক্রমিক উন্মোচন এই সমাজের আবর্ত থেকে আলাদা করে ব্যক্তিকে যে প্রক্রিয়ায় বার করে আনল তার একটা বড় অংশই হলো স্বাভাবিকবাদী নাটকের আর গদ্যপ্রয়োগের এক নতুন প্রতিপত্তি যা আধুনিক যুগের অন্যতম সূচনালক্ষণ। ব্যক্তির দৈনন্দিন কথাবার্তার নকলের একটা ধরন গদ্য হয়ে রূপ নিল। ব্যক্তির দৈনন্দিন আচরণের এক নকল গ্রথিত হলো স্বাভাবিকবাদী নাটকের চেহারায়। চেষ্টাটা এই হয়ে দাঁড়াল যে ব্যক্তিমানুষের আটপৌরে চেহারাটাকে স্বাভাবিক প্রতিকৃতিতে নতুন প্রতিষ্ঠা দিতে হবে—প্রাক্তন সামাজিক আচার-উপচারের ছন্দ-বাঁধা পৌরোহিত্য এড়িয়ে।

অনেকেই এতক্ষণে হয়ত ধরতে পেরেছেন, এটা গণতন্ত্রেরই ক্রমবিকাশের কাহিনী। বাণিজ্যের বাজার কিংবা হাটবাটের কেন্দ্রস্বরূপ শহরের মতোই নাটক বা গদ্যও গণতন্ত্রের চেয়ে ঢের বেশি পুরোনো জিনিস, ঠিকই। কিন্তু ব্যাবসা, শহর, গণগদ্য আর স্বাভাবিকবাদী নাটকের প্রতিপত্তি বা হেজেমোনি আধুনিক ঘটনা। ব্যক্তির স্বাভাবিকতাকে সাবেক সমাজের অচলায়তন থেকে মুক্ত করার ধ্বজা উড়িয়ে গণতান্ত্রিক বা বুর্জোয়া বিপ্লব 'বুর্জোয়া'-দের ঘাঁটি 'বুর্গ'-কে অর্থাৎ শহরকে এবং মনের শহরকে অর্থাৎ বাণিজ্যিক বিতরণব্যবস্থায় অভিনীত ব্যক্তিগত-জীবন-প্রদর্শক পণ্য-নাটককে এবং মুদ্রণ-যুগে বহুল প্রচারিত গণগদ্যকে নতুন এক আলোড়নে তুলে ধরল আধুনিক যুগের চৌকাঠে পা দিয়ে। ঘোষণা করা হলো এক নতুন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
প্রতিপত্তি বা হেজেমোনির কথা, যার নাম ব্যক্তিস্বাধীনতা। করার সঙ্গে সঙ্গে, প্রায় দেখতে দেখতে, যে বিজ্ঞানের অগ্রগতি কৃৎকৌশল পালটে দিয়ে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের উদ্বোধন করেছিল সেই বিজ্ঞানই নতুন প্রযুক্তিক্রমে গণতান্ত্রিক মুক্তিকে এমন এক নিয়ন্ত্রণের শৃঙ্খলায় বাঁধল যার সূক্ষ্ম আর স্থূল বাঁধনকে চিনে ওঠা তো শক্ত বটেই, নিয়ন্ত্রণের দশচক্র গঠন বুঝে সময়োপযোগী নতুন লড়াইয়ে নামাও অত্যন্ত কঠিন।

নাটকের বেলায় আধুনিক যুগ স্বাধীনতার যে প্রতিশ্রুতি এনেছিল তার অন্তর্নিহিত বঞ্চনার দিকটাও বাদল সরকার স্পষ্ট করেছেন (এখানে সবটা বলার জায়গা নেই), প্রযুক্তির উন্নতিতে চলচ্চিত্রের জন্ম হওয়ায় শিল্প হিসেবে স্বাভাবিকবাদী নাটকের দাবিও যে ফাঁকির খাতায় চলে গেল সে প্রক্রিয়াটাও দেখিয়েছেন। গদ্যের বেলায় প্রশ্নটা ঠিক সেভাবে তোলেন নি শিশিরকুমার দাশ, কিন্তু যে তুলতে চায় তার জন্যে উপকরণ সাজিয়ে রেখেছেন। তোলার দরকারটা এই যে 'গদ্যের কড়া হাতুড়ি' সুকান্তের কবিতায় যে প্রতিমা হয়ে দেখা দেয় তার মূল্যের দিকটার পাশাপাশি তার ফাঁকির দিকটাও দেখে নিতে হবে যদি আমরা শিশিরকুমার দাশের সেই স্বাচ্ছন্দ্যের পাঠ বুঝতে চাই, যদি পৌঁছতে চাই 'গদ্য-পদ্যের মোহানায়', যেখানে 'মাধ্যমের কৃত্রিমতা ভেঙে পড়ে,' ('গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব', পৃ ৫২)। অবিভক্ত মানুষের একই স্বাধীনতায় পৌঁছনোর যে পথনির্দেশ 'থিয়েটারের ভাষা'-য় আছে সেটা বুঝতে চাইলেও আগে দেখে নিতে হবে, বিভক্ত জীবনের কৃত্রিমতা কী রাস্তা ধরেছিল।

শিশিরকুমার দাশ একটা জরুরী সূত্র ধরিয়ে দেন ২৭—২৮ পৃষ্ঠায় ঃ 'দর্শনের গদ্য, ইতিহাসের গদ্য, বাণিজ্যের গদ্য, বিজ্ঞানের গদ্য, প্রত্যেকটি গদ্যই বিশেষভাবে শিক্ষণীয়, এদের রূপ নিয়ন্ত্রিত হয় এদের মাধ্যমে প্রকাশিত জ্ঞানের প্রকৃতির দ্বারা। প্রত্যেকটি বিদ্যার জন্য একটি স্বতন্ত্র ভাষা, স্বতন্ত্র শব্দাবলী, নির্দিষ্ট পরিভাষা। এদের প্রত্যেকের প্রয়োজন স্বতন্ত্র প্র-ভাষার বা meta-language-এর।'

প্রভাষা কাকে বলে ? প্রভাষা সেই প্রবেশিকা ভাষা যা কোনো একটা ভাষার জ্ঞানে প্রবেশ করিয়ে দেয় ; শেষোক্ত ভাষাটাকে বিষয়ভাষা বা object language বলে ? কোনো ফরাসী ছাত্র যদি ফরাসী ভাষায় লেখা পাঠ্যবই পড়ে বাঙলা শেখে, তার কাছে বাঙলা তখন বিষয়ভাষা অর্থাৎ শেখার বিষয়, আর ফরাসী প্রভাষা অর্থাৎ প্রবেশের চাবি।

প্রত্যেক বিদ্যা বা ক্ষেত্রের যে স্বতন্ত্র ভাষা তার প্রভাষাও আলাদা একথা কেন বলা হলো ? বলার কারণ, যে-শিক্ষার চাবিতে ইতিহাসের বৈশেষিক গদ্যের দরজা খোলে সেই চাবিতে বিজ্ঞানের বৈশেষিক গদ্যের দরজা খোলে না। জ্ঞানগুলোর প্রকৃতি আলাদা ; তাদের শিক্ষাপ্রক্রিয়াও ভিন্ন ; সেই প্রবেশিকা শিক্ষার ভাষা অর্থাৎ প্রভাষাও তাই পৃথক। যেমন সংজ্ঞার্থ (definition) বিজ্ঞানে যে বিশেষ ধরনের কাজ করে তার ঠিক তুলনীয় কিছু ইতিহাসে নেই।

বলা হয়েছে বিষয়ভাষাকে প্রভাষা নিয়ন্ত্রণ করে। নি-য়ন্ত্র-ণ কথাটার কেন্দ্রে আছে কোনো এক 'যন্ত্র'-সম্বন্ধ, যে টেকনিকাল সম্বন্ধ থাকায় বৈশেষিক পরিভাষাকে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বলে টেকনিকাল টার্মিনলজি। বৈশেষিক সাধনা এইভাবে কড়া হাতুড়ির প্রযুক্তি বা টেকনলজি হয়ে দাঁড়ায়। সে প্রযুক্তি হৃদয়কে সরিয়ে যুক্তিকে প্রাধান্য দিতে চায়; সে প্রযুক্তি অন্তর্নিহিত তত্ত্বের আর বহিরঙ্গ প্রয়োগের ফারাকটাকে বড় করে দেখায়, প্রয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে মানুষের প্রয়োজনের এক মোটা দাগের মানচিত্র এঁকে নেয় যা বাজারের বশীভূত। পণ্যানির্দিষ্ট প্র য়ো জ ন, বাহ্যসর্বস্ব প্র য়ো গ, আর কঠোর যুক্তি—এই তিন স্থানাঙ্ক প্রযুক্তি কথাটার মানে মেপে দেয়। বৈশেষিক গদ্যের সঙ্গে প্রযুক্তির যুগের সম্পর্ক বুঝে নিতে হবে এই সূত্রেই। লোকে শুধু 'কাজ করে' বললেই তো ব্যবহারিক জগতের সত্যিকারের ছবি পাওয়া যায় না। লোকে নিজেকে আর অন্যকে ব্যবহারও করে বা 'কাজেও লাগায়', নিমিত্তমাত্র ভেবে নিয়ে। যান্ত্রিক বা নৈমিত্তিক যুগে ভাষাকেও লোকে যন্ত্রের মতো গড়ে পিটে নিয়ে ব্যবহার করে, প্রাযুক্তিক স্বার্থের ক্ষেত্রে—এটাই বৈশেষিক গদ্য।

গদ্যকে যখন কড়া হাতুড়ি ভাবি তখন নিজের সত্তাকে কাজে ছুটিতে দু টুকরো করে নিয়ে দুটো সত্তাকেই বাইরের রূপায়ণে নির্বাসন দিই। কেজো গদ্যে কাজের সত্তাকে নিয়ন্ত্রণ আর শাসন করি, তখন আমাদের চিকীর্ষার এক যান্ত্রিক চেহারা বাইরে দাঁড়িয়ে আমাদেরই ভয় দেখায়। ছুটির সত্তা বা হৃদয় এক কাজ-বাদ-দেওয়া নিছক কোমল প্রকাশভঙ্গিতে ছন্দ-কবিতার রূপ ধারণ করে বাইরে দাঁড়িয়ে আমাদের মনোযোগ প্রার্থনা করে, তাকে তখন সুকান্ত কবিতা লিখে বকে দেন, এবং প্রকাশবৈদগ্ধ্যের অন্য স্তরে সুধীন্দ্রনাথ লেখেন 'মনে হয়, একা আমি।—পরিত্যক্ত ভিটার জঞ্জালে / পুরস্ত্রীর প্রসাধনী ফেলে গেছে কারা যাত্রাকালে', কারণ সৌন্দর্যবোধ নিছক প্রসাধনে এসে ঠেকে। এই দীর্ণ অবস্থায় নিজেদের সময়কে বা কাজে অকাজে তৈরি আস্ত ব্যক্তিত্বকে কোনো রচনাতেই আপন বলে চিনতে পারি না আর। তখন কাজকে তো যান্ত্রিক বা কৃত্রিম লাগেই, অযৌক্তিক ছুটিও হয়ে ওঠে আরেক অধীনতা। কড়ি গদ্য আর কোমল কবিতার ব্যবধান বেড়ে উঠে সুর ব্যাপারটাই ছিঁড়ে যায়।। জীবন থেকে জ্যোতি চলে গেছে এটা টের পাই।

জ্যোতি চলে যাওয়ার খবরটা স্মরণীয়ভাবে দিয়েছিলেন হ্বালটার বেন্‌ইয়ামিন, যাঁকে আমরা বোধহয় ওয়ালটার বেঞ্জামিন বললেও পারি। 'যান্ত্রিক মুদ্রণের যুগে শিল্প' শীর্ষক এক প্রবন্ধে বেঞ্জামিন এই ব্যাপারটার দিকে মন দিয়েছিলেন যে আজকের দিনে যেকোনো ছবির অনেক অনুলিপি মুদ্রিত হয়ে ঘরে ঘরে চলে যেতে পারে, যেকোনো মঞ্চাভিনয়কে সবাক চলচ্চিত্রের আকারে ধরে রেখে বারবার চালিয়ে দেখা যায়, এই যুগে কোনো শিল্পকৃতির নিজস্ব জ্যোতি বা 'স্থানমাহাত্ম্য / কালমাহাত্ম্য' যেন রইল না আর। যেকোনো সামগ্রী বা ঘটনার যখন অজস্র পুনর্মুদ্রণ সম্ভব তখন বত্তিচেল্লি দেখতে ইটালি বা তাজমহল দেখতে আগ্রায় ছুটতে হয় না—যারা নকলেই সন্তুষ্ট সেই সংখ্যাগুরু উপভোক্তা-সাধারণ হয়ত ঘরে বা প্রেক্ষাগৃহে বসেই উপভোগ করবেন তাঁরা যা চান। শিল্পের সামগ্রীর বা অভিনয়শিল্পীর নিজস্ব উপস্থিতির জ্যোতি কি তার অদ্বিতীয় বিকিরণের মূল্য হারাল তাহলে? এই প্রশ্নটাকেই স্মরণীয় করে তুলেছিল বেঞ্জামিনের লেখা।

শিশিরকুমার দাশের কাছে আমরা দেখতে শিখি, প্রযুক্তি-যুগ কীভাবে বহু-বিভক্ত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিষয়বস্তু হিসেবে ভিতর থেকে গদ্যকে বৈশেষিক করে তুলে সাধারণ্যের জ্যোতি থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। প্রভাষাগুলো নাহয় চাবি। কিন্তু সেসব চাবি যে যার নিজের দরজার। সব-কটা কুঠরির দরজা একসঙ্গে খোলে না। বহুধা-ভগ্ন গদ্য যদি জোড়া না লাগে তাহলে ভাষার আলোটাই কি ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে যায় না ? বেঞ্জামিনের লক্ষ করা ঘটনাটা যান্ত্রিক মুদ্রণপ্রক্রিয়ার অভিঘাতমাত্র, ভাষার আঁতে ঘা দেয় না, বাইরে থেকেই গায়ে লাগে। শিশিরকুমার দাশের বর্ণিত প্রক্রিয়া তো মনে হচ্ছে ভাষাকেই ভিতর থেকে টুকরো টুকরো করে ফেলে। গদ্যের হাতুড়ি শুধুই কি ভাঙে ? নিজেকেই শেষে ভেঙে ফেলে ?

যন্ত্র যে শুধু ভাঙে না, গড়েও, এটা তো সবাই জানে। একই সামগ্রীর অনেক-গুলো করে বানিয়ে দেয়, সেগুলোর গড়ন অবিকল এক হয়, এটা তো যন্ত্রের অন্যতম গুণ। যন্ত্র হুবহু একই গড়ন বারবার গড়ে দেয়, এটাই হলো নিত্য-নৈমিত্তিক যন্ত্রসভ্যতায় নিত্যতার অংশ। সংসারের চাকা যন্ত্রযুগে আরো দ্রুত ঘোরে এবং আরো নানা চাকা উপচাকায় ভাগ হয়ে ঘোরে এও যেমন ঠিক, আবর্তনের ছন্দ আরো মসৃণ আর অবিকল হয়ে ওঠে একথাকেও ততটাই দাম দিতে হবে। সে কদর বোঝা সহজ হয়ে দাঁড়ায় যখন যন্ত্রযুগের বাহনভাষা গদ্য তার নিজের শরীরেই ছন্দের আবর্তনকে ধারণ করতে শেখে। কী করে শেখে তার গল্প বলতে বলতে শিশিরকুমার দাশ লক্ষ করেন যে গদ্য আর পদ্যের মধ্যে 'মিল ঘটে যায় কখনো কখনো, তখন ভাষার সেই যুগল সম্মিলনে আমরা অবাক হয়ে তাকাই, তখন সেই গদ্য-পদ্যের মোহানায় মাধ্যমের কৃত্রিমতা ভেঙে পড়ে, যা আমাদের উদ্‌বেলিত করে তা ভাষার মধ্যে লুকিয়ে থাকা সম্ভাবনার অসীম বিস্তার' (পৃ ৫২)। সেই গল্পটা মন দিয়ে শোনা দরকার। মানুষের এক নতুন স্বাধীনতার দেখা পাই এখানে।

গদ্যকে যখন ভাবি নেহাত ব্যবহারিক তখন সে অ-কবিতা। কিন্তু আদলের দিক থেকে গদ্য তো অ-কবিতা নয়, সে আসলে অ-পদ্য ; সেই পরিপ্রেক্ষিতে গদ্যের পক্ষে কাব্যের সঙ্গে উদ্দেশ্য মেলাতে চাওয়া ধৃষ্টতা নয়। এটা স্পষ্ট হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে। শিশিরকুমার দাশ মনে করেন বাক্যের চেয়ে বঙ্কিম 'জোর দিয়েছেন বাক্যের সমাহারে। কীভাবে সৃষ্টি করা যায় একটি অনুচ্ছেদের মধ্যে গঠনের ঘাত-প্রতিঘাত, গঠনের সমতা ও বিষমতার দ্বন্দ্ব। তিনি বুঝে নিয়েছিলেন, গদ্য যদি পদ্যের প্রতিস্পর্ধী হতে চায়, তাকে খুঁজে নিতে হবে তার নিজস্ব শক্তি, আর তার নিজস্ব শক্তি বাক্যের গঠনে ও বাকে-বাক্যে সংঘর্ষণে ও সম্মিলনে। বঙ্কিম সম্ভবত এ কথাও বুঝেছিলেন যে কবিতার জগৎ একটা আছে—একটা অব্যক্ত রহস্যময় জগৎ। সেখানে প্রবেশ করা সম্ভব গদ্যের মধ্য দিয়েই। তাই তিনি লিখতে পেরেছিলেন, "আমার বিশ্বাস আছে যে, অনেক স্থানে পদ্যের অপেক্ষা গদ্য কাব্যের উপযোগী" (পৃ ৪৬)। বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যকে শিশিরকুমার দাশ 'গদ্যকবিতার উদ্ভবের প্রাক্‌ইতিহাস' খোঁজার জায়গা বলে মনে করেন। বীরশৈব সম্প্রদায়ের রচনাবলীতে তিনি এরকমই আরেক উৎস দেখেছেন। 'পদ্যে যে আবর্তন ও প্রত্যাশা তার চরণগঠনকে শাসন করে তারই অনুসরণে গদ্যের মধ্যেও বীরশৈব সাধকেরা একটি আবর্তনের বোধ সঞ্চারিত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করেছিলেন। সেই জিনিসটাই আমরা দেখছি বাঙলা গদ্যকবিতায়, যার উদ্ভব পদ্যের ছন্দোবন্ধন থেকে মুক্তির পথে নয়, যা গদ্যেরই একটি সম্ভাবনার পরিণাম' (পৃ ৪৯)। রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা যে তাঁর গদ্যেরই এক বিবর্তন এ সিদ্ধান্তের পক্ষে শিশিরকুমার দাশ সবিস্তারে যুক্তি সাজিয়েছেন পরিশিষ্টে (পৃ ৬৭—৮৩)। তার শেষে বলেছেন 'পদ্যছন্দকে ভেঙে রবীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতার সৃষ্টি করেন নি। তাঁর গদ্যই রূপ নিয়েছে গদ্যকবিতায়' (পৃ ৮৩)।

মোটা দাগে এই হলো প্রভাষার হাত থেকে গদ্যের মুক্তির গল্পটা। শিশির-কুমার দাশ তাঁর বৃত্তান্তের খুঁটিনাটিতে ফুটিয়ে তুলেছেন, গদ্যে বাক্যের 'সংঘর্ষণে ও সম্মিলনে' যে মাদকতা আসতে পারে তা কীভাবে মুক্তির রাস্তা করে দেয়। আমাদের বুঝে নিতে হবে, সাহিত্যিক গদ্যের আবর্তিত শরীরে প্রযুক্তির নিজস্ব আবর্তনের জটিলতার এক প্রতীক গড়ে ওঠে বলে গদ্যই হয়ে দাঁড়ায় আমাদের যুগের এক আন্তরিকতা, এক প্রধান কবিতারীতি। একই গড়ন বারবার গড়ে দিয়ে, অথচ সামগ্রীর মডেল পালটে ঈষৎ অভিনব করে জটিল পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে, যন্ত্ররীতি জীবনকে ধ্রুপদ থেকে যে খেয়ালের ভিতর দিয়ে চালনা করছে, নৈমিত্তিককে নিত্য বলে যে সুরে চিনিয়ে দিচ্ছে, সেই খেয়ালী সুরের যথার্থ অন্তরঙ্গ প্রকাশের মাধ্যম কী ? হয়ত প্রথম যথার্থ মাধ্যম ছিল রোমান্টিক হৃদয়ের কবিতা ; কিন্তু তাকে যে ডেকে এনেছিল সেই একই অমোঘ গতি তারপর কবিকে বাধ্য করে প্রথম দিকের 'উপভোগে গেছি বেদনার রীতি ভুলি'-র মতো পদ্য-আক্ষেপ ছেড়ে গদ্যের জমিতে নামতে, বেদনার নতুন সংবেদ সত্যি সত্যিই শিখবার জন্যে। যেদিন কবিতা আবৃত্তি নিতান্তই আওড়ানোয় পর্যবসিত হয় সেদিনকার আবর্তের জটিলতায় স্পষ্টতই এমন এক বলিষ্ঠ ভাষাকে চাই যার তেজ বৈশেষিক গদ্যের স্পর্শে কাতর হবে না, যে ভাষা নিছক হৃদয়েরও নয় আবার ছকসর্বস্ব বুদ্ধির রোগ থেকেও মুক্ত। এ ভাষা আস্ত মনের কথাকে তার যোগ্য বিস্তার দিতে পারবে, যে বিস্তারের আসল নাম শনাক্ত করেছেন শিশিরকুমার দাশ : আবর্তন।

সুকান্তের গদ্যের কড়া হাতুড়ির প্রতীক থেকে যে প্রস্থান, তার পথ চলা এখানে এসে আপাতত থামে। ভাববার অবসর পাই সাময়িক সিদ্ধান্তের আশ্রয়ে পৌঁছতে পেরেছি বলে। পথ চলার কাজই তো তার প্রস্থানভূমিকে ছেড়ে অন্য কোনো গুরুত্বে উপনীত হওয়া। সুতরাং এটাই তো স্বাভাবিক যে গদ্যে কবিতার আবর্তন আমাদের কড়া হাতুড়ি থেকে সরিয়ে আনে কড়ি আর কোমলের এক নতুন বোঝাপড়ার দিকে।

বৈশেষিক গদ্যের ঝোঁকটা কড়ির দিকে। তার বৈশিষ্ট্যই হলো কথা আর অর্থের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি। প্রত্যেক বাক্যের সুনির্দিষ্ট মানে থাকে এবং বাক্য একাই তাকে প্রপন্ন বা পরিস্ফুট করে। এরকম বাক্যার্থকে বলা যায় প্রপত্তি (প্রপোজিশন)। প্রত্যেক প্রপত্তিই অর্থবোধের এজলাসে একা কাঠগড়ায় দাঁড়ায়, জড়সড়, সঙ্গীহীন।

স্বাভাবিক গদ্যের বয়ান-বুনোটে বাক্যেরা অবশ্য জড় নয়, জঙ্গম ; একা নয়,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গ্রথিত। তাদের আবর্তনে বয়ান সামগ্রিক মানে সৃষ্টি করতে করতে চলে। এখানে খালি চিহ্নবিজ্ঞানের সেই মামুলী কথাটার চর্বিতচর্বণ করছি না যে কথনের ছন্দই একরকম অতিরিক্ত মানে দেয়; এও বলতে চাইছি যে আবর্তনশীল গদ্যবয়ান, শিশিরকুমার দাশের ভাষায়, 'বাক্যে-বাক্যে সংঘর্ষণেও সম্মিলনে' এক বাক্যের অর্থের যেন গায়ের উপর অন্য বাক্যের অর্থকে এনে লাগায়, লাগিয়ে উৎপ্রেক্ষা প্রতি-নিবেশ ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় নতুন অর্থ তৈরী করতে থাকে চিন্তার এক সাধারণ্যে। সেখানে বৈশেষিক প্রভাষাগুলোর নিয়ম না মেনে বর্ণসংকর করা চলে কারণ সাধারণ্যের আইন বৈশেষিক নিয়মকে সংযত করতে পারে। এই বৃহত্তর গদ্যক্ষেত্রে মানুষ তার স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে নিতে পারে; একেকটা প্রভাষার অতিশৃঙ্খলিত তন্ত্রকে অন্য তন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ছুটি নিয়ে গদ্যের কাজ আর খেলার গোটা মহলটাকেই মানুষের আস্ত মনের পুষ্টিতে নিয়োজিত করতে পারে। মন দেওয়া বা মনোযোগকে প্রাধান্য দেয় বৈশেষিক গদ্য। মন রাখা বা মনোরঞ্জন পদ্য-কবিতার ঝংকারের অন্যতম কাজ। কিন্তু যখন বলি 'মনে রাখা' অথবা 'কার মনে কী আছে কে জানে', সেই সমন্বয়শীল মন তো অনেক বড় দায়িত্বের ক্ষেত্র। তার কী করে চলবে যদি বৈশেষিক গদ্যে আর ঝংকৃত পদ্যে আটকে থাকে মনের সীমা?

এইভাবে আজ কবিতার কাজটাকে নতুনভাবে সাজাতে হচ্ছে। এক দিকে যে গদ্যও এ কাজে শামিল সেকথা দেখতে পেলাম শিশিরকুমার দাশের বইয়ে। অন্য দিক থেকে কাজটাতে ভাগ বসিয়েছে এক ধরনের ব্যক্তিগত আধুনিক গান যার অভিঘাতে পশ্চিমী সমাজে সাধারণশ্রাব্য কবিতার কাজ প্রধান প্রধান রচয়িতাদের গানেই চলে আজকাল; লিখিত-পঠিত কবিতা অপেক্ষাকৃত বিশেষ মহলেরই আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঠিক এ ধরনের গান ভারতে না থাকলেও এটা তো আমরা জানি যে রবীন্দ্রসংগীত আর রবীন্দ্রকাব্যের উপস্থিতির ধরন আলাদা এবং এই তফাতটা ভেবে দেখার মতো। অর্থাৎ কবিতার কাজ বলে যাকে ভাবতে শিখেছি সেটা কোনো একটা দেশে একটা কালে ঠিক কী কী মাধ্যমের মধ্যে ভাগ হয়ে গিয়ে কীভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা মোটেই স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার নয়; গদ্য আর পদ্য, সুর আর কথা, শোনা আর পড়ার দ্বৈতগুলো নিয়ে ভাববার সময় দেশ আর কালের নির্দেশ স্পষ্ট রাখা জরুরী। 'কবিতা কী?' অথবা 'কবিতার ভাষার বৈশিষ্ট্য কী?' এ জাতীয় বিবেচনায় নামবার সময়ে বুঝে নিতে হয় কাকে কবিতা বলতে চাইছি এবং এই চাওয়ার স্থানাঙ্ক আর কালাঙ্ক কী। 'কবিতার কথা' গ্রন্থে যখন দেখি, কবিতা বোধ করতে শিখতে চাইলে বহু দেশ কালের 'কবিতা' পড়ে নিতে হবে, তখন মনে হয় 'কবিতা'-র এক অধুনাকেন্দ্রিক সংজ্ঞার্থ বেছে নিয়ে তদনুসারে প্রাচীন সাহিত্যের এমন কোনো কোনো লেখাকে 'কবিতা' ভাবা হচ্ছে যাদের হয়তো প্রাচীন রসবেত্তাদের নিজস্ব দৃষ্টিতে আলাদা রচনাশ্রেণী ভাববার কোনো কারণ ছিল না। এর তুলনায় আরেকটু বেশি নির্ভরযোগ্য ঠেকে একই বইয়ের অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যের কাব্যশক্তি বিষয়ে জীবনানন্দের মন্তব্য। কবিতার কাজ নিয়ে জীবনানন্দ যেসব সাধারণীকরণ পেশ করেছেন তা দেখে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাঁকে শুধু যে আধুনিক যুগের দৃষ্টিশীল মানুষ বলেই চেনা যায় তা নয়, এও বোঝা যায় যে, আমাদের জগতে ভাষার সাহিত্যসংস্থানে যে প্রক্রিয়াকে 'কবিতা' বলে, তার পূর্বধারার খোঁজে তিনি অতীত সাহিত্যে প্রবেশ করেন বর্তমান কালের নাগরিক হিসেবেই। অতীতের দ্বারে অতিথি হতে তিনি যান না, এ যুগেরই অগিদের বশে পর্যটন তাঁর।

আজকের কবিতার সঙ্গে প্রাচীন সাহিত্যের কোনো ধারার অবিচ্ছেদ আদৌ নেই এমন কথা বলছি না। কিন্তু ষোল আনা আছে ধরে নিলে, কবিতার কোনো চিরন্তন সংজ্ঞার্থ ধরে নিলে, একটু মুশকিল। 'কাব্যের মুক্তি' সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে সুধীন্দ্রনাথ দত্তও একইভাবে এক কবিতাচেতনাকে শাশ্বত প্রযোজ্যতা দিয়ে বসেন। ওঁদের এই ঝোঁক একরকম অধুনাসর্বস্ব প্রাদেশিকতা। স্থানেও যেমন, কালেও তেমনি প্রাদেশিক মায়া কাটিয়ে উঠতে হবে, যদি না আমরা কল্লোল-পরিচয়ের যুগের প্রতিশ্রুতিতে বর্তমানের ভাবচ্ছায়া খুঁজে খুঁজেই আত্মসন্ধানের দায় সারতে চাই।

যে অর্থে এ যুগ কবিতাকে চেনে সে অর্থে কবিতা বৈশেষিক গদ্যের উলটো পিঠ এবং সমবয়সী। তাকে বোঝার কাজে হোমারপাঠ সহায়ক হতে পারে; কিন্তু হোমার বা বাল্মীকি বর্তমান অর্থে কবি নন। তাঁরা সমাজে সংযুক্ত ছিলেন। সুধীন্দ্রনাথের ভাষায় 'কাব্য অনাদি' হতে পারে, যদি কাব্য বলতে রসসাহিত্য বুঝি; কিন্তু কবিতা ব্যক্তিগত হৃদয়ের ক্ষরণ, এবং এই হৃদয়ের মতোই কবিতাও জটিলতার যুগের জিনিস যার উৎপত্তির ইতিহাস গণতন্ত্রের উৎপত্তির সঙ্গে ওতপ্রোত। গণতন্ত্র বা হৃদয়ের মতোই কবিতাও নিজের উৎস খুঁজে নেয় প্রাচীন সাধারণ্যে; সেকথা আলাদা—প্রাচীন কালে যা ছিল না তার কি প্রাচীন উৎস থাকতে নেই? কিন্তু আমাদের স্পষ্ট বোঝা দরকার যে সেকালের দর্শন যেমন একালের সংকুচিত দর্শনের সঙ্গে তুলনীয় নয় তেমনি সেকালের কাব্যও আমাদের চেনা কবিতা থেকে ব্যাপ্তিতে এবং স্বভাবে আলাদা।

এতক্ষণ পর্যন্ত প্রাচীন কালের সঙ্গে তফাতটা একটু বাড়িয়ে দেখিয়েছি যাতে সহজে দেখা যায়। এবার স্বাভাবিক ভারসাম্যে ফেরা দরকার। সম্পর্ক একেবারে নেই এমন তো নয়। এও বলা দরকার যে সাধারণ পদ্যকবিতাই একালে প্রাচীন কাব্যের প্রতিনিধি—যদিও স্থানচ্যুত, ভূমিকাভ্রষ্ট, চরিত্রান্তরিত, তবু প্রতিনিধি। তেমনি আধুনিক দর্শন আর কৃষিভিত্তিক জনপদব্যবস্থাও প্রাচীন দর্শন আর কৃষিভিত্তিক রাজতন্ত্রের সংকুচিত প্রতিনিধি। এই সংকোচনের প্রক্রিয়া আর বর্তমানের শরীরে তার উপস্থিতি ক্রমশ বুঝে নিতে হবে। সম্যক চিন্তার আর জীবনযাপনে প্রগতির এ এক পূর্বশর্ত। বোঝা দরকার, প্রাচীন স্থিতিগুলোর অনুমোদনেই এ যুগের গতিগুলো ঘটতে পারছে, যখন পারছে। কৃষি যদি অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন করতে পেরে কৃষি-পেরোনো সমাজ-জীবন চালু রাখার অনুমতি দিয়ে চলে, তাহলে সেই ফলনে পুষ্ট শহর বেঁচে বর্তে থাকে, তার এই বাঁচা আর বর্তন জনপদেও বৃহত্তর পালাবদল ঘটিয়ে তোলে। তেমনি, সমাজে লেখাপড়ার যদি এতই প্রাচুর্য থাকে যে কেউ কেউ বৈশেষিক কঠিন সমস্যা নিয়ে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
ব্যাপৃত থাকলেও, সেই সহস্রবিধ চরিতার্থতার অজস্রের মধ্যে বসেও কেন্দ্রীয় কিছু নির্বিশেষ সাহিত্যিক সারা সমাজকে হৃদয়বান সাধারণ্যে মেলাবার মতো সতেজ রস তৈরি করতে জানেন, তাহলে গদ্যে পদ্যে পৃথগন্ন হয়ে গিয়ে সাহিত্য নানা বৈশেষিক কঠোরতাকে প্রশ্রয় দিয়ে ভাষার নাগরিক উজ্জীবন ডেকে আনতে পারে, যা তখন সাহিত্যের হৃদয়স্বরূপ কাব্যকেও পালটে দেয়।

কিন্তু সর্বত্রই দেখি সহজ আবৃত্তির পুরোনো সাধারণ্য অতখানি জটিলতার কঠিন ওজন নিতে পারলে তবেই জটিল আবর্তনগুলো তার পিঠে চড়ে বেঁচে থাকতে পারে। গণতন্ত্র চলে একইভাবে এক প্রচ্ছন্ন রাজতন্ত্রের অনুমোদনে, রাষ্ট্রপতি যার শাসনতান্ত্রিক প্রতীক। প্রাচীন রাজতন্ত্রের রাজ্যবিভক্ত অর্থাৎ জাতি-বিভক্ত পৃথিবীর ছায়াই, বিভিন্ন বীর রাজার 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'-র প্রতিমাই, জাতিগুলোকে স্বতন্ত্র রেখেছে আজও। সংকট দেখে বা ভয় পেয়ে এক-একটা জাতি গুটিয়ে গিয়ে 'প্রতিক্রিয়াশীল' হয়ে যায়—অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন রাজতন্ত্র তখন জাতির ঐক্যের আর জোরের দাবিটাকে অগ্রাধিকার দিতে বাধ্য করে।

এরকম প্রতিক্রিয়াশীলতার চ্যালেঞ্জ আজ বৃহৎ বলেই এতটা ভাবিয়ে তোলে। প্রতিক্রিয়া বাড়ে ক্রিয়া বাড়লেই। ঠিক কোন ক্রিয়া বাড়াবাড়ি করে এই বিপদ ডেকে এনেছে তা বোঝা দরকার। এই বুঝে নেওয়ার কাজে সাহায্য করে বাদল সরকারের 'থিয়েটারের ভাষা'।

যে ক্রিয়ার দৌরাত্ম্য নিয়ে সমস্যা, সেটা হলো বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাধীনতার সেই প্রতিপত্তি যার কথা বলেছি খানিকটা আগে। বাদল সরকার লক্ষ করেন, 'বর্তমান সমাজে আমাদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মের মধ্যে সত্যিকারের "স্বভাব" কতটুকু আছে? প্রতিযোগিতামূলক এই সমাজে সর্বদাই দরকার হয় নিজের "স্বভাব"-কে চেপে রাখবার, যা আমরা নই সেই রকম একটা চেহারা অন্যের সামনে তুলে ধরবার' (পৃ. ৩৬)। বুর্জোয়া 'মুক্তি' ব্যক্তিমানুষকে তার ঐতিহ্যশৃঙ্খলিত জাতিসত্তা থেকে মুক্ত করার নামে ঘরছাড়া করে প্রতিযোগিতার বাজারের হাতে সঁপে দেয়, যে বাজার তার নিজস্ব বিবর্তনে বহুজাতিক এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। এই অভিযানে বুর্জোয়া যুগের ঝোঁকটা হলো অনেক জাতির লৌকিক সংস্কৃতির ভিত্তি ধ্বংস করে একচেটে কারবারের জুলুমে কয়েকটা জাতির সংস্কৃতি বাকিদের উপর চাপিয়ে দেওয়া; এই জুলুমই আজকের সাংস্কৃতিক আর ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদ।

অথচ যে ব্যক্তির নাকি এতে স্বাধীনতা আসছে তার ব্যক্তিসত্তাই লৌকিক সংস্কৃতির জাতীয় ঐশ্বর্যে পুষ্টি পেয়েছিল, বিকশিত হচ্ছিল। সেই শিকড়ে কুড়ুল মারায় সবারই ব্যক্তিত্বকে ভিতর থেকে এক দৈন্য গ্রাস করতে থাকে। মুষ্টিমেয় যে কয়েকটা জাতি বাজারে প্রতিপত্তি পেয়েছে তাদের নাগরিকরাও এই সর্বনাশের কবল থেকে রেহাই পায় না, কারণ বাজার এক নির্মম শক্তিক্ষেত্র। বৃহৎ শক্তিগুলোর তত্ত্বাবধানে সাম্রাজ্য গড়ে উঠতে থাকে, জাতি নিরপেক্ষ বিশ্বসংহতির নামে। এই দানবীয় প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার মরণপণ চেষ্টায় অনেক দেশের লোক যদি লৌকিকতায় ফিরতে গিয়ে প্রথম দফায় ঐতিহ্যের অলৌকিককেই আঁকড়ে ধরে,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
প্রশ্রয়ের আকাঙ্ক্ষায়, তখন এর প্রতিক্রিয়াশীলতার বিপদ সম্বন্ধে অবহিত থেকেও প্রগতিপন্থীদের হয়তো এ বিষয়ে অনেকখানি ক্ষমাশীল, সমঝদার মনোভাব আয়ত্ত করতে শেখার দরকার হয়। সহিংস আন্দোলন বা মতবাদের ধ্বনির প্রাসঙ্গিকতা অনেকটা কমে যায়, কারণ পরিস্থিতির বিপ্লবোন্মুখ স্পষ্টতা যেটুকু ছিল তা চলে গেছে। নতুন স্পষ্টতা অর্জন করবার প্রয়োজনে সকলেরই আজ পরস্পরের চেষ্টা বা তাগিদ বুঝে নেবার ব্যাপারে অনেকটা ক্ষমা করতে শেখা, অনেকটা এমনকি না বুঝেও আপাতত ছেড়ে দিতে শেখা, প্রধানতর এক কর্তব্য হয়ে দেখা দেয়। এই পটভূমিতে যারা চিন্তাশীল এবং পরিবর্তন আনতে ইচ্ছুক তাদের জীবনে হয়ত যে বিজ্ঞান পরিস্থিতি বোঝার কাজটাতেই সাহায্য করতে পারে সেই চিহ্নবিজ্ঞান এমন এক গুরুত্বের দাবি করবে যা এক কালে কর্মের বিজ্ঞান অর্থাৎ রাজনীতিরই প্রাপ্য ছিল। কিন্তু চিহ্নবিজ্ঞান আজ যেভাবে সেজে রয়েছে তাতে অনেক বিভ্রান্তি, অনেক কষ্টকল্পনা ওত পেতে আছে। কী নেব, কী নেব না, এ নিয়ে সতর্ক হয়ে এগোনে দরকার, এবং শেষ পর্যন্ত চিহ্নবিজ্ঞানের উদীয়মান নতুন রূপ স্পষ্ট করার কাজে অংশও নিতে হবে। সেই সতর্কতারই পূর্বভূমি তৈরি করবার জন্যে চাই চিত্তশুদ্ধি। অর্থাৎ নিজেদের মনের পথ-চলাটার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে নেওয়া জরুরী। আমাদের এখনকার চিন্তার প্রতিভূ-স্থানীয় শিশিরকুমার দাশ আর বাদল সরকারের দিকে মন দিতে হচ্ছে সেজন্যই। সুকান্তের কবিতায় যে বোধের নিদর্শন ছিল সেই পাথেয় সম্বল করে আমাদের সংস্কৃতির স্বকীয় ভাবনা কতদূর এসেছে সেটা দেখলে তো একরকম নিজেকেই দেখতে পাওয়া যায়।

বাদল সরকারের জবানিতে এবার তাহলে নিজেদেরই কথা শোনা যাক।—'এই সমাজে আমাদের জীবনযাত্রার প্রায় সব ক্ষেত্রেই মুক্তির একান্ত অভাব। যত বেশি "সভ্য" হচ্ছি আমরা, মুক্তির অভাব ততই যেন বাড়ছে। জটিল সমাজব্যবস্থার লিখিত ও অলিখিত অসংখ্য জটিল নিয়মকানুন আমাদের স্বভাবকে নানা বন্ধনে জড়িয়ে বন্দী করছে।

'স্বভাবকে বন্দী না করলে সমাজ বাঁচে না—এই কথা শোনানো হয়। সমাজরক্ষার নাম করে বহু অনুশাসন সর্বসাধারণের ঘাড়ে চাপানো আছে, যা আসলে সমাজের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশকে রক্ষা করে এবং বৃহৎ অংশটিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়…আপাতত এইটুকু অন্তত বলা যায় যে যাকে আমরা "স্বাভাবিক" ব্যবহার বলে জানি এই সমাজে, তার প্রায় সবটাই চূড়ান্ত অস্বাভাবিক। মুখোসের আড়ালে সত্যিকারের স্বভাবকে ঢেকে রাখা আমাদের সভ্য সমাজের অনুশাসন।

'এই মুখোস-পরা জীবনযাত্রার কথাবার্তা মুখভঙ্গী চলাফেরা আমরা নকল করি তথাকথিত বাস্তবধর্মী বা ন্যাচারালিস্টিক থিয়েটারে। …এ অবস্থায় এটা বিচিত্র নয় যে বহু নাট্যগোষ্ঠীর প্রতীকচিহ্নে, স্মারকপত্রে, নাটক বা থিয়েটার-সংক্রান্ত বইয়ের মলাটে মুখোসের ছবি দেখা যায়। মুখোসকেই যেন থিয়েটারের প্রতীক বলে মানি আমরা, থিয়েটার মানেই যেন মুখোস পরা।

'কিন্তু…[ভিতরের স্বাভাবিক সত্তাকে] যদি টেনে বার করে আনা যায় থিয়েটারে, তবেই হয়তো সত্যিকারের বাস্তবধর্মী থিয়েটার হয়। কিন্তু তাকেই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আমরা বলি অবাস্তব, অস্বাভাবিক। মুখোস এমনভাবে এঁটে গেছে আমাদের মুখে যে মুখোসটাকেই স্বভাব বলে ভুল করি আমরা, বন্দিত্বকে ভুল করি মুক্তি বলে।

'অথচ…থিয়েটারে মুখোস খুলে ভিতরের সত্তাকে প্রকাশ করা সম্ভব। এবং তা যদি পারি, তবে সে থিয়েটার দেখতে দেখতে অজান্তে হয়তো দর্শকেরও মুখোস খসবে একটু একটু করে। তখন স্বভাবে স্বভাবে লেনদেন হবে, মানুষের সত্তায় সত্তায় যোগাযোগ।

'…এই যোগাযোগেই মুক্তি। স্বভাবের মুক্তি—প্রথমে অভিনেতার, তারপর দর্শকের। এই থিয়েটারই প্রকৃত অর্থে, সব অর্থে, ফ্রী।

'তৃতীয় থিয়েটার [অর্থাৎ পশ্চিমী-স্বাভাবিকবাদী থিয়েটার আর যাত্রাজাতীয় লোকনাট্য এ দুয়ের বিকল্প এক পরীক্ষামূলক তৃতীয় পথ] নমনীয়, বহনীয় এবং সুলভ থিয়েটার—আগে দেওয়া এই অসম্পূর্ণ সংজ্ঞার উপরে এখন এই কথাটাও যোগ করা যেতে পারে—তৃতীয় থিয়েটার "ফ্রী থিয়েটার"।' (পৃ. ৭৪—৭৬)

এই যে মানুষের মুক্তি, এর সূত্রে বাদল সরকার বলেন যে থিয়েটারের 'সবচেয়ে বড়ো কথা হলো—মানুষের স্বীকৃতি', তৃতীয় থিয়েটারে 'শিক্ষা বুদ্ধির মাধ্যমে ততটা ঘটে না, যতটা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ঘটে', যাতে শেখা যায় 'কী করে মুখোমুখি হতে হয় নিজের গভীরতম সত্তার সঙ্গে' (পৃ. ৭৮)। শুধু নিজের নয়, পরেরও, যে পর আসলে পর নয়, মানুষই :

'নাটকটাকে কাঁধে করে বহন করা প্রকৃত তৃতীয় থিয়েটার নয় ; নাটকের মুখোমুখি হয়ে, নাটকটাকে নিজস্ব করে নিয়ে, নাট্যবিষয়ের প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভূত অনুভূতির প্রকাশ তৃতীয় থিয়েটারের মূলনীতি। "ভোমার ক্ষুধা লাগে" এই পংক্তি যে অভিনেতা উচ্চারণ করবে, তার নিজের হয়তো ক্ষুধার কষ্ট হয় নি কোনোদিন ; কিন্তু ক্ষুধা সম্বন্ধে একটা অনুভূতি তার আছে, ক্ষুধার্তকে দেখলে একটা মানসিক প্রতিক্রিয়া তার হয়, ক্ষুধার কারণ সম্বন্ধে তার একটা ধারণা আছে। সেই অনুভূতি-প্রতিক্রিয়া-ধারণা কী করে শরীরে কণ্ঠস্বরে বাচনে বার করে আনতে হয়—সে শিক্ষা যদি সে পেয়ে থাকে, তবেই কথাটা পৌঁছোবে দর্শকের অন্তরে। সেইটাই হবে প্রকৃত্ তৃতীয় থিয়েটারের ভাষা। বাঙলা-হিন্দী ইংরিজী নয়, মুখোস-পরা মানুষের সাজানো ভাষা নয়, স্বভাবের ভাষা, মানুষের ভিতরের সত্তার ভাষা' (পৃ ৭৯)।

এইজন্যে আঙ্গিক বা উপকরণের বৈশেষিক পেশাদারিকে প্রশ্রয় দেওয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর নতুন কারণ দেখা দেয়—'শিল্পকে শিল্পীর জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না তৃতীয় থিয়েটারে। তৃতীয় থিয়েটারের শিক্ষাপ্রণালীতে তাই শিল্পীর জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন কোনো কায়দাকৌশলের স্থান নেই' (পৃ. ৭৮)। ওরকম কৌশল ব্যবহার করা মানে তো মানুষের আসল সম্পদকে অস্বীকার করে বহিরঙ্গের চর্চা, যা শেষ পর্যন্ত 'নিষ্প্রাণ অলংকরণে পরিণত হবে' (পৃ. ৫৩)। আদিম উপচার বা রিচুয়ালেরই বিবর্তনক্রমে থিয়েটার এসেছে। তার আসল উপকরণ প্রাণ আর উপস্থিতির প্রত্যক্ষতা।—

'থিয়েটারে মানুষে মানুষে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, তাই থিয়েটারে যা ঘটে তা মানবিক ক্রিয়া…সিনেমায়, টেলিভিশনে এ সুযোগ নেই—সেখানে মানুষ-অভিনেতা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
স্বশরীরে উপস্থিত নেই, আছে মানুষের ছবি। এই দৃষ্টিতে থিয়েটারের অপরিহার্য উপকরণ হচ্ছে—মানুষের দেহ। দেহ কথাটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গেই সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের কণ্ঠস্বরও তার দেহের অংশ, মানুষের ভাষা জ্ঞান বুদ্ধি অনুভূতি—সবই তার দেহের অঙ্গীভূত; সেই অর্থে মানবদেহ বলতে পুরো মানুষটাকেই বোঝায়' (পৃ. ৩৪-৩৫)।

মনে রাখা চাই, আমরা মুখোস-পরা সীমাবদ্ধ দৈনন্দিনে যাকে চিনি সে দেহ আসলে পূর্ণ দেহক্ষেত্রের বিকল একপেশে প্রেত মাত্র: 'আমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার সীমিত অঙ্গচালনা ও স্বরক্ষেপ নকল করার গণ্ডীতে আটকে না থেকে সারা শরীরের পূর্ণতম ব্যবহারের চেষ্টা করা উচিত' (পৃ. ৩৬)। 'থিয়েটার বোধহয় বর্তমান সভ্য জগতে একমাত্র ক্ষেত্র, যেখানে স্বভাবকে অন্তত সাময়িকভাবেও মুক্তি দেওয়া সম্ভব। নাচা, গাওয়া, হাসা, কাঁদা, চীৎকার করা, ডিগবাজী খাওয়া—সবই সম্ভব থিয়েটারে…কেউ ঢিল ছুঁড়বে না, কেউ পাগলা গারদে ভরবে না। এমন সম্ভাবনাময় থিয়েটারকে কৃত্রিমতার নকলে সীমাবদ্ধ রেখে ন্যাচারালিজ্‌মের ধ্বজা ওড়ানো কেন তবে?' (পৃ. ৩৭)।

শুধু অভিনেতার নয়, দর্শকেরও প্রত্যক্ষ উপস্থিতি থিয়েটারে অপরিহার্য; চলচ্চিত্র অধ্যুষিত যুগে নাটক আর 'বাস্তবের ইলিউশন সৃষ্টির তাগিদে' চলতে পারে না, আজকের নাটক সহজ ইঙ্গিতের সাহায্য নেয় যার কাজ 'দর্শককে ভোলাবার চেষ্টা না করে শুধু বুঝিয়ে দেওয়া যে এটা ঘর, এটা পথ, এটা বাগান। অর্থাৎ দর্শকের নিজস্ব কল্পনাশক্তির সাহায্য নেওয়া' (পৃ. ৩৮)। দর্শককে ভুলিয়ে, তার দৈনন্দিন দৃষ্টির অভ্যাসকে সকৌশলে ব্যবহার করে নয়, দর্শকের মানবিক কল্পনাশক্তির সাহায্য নিয়ে চলে এ নাটক। এ অভিজ্ঞতায় দর্শকও তাহলে ব্যবহৃত উপকরণমাত্র না, সমান মর্যাদার সহযোগী। প্রত্যক্ষ যোগাযোগের এটাই দাম—এই সহযোগী-সম্পর্ক পাতাতে পারা।

এ ধরনের সম্পর্ক পাতিয়েই একটা জাতির পক্ষে নিজেকে সংস্কৃতিমঞ্চ হিসেবে, মানুষের যৌথ জীবনের ক্ষেত্র হিসেবে, এবং শেষ পর্যন্ত জাতি হিসেবে রচনা করা সম্ভব। সে জোর পেলে তবেই আজ সাম্রাজ্যবাদের তরফ থেকে, ব্যক্তিস্বার্থ-সর্বস্ব বাণিজ্যিক জীবনরীতির তরফ থেকে, জাতিত্ব ব্যাপারটার উপরেই যে আক্রমণ আসছে তার বিরুদ্ধ সংগ্রামে সাফল্যলাভের আশা করা যায়। জাতি তার আত্মরচনার সূত্রে নিজের স্বরূপে পুরোনো যে যে উপচারকে আন্তরিক মনে হয় সেগুলোকে ফিরিয়ে আনতে পারে। প্রাচীন গ্রীক আর ভারতীয় রসশাস্ত্র জানত, সাহিত্যিক রসাস্বাদের পূর্ণ চেহারা নাটকেই পাওয়া যায়। এ যুগে কবিতাকে সাহিত্যের কেন্দ্র করে তুলে তার কাজ নিয়ে যা ভাবা হয়েছে সেটা ব্যক্তির সত্তাভাবনার এলাকা। নাটকের পূর্ণতা আর ব্যক্তির বিশিষ্টতা যে নতুন রচনায় মিলবে তার ভূমি গড়তে হবে আজকের দিনের ব্যক্তিদের। জাতির প্রশ্রয়ে বিকশিত মানব-সত্তাকে চাপা দিয়ে প্রতিযোগী জগতে যান্ত্রিক সম্বন্ধ পরোক্ষতার ছয়লাপে এক বহুজাতিক ষড়যন্ত্র ঘনিয়ে উঠেছে, এর প্রতিপত্তিকে হারিয়ে দিতে হবে মনের জমিতে, সেখানেই আসল লড়াই। সেই সংগ্রামের মধ্যে আমরা বুঝতে শিখব,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শ্বাসরোধী এক নিছক ব্যক্তিমাহাত্ম্যের জয়যাত্রা কীভাবে সকলের মানবিক ঐশ্বর্যকে নিষ্প্রভ করে রাখছিল, এবং কী করে এর সর্বব্যূহ কেটে বেরিয়ে সবাই খোলা চোখে পরস্পরনির্ভর বৃত্তে সমবেত হয়ে নতুন এক জ্যোতিকে আসতে দিতে পারি। সেই জ্যোতি কড়ি আর কোমলের প্রকৃত যুগ্মতার সূত্র ধরিয়ে দেবে; গদ্যের কড়া হাতুড়ির কড়াকড়ি আর কবিতার কোমল স্নিগ্ধতার মধ্যে কোনো আপোস বা সহাবস্থানের জোড়াতালি দিয়ে আমাদের ফুটো ব্যক্তির নৌকো চালাতে হবে না আর।

FORWARDED FREE OF COST, AND WITH
THE COMPLEMENTS OF THE DEPARTMENT OF
EDUCATION, GOVT OF INDIA, NEW DELHI

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অঞ্জন সেন

কবিতার ভাষা ঃ কয়েকটি সূত্র

১.১. কথা, কথার মানে, বাক্যে বা বয়ানে কথার এক চেহারা আর সমবেত চেহারা, কথার অর্থবাচকতা, সৌকর্য, এ সব বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত চিহ্নবিজ্ঞানে আর ভাষাবিজ্ঞানে (এবং এর শাখা প্রশাখায়, যেমন বাগর্থতত্ত্বে অথবা শৈলীবিজ্ঞানে) যে সব আধুনিক গবেষণা হয়েছে বা হচ্ছে তার ভিত্তিতে বাংলায় কবিতার ভাষা বিষয়ক আলোচনার সবেমাত্র সূত্রপাত হয়েছে। এই নিবন্ধে এই সমস্ত বিজ্ঞানের সাহায্যে কবিতার ভাষা বিষয়ে কিছু প্রাথমিক সূত্র রাখা হয়েছে—কবি, সাহিত্য-তত্ত্ববিদ্, ভাষাবিজ্ঞানী, চিহ্নবিজ্ঞানী এবং পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। নিবন্ধকারের এ সব বিষয়ে এবং সাহিত্যে পদ্ধতিগত শৃঙ্খলে শিক্ষা নেই, তাই তত্ত্ব ও সূত্রের বিশ্লেষণে কিছু ভুল থেকে যেতে পারে। প্রবাল দাশগুপ্ত এ নিবন্ধের কিছু কিছু উদ্ধৃতির পরিমার্জনা, কিছু পরিভাষা তৈরি (যেমন Structure অর্থে আকরণ, গ্রন্থন, Text অর্থে কৃতি, বয়ান, Intonation=স্বরন্যাস, Graphic Construction=রেখাগত আকল্প ইত্যাদি) এবং কিছু বিশ্লেষণ পরিষ্কার করে দিয়েছেন। শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ গুপ্ত, অম্লান দাশগুপ্ত, শিশিরকুমার দাশ নানাভাবে মতামত দিয়ে, সমালোচনা করে সাহায্য করেছেন। য়ুরি লোৎমন JURIJ LOTMAN-এর The Structure of the Artistic Text বইটি থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি, প্রবাল দাশগুপ্ত, অমিতাভ গুপ্ত এবং অম্লান দাশগুপ্ত বাংলায় অনুবাদ করে দিয়েছেন। উদয় নারায়ণ সিংহ এবং তরুণ ভট্টাচার্যও নানাভাবে সাহায্য করেছেন। এই নিবন্ধ শেষ করে উঠতে পারার জন্য এঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। বেশ কিছু উদ্ধৃতি এবং টীকা পাঠকদের বিরক্তি উৎপাদন করতে পারে, সে ক্ষেত্রে জানাই দেশে ও বিদেশে অত্যন্ত উচ্চমানের গবেষণার ফল থেকে আমরা বঞ্চিত হব কেন ?

১.২. সাহিত্যতত্ত্ববিদ্ জিগমুন্ট চের্নি ZIGMUNT CZERNY ভাষার গ্রন্থন সারল্য থেকে গ্রন্থন জটিলতার উত্তরণের বর্ণালীর এই চেহারা পেশ করেছেন, "কেজো গদ্য (বিজ্ঞান—প্রশাসন—সামরিক—আইন—বাণিজ্যের গদ্য)—সাধারণ গদ্য—সাহিত্যিক গদ্য—গদ্যকবিতা—ছন্দিত গদ্য—অমিত্রাক্ষর কাব্য—অসম আকৃতির স্ট্রফি—অসম পঙ্‌ক্তি ও দৈর্ঘের ছন্দোবদ্ধ কাব্য—ধ্রুপদী কবিতা।" ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে বলা যায় আদি যুগে মৌখিক শিল্পের একমাত্র কথন ছিল কাব্যিক কথন—যেমন মন্ত্র পাঠ, সামবেদ গান, রামায়ণ গান। শিশুর কাছে মৌখিক শিল্পের প্রথম রূপ সব সময়েই কবিতা, পদ্য, ছড়া—যেটি একটি শিল্পিত কথন,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
যা সাধারণ কথনের মত নয়। প্রথমে ভাষার [শিল্পিত] বিষমীভবন এসেছে—সাধারণ কথন থেকে পৃথকীকরণ এসেছে; পরে এসেছে সমীভবন। এই বিষমীভবন থেকেই বাস্তবতার ছবিটি তৈরি হয়েছে।[১] এই নিবন্ধের পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখতে পাব কবিতার ভাষার সারল্য কেমন করে কৃতি অতিরিক্ত গ্রন্থনের (EXTRA—TEXTUAL—STRUCTURE) জটিলতা বাড়ায়।

১.৩. আলোচনার সুবিধার্থে, তাত্ত্বিক বিতর্কে না গিয়ে কাব্যিক কৃতিকে দু ভাগে বিভক্ত করতে চাই—'কাব্য' এবং 'কবিতা'। 'কাব্য' হচ্ছে প্রচলিত ছন্দ-মিলের নিয়ম শৃঙ্খলে বাঁধা, শৃঙ্খলের শিল্পিত কথন আর 'কবিতা' হচ্ছে অশৃঙ্খলের শিল্পিত সংহত কথন, প্রচলিত ছন্দ ভাঙার শিল্প। কবিতা ভাষাকে নীরবতার দিকে ঠেলে দিয়ে দেখিয়ে দিতে চায় এই ঠেলে দেওয়া আর কাব্যের প্রথম স্তরটি সাধারণ ভাষার মত সাধারণ চিহ্ন (Sign) ব্যবহার ক'রে প্রাথমিক বাচক-বাচ্য (Signifier-Signified) দ্বারা সাধারণ প্রাথমিক অর্থ প্রকাশ করে। দ্বিতীয় স্তরে, প্রাথমিক বাচক-বাচ্য দ্বারা গঠিত জোড় দ্বিতীয় স্তরের অর্থ বা বাচ্যকে প্রকাশ করে। কবিতা এই দ্বিতীয় স্তরের বা প্রথম স্তরের পদ্ধতির অনির্দিষ্ট ভ্রমণে অবিকৃত সত্যিকারের বাচ্যকে বহন করে যা বাচক চায় না, চায় শূন্যতা।[২] এই তত্ত্বে বিষয়টি পরিষ্কার হ'ল না, কাব্যের লক্ষণ কবিতা ও গদ্যে ঢুকে পড়তে পারে, গদ্য এবং কবিতার লক্ষণ কাব্যে ঢুকে পড়তে পারে। কোথাও কোনো বিন্দুতে কবিতা ও গদ্য এক হয়ে যায়। এ বিষয়ে শিশিরকুমার দাশ উল্লেখযোগ্য বিশ্লেষণ করেছেন 'গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব' বইটিতে, এ সংকলনে লিখেছেন 'বিপ্রতীপ ক্রম' নিয়ে; প্রবাল দাশগুপ্ত এই সংকলনেই লিখেছেন 'গদ্যের কড়া হাতুড়ি'। এই সমস্ত আলোচনা কবি, সমালোচক ও পাঠকদের কবিতা সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করতে সাহায্য করবে। কবিতার একটি পঙ্‌ক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা করে দেখালে গদ্য বলে মনে হতে পারে, তেমনি গদ্যের একটি পঙ্‌ক্তিকে আলাদা করে দেখালে কবিতা বা কাব্য বলে মনে হতে পারে। কবিতার কথনকে তাই তার রেখাগত-আকল্প দিয়েও বোঝা দরকার। "আকল্প-নির্দেশকগুলি কেবল একটি বয়ানের বুনেটের যান্ত্রিক উপায় নয়, আকরণের স্বভাবের ইশারা, চেতনার সঙ্গে মিশে গিয়ে পাঠককে কৃতি-অতিরিক্ত গ্রন্থনের দিকে ঠেলে দেওয়া"।[৩] গদ্য সামগ্রিক বিস্তারের শিল্প আর কবিতা সংহতির, ঘন নিবদ্ধতার শিল্প।

২.১. কবিতার ভাষা আলোচনায় ভাষাতত্ত্বের দুটি সূত্রের, 'গোষ্ঠী ভাষা' (Sociolect) ও 'ব্যক্তিভাষা' (Idiolect), আলোচনা আমার কাছে খুব জরুরী মনে হয়েছে। 'গোষ্ঠী ভাষা'কে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে এক শ্রেণীর সামাজিক গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিদের উপভাষা। যেমন কলকাতার নাবিকদের গোষ্ঠীভাষা, বীরভূমের তাঁতিদের গোষ্ঠীভাষা, মেদিনীপুরের ক্ষেতমজুরদের গোষ্ঠীভাষা, কলকাতার বাংলার অধ্যাপক শ্রেণীর গোষ্ঠীভাষা, পশ্চিম বঙ্গের বাঙালি কবিদের গোষ্ঠীভাষা। ভাষা-সাহিত্য এবং তার সঙ্গে শিল্প সংস্কৃতি নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন তাঁদের উপভাষা ইংরিজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের পদস্থ চাকুরের উপভাষার থেকে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আলাদা। দৃষ্টান্ত হিসেবে পাঁচজন বাঙালি কবির কথা উল্লেখ করা যায়—জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে এবং বুদ্ধদেব বসু। এঁরা পাঁচজনই উচ্চশিক্ষিত, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছেন, শিল্প সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখেছেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা এঁদের উপ-ভাষাকে সাধারণ বাঙালির উপভাষা থেকে পৃথক করে রেখেছে। এঁদের প্রত্যেকের ব্যক্তিভাষাই খানিকটা আকৃত। এ ভাবে আমরা আরো কবির সামাজিক গোষ্ঠীর পটভূমি অনুসন্ধান করে বুঝতে পারব সকলের সামাজিক পটভূমির পার্থক্য অনুসারে কবিতার ভাষায় খানিক পার্থক্য এসেছে। এই সময়ের আরেক কবি, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ভাষা সাহিত্যের অধ্যাপনা না করে, পদ্ধতিগত পাঠ না নিয়ে নিজস্ব ভাবে ভাষা সাহিত্যের চর্চা করেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার ভাষাও তাই লক্ষণীয়।

২.২. ভাষাতত্ত্ব বলে প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তি ভাষায় কিছু তারতম্য আছে। ১৪ কোটি বাঙালির প্রত্যেকের কথাবার্তার ভাষা একটু আলাদা। তাই ব্যক্তি-ভাষাকে একজন মানুষের উপভাষা বলা যায়। কবিতার ভাষা বিশ্লেষণ করতে গেলে তাই কবির ব্যক্তিভাষার অনুসন্ধান করা দরকার।

২.৩. কবির সচেতন ভাবে আকৃত ব্যক্তিভাষাই তাঁর কবিতার ভাষা। আকৃত কথাটাকে এ ক্ষেত্রে আমাদের বুঝে নিতে হবে। কবি যেভাবে কথাবার্তা বলেন লেখার সময় সেটা খানিকটা পাল্টে যায় নানারকম ভাবে। কবি তাঁর বাক্যকে আকৃত করেন কবিতার প্রয়োজনে। একেক কবির একেক কবিতায় এই আকরণ প্রক্রিয়া আলাদা। কেউ কর্তা—কর্ম—ক্রিয়ার স্বাভাবিক অবস্থানকে ঘুরিয়ে দেন, কেউ তার সঙ্গে নিয়ে আসেন তৎসম, দেশজ বা বিদেশী শব্দ যেটা দৈনন্দিন কথাবার্তার ভাষায় পাওয়া যায় না। কখনো কখনো কবিতার ভাষা অতি আকৃত করা হয় আর কাব্যের ভাষায় অতি আকরণ ছিলই। কাব্যে মিলের জন্য ভাষাকে একভাবে আকৃত করা হ'ত।

২.৪. ব্যক্তিভাষা বিষয়ে চমৎকার বিশ্লেষণ পাই সুশীলকুমার দে'র 'বাংলা প্রবাদ' (১৯৪৫) বইটির নিবেদন অংশে, "ইহা সত্য যে, লেখক্-বিশেষের ব্যক্তিগত ভাষার রীতি তাহার বিশিষ্ট পরিকল্পনা বা অন্তর্গত ভাব প্রবাহের উপর নির্ভর করে; কিন্তু একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, ভাষার সাধারণ ভাব-প্রকাশের যে পদ্ধতি, বাক্যরীতির যে চিরন্তন ভঙ্গী, তাহার গুপ্তমূল কেবল ব্যক্তির মনোভূমিতে নয়, জাতির রসচেতনার মধ্যেও বিস্তৃত।...ভাষার এই স্বভাবধর্মের নিখুঁত লক্ষণ নির্দেশ করা যায় না, কারণ ইহা যুগে-যুগে বহু মনীষীর সাধনার বৈচিত্রে পরিস্ফুট।......ইহা জাতির আত্মচৈতন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার স্বকীয় চিন্তার ধারা, রীতি-নীতি, চাল-চলন, রাগ-বিরাগ, ভাব-কল্পনার স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশ-পদ্ধতি। বাংলা ভাষারও এইরূপ একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী আছে, যাহাতে শুধু ব্যক্তিগত ভাবনা নয়, সমষ্টিগত প্রাণের চেতনাও নিজস্ব রূপ ধারণ করে। সাধু বা কথ্য ভাষার প্রশ্ন নিরর্থক, কারণ যাহা বাংলার প্রকৃত ভাষা তাহা সাধুও নয়, কথ্যও নয়, তাহাই ইহার একমাত্র সুস্থ সুন্দর প্রাণবান ভাষা, ইহার স্বাভাবিক প্রকাশধর্মের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
ও ঐতিহাসিক পরিণতির সহজ বিকাশ।"[৪] এডোয়ার্ড সাপীর তাঁর 'ভাষা' বইটিতে লিখেছেন, সেকস্‌পীয়ার বা হাইনে প্রভৃতি সাহিত্যের শিল্পীরা জানতেন তাঁদের দৈনন্দিনের কথনকে কিভাবে সাহিত্যে প্রয়োগ [আকৃত] করতে হয়। তাঁদের লেখায় তাই কোনো পরিশ্রমের চিহ্ন নেই। ...ভাষার কথন বিশ্বস্তভাবে সেই সংস্কৃতিকে প্রতিফলিত করে যে সংস্কৃতির উদ্দেশ্য ভাষা সাধন করে। সংস্কৃতির ইতিহাস তাই ভাষার ইতিহাসের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে চলে।[৫] রবীন্দ্রনাথে পাই, "এই ছবি-গান-কাব্যকে আমরা গড়ে তোলা জিনিস বলে অনুভব করিনে; মনে লাগে যেন তারা হয়ে-ওঠা পদার্থ। তাদের মধ্যে উপাদানের বাহ্য সংঘটনটা অত্যন্ত বেশি ধরা দেয় না; দেখা যায় উদ্ভাবনার একটা অখণ্ড প্রকাশ, যে প্রকাশ একান্ত ভাবে আমাদের বোধের সঙ্গে মেলে।...ছবি-গান-কাব্যও আপন ছন্দস্পন্দনের চল্‌দবেগে আমাদের চৈতন্যকে গতিমান্‌ আকৃতিমান্‌ করে তুলেছে নানাপ্রকার চাঞ্চল্যে।[৬]" ব্যক্তিভাষার সঙ্গে সমাজ-সংস্কৃতির যোগসূত্র এই তিনটি উদ্ধৃতিতে পাওয়া গেল।

২.৫. ব্যক্তিভাষার আকরণ, [আকরণের বা গ্রন্থনের বদলে কোনো কোনো নিবন্ধকার আঙ্গিক-সংস্থান, গঠন, গঠন-প্রণালী, সংগঠন বা সংরচনাও ব্যবহার করেছেন] ভাষার আকরণ সূত্রটি আরেকটু বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করা যাক। প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে, সাহিত্যবিদ্যায় ভাষা আকরণের পূর্ব-ভাবনাটি কোথাও কোথাও পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমান সংকলনে (পৃ. ৫—৮) বিমলকৃষ্ণ মতিলাল কুন্তকের বক্রোক্তিজীবিত নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখানে যাযাবরীয় রাজশেখরের (খৃ. নবম শতক) 'কাব্যমীমাংসা'র নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকৃত বাংলা অনুবাদ থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিলাম, "যতক্ষণ পর্যন্ত রচয়িতার মন সন্দেহ-দোলায় দোলায়মান, ততক্ষণই পদসমূহের গ্রহণ ও বর্জন চলিতে থাকে। পদসমূহের স্থিরতা সম্পাদিত হইলে তো কবি কাব্যরচনায় সিদ্ধিলাভ করেন!...যেখানে পদগুলি অপরিবর্তনীয় (অর্থাৎ পদ পরিবর্তন করিলে ভাবের ব্যাঘাত ঘটে), সেখানে শব্দার্থবিচারপটু মনীষিগণ 'শব্দ-পাকে'র কথা বলিয়া থাকেন।... বক্তা, বক্তব্য বিষয়, তদুপযোগী শব্দ এবং ঈপ্সিত রস থাকিলে, তাহাতে (পাক) বর্তমান থাকে; ইহা ব্যতীত বাঙ্‌-মাধুর্য ক্ষরিত হয় না।... সাহিত্যে 'পাক' শব্দের অর্থ পরিণত অবস্থা"[৭] [আমরা এই অবস্থাকে আকৃত অবস্থা বলতে পারি]। "বামনের মতে কবিগণের এই ক্ষমতার নাম 'আবেক্ষণ'।" "আনন্দবর্ধন এবং ক্ষেমেন্দ্র ধন্যালোক ও ঔচিত্যবিচারচর্চা গ্রন্থে 'পাক' শব্দের পরিবর্তে 'ঔচিত্য' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।" নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর আলোচনায় আমরা জানতে পারি রাজশেখর প্রাকৃত [দৈনন্দিনের] ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি রাজশেখরের বিভিন্ন নাটকের [দৃশ্যকাব্যের] আলোচনা প্রসঙ্গে রাজশেখর উদ্ধৃত করেছেন, "কোনও বিষয় সংস্কৃত ভাষায় সুরচিত ও সুষ্ঠ প্রকাশিত হয়; আবার কোনও বিষয়ে প্রাকৃত ভাষায়, কোনটি অপভ্রংশে, কোনটি বা ভূতভাষাক্রমে সুরচিত হইয়া থাকে। কোনও বিষয়ে দুইটি বা তিনটি ভাষায় রচিত হয়, কোনটি বা চারটি ভাষায় বিবেচিত হয়।"[৮] বিমলকৃষ্ণ মতিলাল বর্তমান নিবন্ধকারকে জানিয়েছেন সংস্কৃতে আনন্দের সঙ্গে রসাস্বাদনের সম্পর্ক রয়েছে এবং রসের পারিভাষিক অর্থে যা বলা হয়েছে তার মধ্যে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
ক্রোধ, বিষাদ, বিস্ময় সবই অন্তর্ভুক্ত।

এক হাজার বছর পরে রবীন্দ্রনাথে পাই, "সাহিত্যে আমরা যে ভাষা ব্যবহার করি ক্রমে ক্রমে তার একটা বিশিষ্টতা দাঁড়াইয়া যায়। তার প্রধান কারণ সাহিত্যে আমাদিগকে সম্পূর্ণ করিয়া চিন্তা করিতে এবং তাহা সম্পূর্ণ করিয়া ব্যক্ত করিতে হয়, আমাদিগকে গভীর করিয়া অনুভব করিতে এবং তাহা সরস করিয়া প্রকাশ করিতে হয়।··· অতএব এই উদ্দেশ্যে ভাষাকে বাছিতে সাজাইতে এবং বাজাইতে হয়। এই জন্যই স্বভাবতই সাহিত্যের ভাষা মুখের ভাষার চেয়ে বিস্তীর্ণ এবং বিশিষ্ট হইয়া থাকে।"[৯] পদ সমূহের গ্রহণ বর্জন, ভাষাকে বেছে সাজানো—ভাষাকে আকৃত করা। ব্যক্তিভাষার সচেতন আকরণ—সম্মত ভাষার সঙ্গে গোষ্ঠীভাষা, উপভাষা ব্যবহার, তৎসম তদ্ভব শব্দের সঙ্গে দেশজ, গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার, নানা ধরনের পদক্রম তৈরি করে, নানাধরনের শব্দ পাশাপাশি ব্যবহারে করা হয়। ব্যক্তিভাষার গ্রন্থন কবির সাহিত্য কৌশল।

হাথেরে কাঙ্কণ মা লোউ দাপণ ॥

—সরহপাদ, চর্যাপদ

দেখিল পাকিল বেল গাছের উপরে।
আরতিল কাক তাক ভখিতেঁ না পারে ॥

—বড়ু চণ্ডীদাস

বরিন্দর উত্তরে গেলাম বড় গঙ্গা পার।
তথায় করিনু আমি বিদ্যার উদ্ধার ॥

—কৃত্তিবাস

কি ছার পিরীতি কৈলা জীয়ন্ত বধিয়া আইলা
বাঁচিতে সংশয় ভেল রাই
শফরী সলিল বিন গোঙাইব কত দিন
শুন শুন নিঠুর মাধাই।

—মুরারী গুপ্ত

মন্দির-বাহির কঠিন কপাট
চলইত শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।
তঁহি অতি দূরতর বাদল-দোল
বারি কি বারই নীল-নিচোল।

—গোবিন্দদাস কবিরাজ

কি জানি লিখিছে বিধি এ পাপ করমে
পাইয়া পরশমণি হারাইলাম ভ্রমে।
সে সব মনের দুঃখ কাহাকে কহিব
ব্যথিত বান্ধবকুল স্মরিতে মরিব।

—আলাওল

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দুটায় মরিস কেন ডাকাডাকি করি।
তারি কাছে আগে যাব যে লইবে ধরি ॥

—ভারতচন্দ্র

এবার কালী তোমায় খাব।
(খাব খাব গো দীন-দয়াময়ী)
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার।
গণ্ডযোগে জনমিলে
সে হয় মা খেকো ছেলে

—রামপ্রসাদ সেন

প্রাণ জান তো তুমি পিরীতের রীত।
বিচ্ছেদ হইলে মন সুখেতে থাকয়ে যত ॥

* * *

তোমারই তুলনা তুমি প্রাণ, এ মহীমণ্ডলে।
আকাশের পূর্ণশশী, সেও কাঁদে কলঙ্ক ছলে ॥

—রামনিধি গুপ্ত

কে ভুলালো হায়
কল্পনাকে সত্য করি জান, এ কি দায়।
আপনি গড়হ যাকে
যে তোমার বশে তাঁকে

—রামমোহন রায়

খাঁচার মাঝে অচিন পাখি
কম্‌নে আসে যায়,
ধরতে পারলে মনো-বেড়ি
দিতেম পাখির পায়।

—লালন ফকির

বাক্যহীন ক্রোধে অশ্ব, নিরখি এ লীলা,
ভোজবাজি কিম্বা স্বপ্ন! নয়ন মুদিলা ;
উন্মীল ক্ষণেক পরে কুরঙ্গে দেখিলা,
রঙ্গে শুয়ে তরুতলে ; দ্বিগুন আগুন হৃদে জলে ;

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

এ নয় তোদের ভারতবর্ষ চির-হর্ষময়
স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে ? এ দেশ তোদের নয়।

—গোবিন্দচন্দ্র দাস

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মোটা মোটা কালো মেঘ
ক্লান্ত পালোয়ানের দল যেন,
সমস্ত রাত বর্ষণের পর
আকাশের এক পাশে এসে জমল
ঘেঁষাঘেঁষি করে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চর্যাপদের যুগ থেকে বাংলা কাব্য ভাষাতেও যে আকৃত ব্যক্তিভাষা, সে যুগের দৈনন্দিন কথ্যভাষার আকৃত রূপ বেশ কিছু চলে এসেছে তা উদ্ধৃত কাব্যাংশ-গুলিতে দেখতে পাচ্ছি। গ্রন্থন সারল্য থেকে গ্রন্থন জটিলতায় যাতায়াতটি বহুদিন ধরেই বাংলা কবিতায় আছে। আরো একটি বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাচ্ছি, সহজ স্বরন্যাসের পাশে ধ্বনিমাধুর্যলাবণ্যময় স্বরন্যাস, গম্ভীর রুক্ষ স্বভাবের পাশে অতিললিত কান্তকোমল স্বভাব। সুতরাং এ কথা ভাবা ভুল শুধু ভাষার কোমলতা, অতিলালিত্যই কাব্য-কবিতা। বৈষ্ণব পদাবলীর বিশেষত্বই ছিল অতি-কোমল, অতি আকৃত ললিত ভাষা, একেবারেই কৃত্রিম কাব্য ভাষা; মঙ্গলকাব্য, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাসের আকৃত কথ্যভাষার পাশাপাশি। বৈষ্ণব পদাবলীতেও আমরা 'বাদল-দোল / নীল-নিচোলের'—লালিত্যের সঙ্গে 'কঠিন কপাটের গাম্ভীর্যকে পাচ্ছি, প্রবাদের ব্যবহারে বাস্তব লোক সংস্কৃতি ও কথ্যভাষাকেও পাচ্ছি। আদি যুগ থেকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পর্যন্ত বাংলা কাব্যে আকৃতির ঐক্য পয়ার, ত্রিপদী এবং অন্ত্যমিলেই লক্ষ করা যায়। কাব্যভাষার বহিরঙ্গে পরিবর্তন বহুভাবে বহুবার ঘটলেও পয়ার, ত্রিপদী এবং অন্ত্যমিলে বাংলা কাব্যের গৃহীত রূপটি ধরা ছিল। সুশীলকুমার দে'র 'বাংলা প্রবাদে' আমরা পাচ্ছি কি ভাবে সরল প্রবাদ আকৃত কাব্যভাষায় প্রবেশ করে, ভাষার আটপৌরে রূপে এবং বহুকালের সংস্কৃতির ধারায় কাব্যের তাৎপর্য বাড়িয়ে দিয়েছে। "সংস্কৃতের আদর্শে বাক্-সংহতি ও বাক্-চাতুর্যের যে চমৎকারিত্ব ভারতচন্দ্রকে প্ররোচিত করিয়াছিল, তাহার সঙ্গে প্রবাদের সংক্ষিপ্ত ও সাভিপ্রায় রসিকতার অনৈক্য ছিল না। এমন কি, তাঁহার অনেকগুলি সরস প্রবচন সংস্কৃত বাক্যের ভাবানুবাদ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।......ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ এবং রামেশ্বরের রস-রচনায় যে প্রবাদ-প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার জের ঊনবিংশ শতাব্দীতেও চলিয়াছিল।"[১০] ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ এবং কিছুটা রামমোহনের কাব্যে দৈনন্দিনের ভাষার, তাঁদের ব্যক্তিভাষার আকৃত রূপটি খুব স্পষ্ট। [বিক্ষিপ্ত ভাবে আরো অনেক কাব্যে এই রূপটি পাওয়া যায়, বিস্তারিত আলোচনার জন্য সুশীলকুমার দে, সুকুমার সেন, পবিত্র সরকার ও শিশিরকুমার দাশ দ্রষ্টব্য।] এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ এবং রামমোহন আজকের উত্তর আধুনিক কবিদের পূর্বসূরী। মধুসূদনের কাব্য-ভাষার সঙ্গে পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কাব্যভাষার গৃহীত রূপটির কোনো মিল নেই। মধুসূদন বাংলায় যখন অমিত্রাক্ষর ছন্দ শুরু করলেন তখন পয়ার-বন্ধন ভেঙে গেল। দীর্ঘ-বাক্য জটিল বাক্য এদের সমন্বয়ে গড়ে তোলা সম্ভব হল কাব্যের নতুন আকৃতি। পদ্যের বাঁধনকে মেনে কাব্যে গদ্যের স্বাধীনতা দেখা গেল।[১১] সংস্কৃত,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
গ্রীক ও লাতিন কাব্যে মিল অপরিহার্য ছিল না। মিলটন তাঁর PARADISE LOST-এর ভূমিকায় অন্তমিলকে বর্বর যুগের বর্বর অবদান বলে অভিহিত করেছিলেন। তাঁর মতে সংস্কৃতিবান জাতি কখনো কাব্যে অন্তমিল ব্যবহার করে না। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রচলনের ভূমিকায় মিলটনের এই তত্ত্ব কাজ করেছে। মধুসূদনই প্রথম বাঙালি কবি যিনি আন্তর্জাতিক সাহিত্যের সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষাকে মেলাতে পেরেছিলেন।[১২] মধুসূদন ভাষার অতিলালিত্যের চেয়ে গাম্ভীর্যের পক্ষপাতী ছিলেন। নানাভাবে মধুসূদন ভাষাকে আকৃত করেছেন, 'রেখ মা দাসেরে মনে' ব্যক্তিভাষার গ্রন্থন, 'বাক্যহীন ক্রোধে অশ্ব / নিরখি এ লীলা / ভোজবাজি কিম্বা স্বপ্ন'—ভোজবাজি কথাটি যাদুর মত ব্যবহৃত শব্দশ্রেণীর বাইরে চলে গেল, ভাষার মণ্ডন ঘটল।

কবিতা তখনই চিহ্নের দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছে যায় যখন কবি দৈনন্দিনের ভাষা চিহ্নের প্রথম স্তরের মত বাক্যে ব্যবহার করে তার বাইরের কিছু বোঝান, ইশারা দেন। রামপ্রসাদ যখন লেখেন এবার কালী তোমায় খাব তখন খাওয়া বলতে চিবিয়ে বা গিলে খাওয়া বোঝায় না। কবিতার চিহ্নবিজ্ঞান এই চিহ্নের দ্বিতীয় স্তরকে বিশ্লেষণ করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "কবিতা যে ভাষা ব্যবহার করে সেই ভাষার প্রত্যেক শব্দটির আভিধাননির্দিষ্ট অর্থ আছে। সেই বিশেষ অর্থই শব্দের তথ্যসীমা। এই সীমাকে ছাড়িয়ে শব্দের ভিতর দিয়েই তো সত্যের অসীমতাকে প্রকাশ করতে হবে। তাই কত ইশারা, কত কৌশল, কত ভঙ্গি।"[১৩] রবীন্দ্রনাথ অবলম্বনেই বলা যায়, "ভাষার মধ্যে ভাষাতীত"কে প্রতিষ্ঠা করা কবিতার লক্ষণ, একটু অন্যভাবে যেন য়ুরি লোৎমনের 'কৃতি অতিরিক্ত গ্রন্থন'। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য বিদ্যা বা অলঙ্কারশাস্ত্র এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাষা চিন্তা পৃথক বড় নিবন্ধের বিষয়। এই নিবন্ধে যে সমস্ত সূত্র আলোচিত হবে তার কিছু সূত্র অন্যভাবে আলঙ্কারিকদের তত্ত্বে এবং রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলীতে বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া যাবে।

২.৬. ভাষাকে কবিতার জন্য আকৃত করার আরেকটি পদ্ধতি ভাষার মণ্ডন [কথাটির অন্য পরিভাষা—প্রমুখন, সম্মুখন বা সমুত্থাপন] ঘটানো। চেক ভাষা-বিজ্ঞানী ইয়ান মুকারোভস্কি এবং হাভ্রানেকের মতে, "সাধারণ যোগাযোগ রক্ষার বার্তায়° ভাষিক উপাদানগুলি স্বচলিত আর কবিতায় তারা প্রতি-স্বচলিত। স্বচলনের ভাষিক উপাদানগুলি তাদের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় না, তারা কেবল যোগাযোগ রক্ষা করে। অন্যদিকে মণ্ডিত ভাষিক উপাদানগুলি তার নিজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।"[১৪] এ বিষয়ে পবিত্র সরকার মুকারো-ভস্কির উদ্ধৃতি দিয়েছেন, "কবিতার ভাষা ভাষার একটা Norm থেকে সরে যায়, সরে যায় সৌন্দর্যসৃষ্টির কতগুলি বিশেষ প্রকরণ সমাধা করার জন্য। স্ট্যাণ্ডার্ড ভাষাই সেই Norm, কবিতার ভাষা সেই Norm ভাঙে।"[১৫] ভাষার মণ্ডন ঘটানো কবিতার একটি লক্ষণ, বাধ্যতামূলক লক্ষণ নয়। হঠাৎ তৎসম, তদ্ভব, অচলিত বা ভারী শব্দ ব্যবহার করলে—দৈনন্দিনের ভাষায় লিখতে লিখতে চলিতের সঙ্গে সাধু মিশ্রণ করলে, সাধুতে লিখতে লিখতে চলিত ব্যবহার করলে, ভাষার মধ্যে উপভাষা, মিথ, বিভাষা, প্রবাদ ব্যবহার করলে এবং শব্দের পুনরাবৃত্তি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করলেও ভাষার মণ্ডন হয়।

কে জবাব দেবে নিখিল সর্বনাশ
কোন্ অবরোহী পাতকের শাস্তিতে ?

—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, "১৯৪৫", 'সংবর্ত', রচনাকাল ২৬/৯/৪৫।

অথবা খতম করো প্রশ্নাত্মক কে কি কাকে কেন বা কখন
গুণগান করো নিম্নোধৃত বিষয়ের

—তুষার চৌধুরী, "হত্যা করো", জনপদ ১, রচনাকাল ১৯৭৮।

২.৭. কি ভাবে কবির ব্যক্তিভাষা আকৃত হয়ে ওঠে সেটি চিত্রকলার সাহায্যে বোঝান যায়, কবিতা ও চিত্রকলার গ্রন্থনে কিছু সাদৃশ্য আছে। গণেশ পাইনের রেখাচিত্রগুলির সাহায্যে এই গ্রন্থন প্রক্রিয়া দেখান হল।

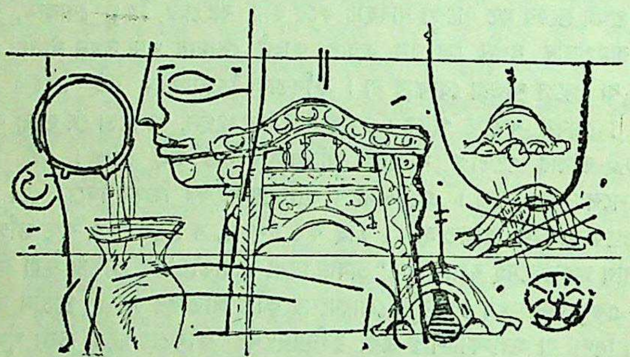

(১) শিল্পীর সামনে দৈনন্দিনের অবয়ব =কবির দৈনন্দিনের ভাষা

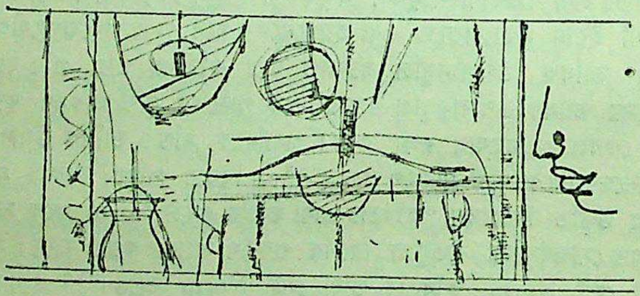

(২) মূর্ত থেকে বিমূর্তে, অবয়ব থেকে অবয়বহীনে যাতায়াত ইত্যাদি গ্রন্থন প্রক্রিয়া =সরল বাক্য থেকে জটিল বাক্যে, দেশজ শব্দ তৎসম শব্দ মিশ্রণ পদসমূহের গ্রহন বর্জন ইত্যাদি গ্রন্থন প্রক্রিয়া

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

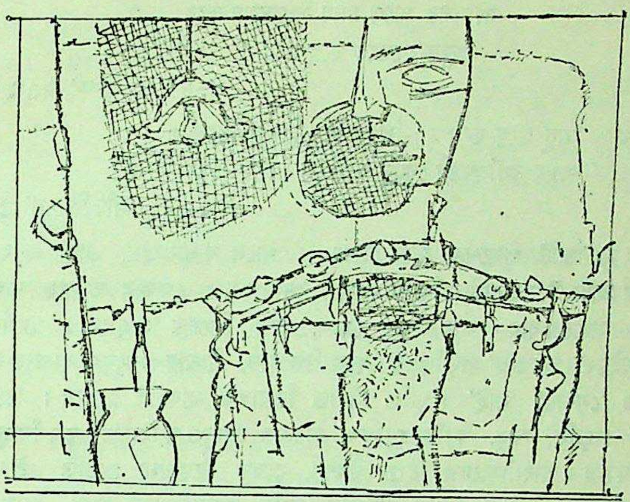

(৩) আকৃত চিত্র-কৃতি =আকৃত কবিতা-কৃতি

৩.১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে বিশ্লেষণ করা যাক—

"অন্য কথা পরে হবে।
গোড়াতেই বলে রাখি তুমি চা পাঠিয়েছ, পেয়েছি।
এতদিন খবর দিই নি সেটা আমার স্বভাবের বিশেষত্ব।
যেমন আমার ছবি আঁকা, চিঠি লেখাও তেমনি।
ঘটনার ডাকপিওনগিরি করে না সে।
নিজেরই সংবাদ সে নিজে।"

"পনেরো", 'শেষ সপ্তক', ৮/৩/৩৫ ॥

"এ খবর শীঘ্রই আসবে জানতুম, তাই তুমি যখন বিবর্ণমুখে এসে দাঁড়ালে, ভাবলুম যাবার খবর নিশ্চয়ই। মন খারাপ করে কি করবে বল ? কাজ আছে যে, কাজ! বলছি তো তোমাদের সেপ্টেম্বরে আসব, যাওয়া না হ'লে তো আসা হয় না,—যাওয়াটাও ভালো, আসাটাও ভাল, তা মানো না তুমি ?"

—মৈত্রেয়ী দেবী ধৃত রবীন্দ্রনাথের কথাবার্তার উদাহরণ।[১৬]

কবিতা এবং কথাবার্তার ভাষার মধ্যে, অন্তর্নিহিত স্বরন্যাসের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কি ? পাঠক ইচ্ছে করলে সুবিধা মত কথাবার্তার উদাহরণটিকে কবিতার মত ভেঙে ভেঙে সাজিয়ে নিতে পারেন।

(ক) "নাগিনীরা চারি দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।"

"১৮", 'প্রান্তিক', ২৫।১২।৩৭।

(খ) "মধু-গন্ধে-ভরা মৃদু-স্নিগ্ধছায়া নীপ-কুঞ্জতলে ॥
শ্যাম-কান্তিময়ী কোন্ স্বপ্নমায়া ফিরে বৃষ্টিজলে ॥

—"১০৪", 'গীতবিতান' 'প্রকৃতি'।

(ক) দৃষ্টান্তটি পুনশ্চের পরে লেখা। এখানে কথাবার্তার ভাষা এবং কাব্য-ভাষার মধ্যে উত্তেজনায় কবিতার গ্রন্থন অন্যরকম। একবার আসছে কথাবার্তার গ্রন্থন আরেকবার কাব্যভাষা গ্রন্থন, ছন্দ মিলের সাহায্যে। 'ফেলিতেছে' 'শোনাইবে' 'হতেছে' প্রভৃতি কাব্যিক ক্রিয়াপদ, ক্রিয়ার সাধুরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। আবার 'নেবার' 'যাই' প্রভৃতি চলিত ক্রিয়াপদ ব্যবহার হয়েছে। 'চারিদিক' 'তরে' প্রভৃতি, সাধু, কাব্যিক শব্দ ব্যবহৃত হলেও কবিতার গ্রন্থন কিন্তু গদ্যের কাছাকাছি। নাৎসীবাদের হিংস্র উত্থান, যুদ্ধের উত্তেজনা প্রভৃতি এই কবিতার উৎস যার প্রতিক্রিয়া সাধু চলিতের দ্বন্দ্বে কাব্যিক-স্বাভাবিক শব্দের দ্বন্দ্বে প্রকাশিত। 'বিষাক্ত নিশ্বাস' 'দানবের সাথে সংগ্রাম' এই জাতীয় শব্দ রবীন্দ্র কবিতায় আগে বিশেষ পাওয়া যায় নি। এই কবিতা দুটির সঙ্গে 'ঝুলন' (১৮৯৩) 'বুদ্ধভক্তি' (১৯৩৮) কবিতা দুটির গ্রন্থনের ঐক্য আছে। সামাজিক, রাজনৈতিক ঘটনা কবিতার ভাষা, কবির ব্যক্তিভাষা পরিবর্তনের একটি কারণ, একমাত্র কারণ নয়।

(খ) দৃষ্টান্তটি পুনশ্চের আগে রচিত। 'কুঞ্জতল' 'কান্তিময়ী' 'নীপ' প্রভৃতি পুরোপুরি কাব্যিক শব্দ ব্যবহারে এখানে কাব্যিক গ্রন্থন ছন্দ-মিল, ধ্বনি, ধ্বনিকল্পের (Phoneme) মধ্যে পরিষ্কার।

জীবনানন্দ দাশের কবিতার ভাষাও একই প্রমাণ করবে, কবির আকৃত ব্যক্তিভাষাই তাঁর কবিতার ভাষা। একেকটি কবিতার আকরণ (গ্রন্থন) ভিন্ন।

"কবিকে দেখে আমরা কি করব?
পড়ব তার আনন্দের কবিতা—কবিতার বই
...একটার পর একটা বেরোয়
কি পুজোর মরশুমে
কিংবা বড়োদিনের গুলজারের সময়
হাতে করে গভীর সান্ত্বনা পাই—
অবাক হ'য়ে ভাবি : কবি কিছু পয়সা পেল?

—"কবি", 'জীবনানন্দ দাশের কবিতা'।

জীবনানন্দ দাশের কথাবার্তা যাঁরা শুনেছেন তাঁরা বলতে পারবেন তাঁর কথাবার্তার ধরন ওপরের কবিতাটির মত ছিল কি না।

মনে প'ড়ে গেল এক রূপকথা ঢের আগেকার,
কহিলাম,—শোনো তবে,—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শুনিতে লাগিল সবে,
শুনিল কুমার,

—"পরস্পর", 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' ॥

এখানে কবিতার গ্রন্থন অন্য, কথাবার্তার ভাষার কাছাকাছি এসে সরে যাচ্ছে—'সবে'—কাব্যিক শব্দ, কহিলাম, লাগিল, শুনিল ক্রিয়াপদের সাধুরূপ আর 'গেল' 'শোনো' ক্রিয়াপদের চলিতরূপ।

অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে দীর্ঘদিন কথাবার্তা বলার সুযোগ হয়েছিল। তাঁর কবিতার ভাষা ব্যবহারেরএকই সূত্র আমার মনে হয়েছে, আকৃত ব্যক্তিভাষা। অমিয় চক্রবর্তী কথা বলতেন (শেষদিকে) একটু আনমনা, ছাড়া ছাড়া ভাবে, অনেক সময় মনে হত 'স্বগতকথন'। উপস্থিত ব্যক্তিকে ভুলে গিয়ে নিজের সঙ্গেই কথা বলে যাচ্ছেন—

"তুমি জলে পা ডুবিয়ে পাথরে বসে আছ
ঠাণ্ডা, নির্লিপ্ত সোপাঁ-র গানের স্বপ্নে বাঁচো
আমারও তাই পিয়ানোর ধ্যানে তোমায় দেখে দেখে।
আছি প্রত্যেকে"

—"মেজর্কা", 'নতুন কবিতা'। মে ২২, ১৯৭৮।

রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ এবং অমিয় চক্রবর্তীর দৃষ্টান্তগুলি পড়ে এ কথা মনে হয় যে তিন জনেই শেষ দিকে তাঁদের দৈনন্দিন কথাবার্তার ভাষার খুব কাছে চলে আসছিলেন, কবিতায়। প্রথম দিকে তিনজনেই শুরু করেছিলেন 'কাব্যিক ভাষায়'। ভাষা, সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার মধ্যে কবিদের ভাষা ভাবনারও পরিবর্তন ঘটে, ভাষার বাইরেটা সরল হয়ে যায়, কবিতার ভাষা যত সরল হয় দৈনন্দিনের কথাবার্তার ভাষার যত কাছে আসে তার গ্রন্থনের জটিলতা তত বাড়ে।

৩.২. জার্মান কবি গটফ্রীট বেন তাঁর কবিতাকে 'স্বগতকথন' সংজ্ঞায় চিহ্নিত করেছিলেন, পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলেন নি।[১৭] অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা এবং তাঁর কথাবার্তার শৈলী থেকে এই স্বগতকথনের সূত্রটি পাচ্ছি। যাঁদের নির্জনতার কবি বলা হয় তাঁদের ক্ষেত্রে এই স্বগতকথনের সূত্রটি প্রয়োগ করা যায়, বলা যায় ব্যক্তি ভাষায় স্বগতকথন। জীবনানন্দের ক্ষেত্রেও এই এক সূত্র মনে হয়। সাম্প্রতিককালের কবিদের মধ্যে অলোক সরকারও এই কবি গোষ্ঠীভুক্ত। যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, জানেন কথা বলতে বলতে চুপ করে যাওয়া এবং তারপর নিজের মনে কথা বলা অলোক সরকারের স্বভাব—

"আমার ভাবনা আসলে ব্যবহারের, হাতে সময় এতো কম!
কাল ঠিক বার করব সবুজ পালক, ভাবি ঠিক বার করব"

—"মায়া" 'এই মুহূর্তের কবিতা', ১৩৮৮।

অন্যদিকে রুশ কবি মায়াকোভস্কি, জার্মান কবি ব্রেশট, এবং বাঙালি কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা গণমুখী, মুখর। কবিতাটির উদ্দেশ্য কি এটা বোঝার চেষ্টা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কবি করলে স্বভাবও ধরা পড়বে। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের ব্যক্তিভাষাও আকর্ষক। দৈনন্দিন কথাবার্তার বাক্যে তিনি ব্যবহার করেন 'বিবেকী' কাজ, 'পদাকর্ষণ', 'তাত্ত্বিক আচরণ', 'নিগ্রহ জৈন' প্রভৃতি শব্দ, শব্দযুগল—

কেমন করে ঘটলো তোমার প্রতিক্রিয়াশীলিত সারমেয়
তোমার অনুশাসন ভেঙে ছুঁয়ে দিয়েছ পরপুরুষের বেড়া'
—"লোহার পা", 'দুই বাংলার কবিতা', সংকলন-৩, ১৯৭২ ॥

৪.১. সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে ভাষার যোগ ঘনিষ্ঠ। সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বহিরঙ্গের পরিবর্তন ঘটে। ভাষার ব্যাকরণের পরিবর্তন এত দ্রুত ঘটেনা, তার গতি শ্লথ। বঙ্কিমের উপন্যাসে ভাষার ব্যাকরণ যেখানে ছিল আজকের অমিয়ভূষণ মজুমদার বা মহাশ্বেতা দেবী, অভিজিৎ সেনের উপন্যাসে ভাষার ব্যাকরণ তার থেকে খুব দূরে সরে যায় নি, পরিবর্তন হয়েছে ভাষার বহিরঙ্গের। সাহিত্যের ভাষায়, কবিতার ভাষায় এই পরিবর্তন প্রতিফলিত হয়। প্রত্যেক যুগেই কবিরা প্রচলিত রীতি ও শৈলী থেকে সরে এসে নতুন শৈলী তৈরি করেন। যেমন 'কবিতা' বা 'কাব্য' বলতে আগে বিশ্বাস ছিল কাব্যের ভাষা হবে 'সুললিত'। 'পদ-লালিত্য ঝঙ্কার' যুক্ত, প্রচলিত পদ্য ছন্দ এবং মিল যুক্ত। 'সুললিত' 'লালিত্য ঝঙ্কার'—এই ধারণাটি পুরোপুরি গেল না। এই কারণে প্রমথ চৌধুরী 'আধআধ ভাষ' কিংবা 'গদ্গদ ভাষ' থেকে বাংলা সাহিত্যের ভাষার মুক্তি চেয়েছিলেন। তিনটি ধ্রুপদী ভাষা—সংস্কৃত, গ্রীক ও লাতিন সাহিত্য বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে এগুলি "প্রত্যেকটিই পুরুষালি সাহিত্য, মেয়েলি নয়; সে সাহিত্য যেখানে কোমল সেখানে দুর্বল নয়, যেখানে সানুরাগ সেখানে সানুনাসিক নয়।"[১৮] সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কবিতাতেই ঘোষণা করলেন, "অবাস্তব সুললিত সে পদ্যের মতো / যাতে রেণু, বেণু, কদাচ ধেনুও মিলে ক্রমাগত / অভিভাবে আত্মোপলব্ধির অভাব লুকিয়ে রাখে / এবং অলীক ভেবে, উদ্ভাসিত স্বপ্ন রচনাকে যখন করেছি ত্যাগ", ঘোষণা করলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য, "এবার কঠিন, কঠোর গদ্যে আনো, পদ-লালিত্য-ঝঙ্কার মুছে যাক।" সরাসরি ঘোষণা না করলেও জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী ও সরে গেলেন 'পদ-লালিত্য-ঝঙ্কার' তত্ত্বের থেকে। সমর সেন মূলত গদ্যাভিত্তিক কবিতা লিখলেন। এইভাবে কবিতার ভাষা ও শৈলী পরিবর্তিত হ'ল। এর পেছনে সামাজিক সাংস্কৃতিক কারণ আছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্রতা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহতা, মন্বন্তর এবং দাঙ্গা এই চার কারণে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাংলা কবিতার 'পদ-লালিত্য-ঝঙ্কারে'র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। ১৯৬৭ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে রাজ-নৈতিক অস্থিরতা, সাহিত্যের ভাষাকে কিছুটা প্রভাবিত করেছে। এক শ্রেণীর কবিদের কবিতা সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার আরো কাছাকাছি চলে এসেছে, যেখানে সরাসরি কাছাকাছি আসেনি সেখানে মুখের ভাষার সঙ্গে কবিতার ভাষার দ্বন্দ্ব তৈরি করা হচ্ছে গ্রন্থনের কারণে।

"চটকলের ছক্কুমিঞা, 'এবার প্যাঁদাবো শালা হারামি ও. সি. কে।"
—মণিভূষণ ভট্টাচার্য, "গান্ধীনগরে এক রাত্রি" (১৯৭৪)।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"পিটিয়ে পিটিয়ে হত্যা খুলির সঙ্গে রিভলভার ঠেকিয়ে গুলি
মানি না।"
—নবারুণ ভট্টাচার্য, "এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না", 'এই দেশ এ সময়' (১৯৭২)। (সংকলন)

৪.২. ১৯৪৭ সালে ভারতবিভাগ, বঙ্গবিভাগও বাংলা ভাষার বহিরঙ্গে পরিবর্তন এনেছে। গঙ্গাতীরবর্তী হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগণা, নদীয়া এবং কলকাতার আদিবাসিন্দাদের মুখের ভাষার লিখিত রূপটি বাংলা সাহিত্যের ভাষা এবং সম্মত (Prestige) ভাষা বলে বিবেচিত হয়। ১৯৪৭ সালের পর এই অঞ্চলের ভাষায় পরিবর্তন এসেছে, তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান থেকে বহু সংখ্যক লোকের পশ্চিমবঙ্গের এই অঞ্চলে আসার জন্য। পশ্চিমবঙ্গে 'গিয়েছিনু' 'করেছিনু' 'বলেছিনু', 'গিয়েছিলুম', 'করেছিলুম', 'বলেছিলুম', 'বলেছিলেম', 'করেছিলেম', 'গিয়েছিলেম' এই জাতীয় ক্রিয়াপদ চালু ছিল ১৯৫০ পর্যন্ত। ৫-এর দশক পর্যন্ত বাংলা কবিতায় এমন কি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা কবিতায় তাই এই ধরনের ক্রিয়াপদের ছড়াছড়ি। বিভিন্ন 'উপভাষা'র মিশ্রণের ফলে আজ পশ্চিম-বঙ্গের মানুষও বলছে 'গিয়েছিলাম' 'করেছিলাম' 'বলেছিলাম'। পূর্ববঙ্গ থেকে আগতারও 'গিয়াসে' 'কইর্যাসে' বদলে ফেলেছেন, অবশ্য বাড়িতে নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে আলোচনার সময় তাঁরা উপভাষাই ব্যবহার করেন। কবিতায় অবশ্য এখনও 'গিয়েছিলুম' ব্যবহার হয়, তার কারণ অন্য।

৪.৩. ভাষার সাম্রাজ্যবাদ ধারণাটি বিভিন্ন সমাজভাষাবিজ্ঞানীর গবেষণার পর আজ আমাদের কাছে পরিষ্কার। বহুদিন আগে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলে-ছিলেন, "ষাটি বৎসরের ইংরাজী শিক্ষার ফলে আমরা ভাঙ্গিতে শিখিয়াছি, গড়িতে শিখি নাই, আমাদের আহারের দ্রব্য বাড়িয়াছে, কিন্তু পরিপাকের শক্তি বাড়ে নাই। আমরা পরের কথার আবৃত্তি করিতে পারি ; কিন্তু স্বয়ং বাক্য রচনা করিতে জানি না। আমাদের রাজনৈতিক পরাধীনতা হীন ; আমাদের জ্ঞান-জীবনে পরাধীনতা শোকাবহ। জ্ঞানালোচনায় আমাদের স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা নাই ; আমরা আত্মনির্ভর ও আত্মমর্যাদা জানি না।"[১৯] অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে কি ? উনিশ শতকে বাংলা ব্যাকরণ রচিত হয়েছে সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং ইংরিজি ব্যাকরণ মিশিয়ে। কিছু অদল বদল করে সেই ব্যাকরণের গ্রন্থন আজও চলছে। খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ কোথায় ? বহুজাতিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, সাহায্যদানের মাধ্যমে বহুজাতিক সংস্কৃতি (দ্রষ্টব্য প্রবাল দাশগুপ্ত, "গদ্যের কড়া হাতুড়ি", বর্তমান সংকলন) চেপে বসেছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সংস্কৃতির ওপরে, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি এর থেকে মুক্ত নয়। বাংলাদেশের সমাজভাষাবিজ্ঞানী মনসুর মুসা দেখিয়েছেন, "নব্য উপনিবেশবাদে ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার"[২০] এমাজউদ্দিন আহমদ বলেছেন, "সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নব্য-উপনিবেশবাদের প্রকাশ অত্যন্ত নগ্ন। ধ্যানধারণা, চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা ও পর্যালোচনার সবক্ষেত্রে এর সুস্পষ্ট প্রকাশ। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র থেকে আমদানী করা হচ্ছে বই-কেতাব আর গুরু। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য প্রান্তিক রাষ্ট্র থেকে রপ্তানী করা হচ্ছে শিষ্য ও সাগরেদ।[২১] ১৯৫০-৭০ এই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
পর্বে এক আমেরিকান কবি অ্যালেন গিনস্‌বার্গ বহুজাতিক [আন্তর্জাতিক এবং বহুজাতিক কথা দুটির পার্থক্য সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকতে হবে। আন্তর্জাতিক কথাটির সঙ্গে ঐক্য, বিরাটত্ববোধ জড়িত আছে—পৃথিবীর সব জাতি, সব দেশের ঐক্য-মহত্ত্ব-সংকট সবকিছুই বোঝায় ব্যাপক অর্থে। বহুজাতিক কথাটি সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়—এর সঙ্গে শোষণ-মুনাফা-আধিপত্য বিস্তারের ছবিটি জড়িত। মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শামসুর রহমান, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রমুখ আন্তর্জাতিক ধারার কবি আর পাঁচের দশকের কৃত্তিবাসের কবিকূল এবং তাঁদের অনুগামীরা বহুজাতিক সংস্কৃতি মণ্ডলের কবি। আন্তর্জাতিকতার মধ্যেই জড়িয়ে আছে দেশজ সংস্কৃতি, তার বিচিত্র বহুভাষিকতা।] সংস্কৃতির প্রতিনিধি হয়ে এসে প্রভাবিত করে গেলেন একদল বাঙালি কবিকে। গিনস্‌বার্গ ধরনে কলকাতায় সাহিত্য শ্লোগান চলতে আরম্ভ করল। এতে বাংলা কবিতা, কবিতার ভাষা চিন্তা কিন্তু এক পাও অগ্রসর হয়নি, নতুন সাহিত্যতত্ত্ব ও পাওয়া যায় নি, সাহিত্যে আমেরিকান, পশ্চিম ইউরোপীয়ান ধরনের চিন্তা খালি অগ্রসর হয়েছে এই সম্প্রদায়ের কবিদের মধ্যে এবং তাঁদের অনুগামীদের মধ্যে। বিজ্ঞাপন ও প্রচার মাধ্যমের বিপুল ক্রিয়াকলাপে এই ধরনের কবিতাই আদর্শ কবিতা হিসেবে পরিচিত হ'তে লাগল, পেল বিপুল জনপ্রিয়তা। পাশাপাশি মানবমুখী, শিল্পিত এবং প্রগতিশীল ধারাগুলিও বজায় ছিল এটাই বড় ঘটনা।

৪.৪ বিদেশী শব্দকে ভাষায় গ্রহণ করার কোনো বিধিনিষেধ নেই বাংলা ভাষায়। ফার্সী ভাষা যখন ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণীর ভাষা ছিল তখন যথেষ্ট পরিমাণ আর্বী, ফার্সী শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে, করে ভাষার মধ্যে মিশে গেছে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে আর্বী ফার্সী প্রচুর ব্যবহৃত হয়েছে সংস্কৃত তদ্ভব শব্দের পাশাপাশি। পর্তুগীজ শব্দও এসেছে। ফরাসী ভাষার মত বাংলা ভাষার রক্ষণশীলতা তেমন নেই, বিদেশী শব্দকে প্রায় না গ্রহণ করার মত করে গ্রহণ করে ফরাসীরা। ইংরিজি ভাষা গত দু'শ বছরে যথেষ্ট পরিমাণ প্রবেশ করেছে—ভাষার সাম্রাজ্যবাদের কারণে, এখন ঢুকছে নব্য-উপনিবেশবাদের কারণে। কবিকে তাই সতর্ক হতে হয় বিদেশী শব্দ কবিতায় যথেচ্ছ ব্যবহারের ক্ষেত্রে। বেশি ইংরিজি শব্দ তাই কখনো কখনো নব্য-উপনিবেশবাদ, বহুজাতিক সংস্কৃতির ফল বলে মনে হয়—

'নাকি এ তুরার রেঞ্জে অবসোলিট প্রাণের রেপ্লিকা'

—শক্তি চট্টোপাধ্যায় : "সাইকেল সাইকেল করে ছুটে আসে ক্ষেতফাটা হাওয়া" হয়ত ছন্দ মিলের কারণে তিন তিনটি ইংরিজি শব্দ এই কবি বাক্যে ঢুকে পড়েছে—এর দ্বারা ভাষার মাত্রাতিরিক্ত মণ্ডনের ফলে সমগ্র গ্রন্থন দুর্বল করে দিয়েছে, অতিরিক্ত তাৎপর্য চিহ্নিতও করা যাচ্ছে না।

৪.৫. "নিজের বিচিত্র বহুভাষিকতার দিকে সংস্কৃতির একটি প্রবণতা আছে। এটি কোনো আকস্মিকতা নয় যে শিল্প তার আপন বিকাশে পুরনো প্রেষণাগুলি পরিত্যাগ করে যায়, সে আবার লক্ষণীয় নিষ্ঠায় অতীত যুগের শৈল্পিক ভাষা-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
গুলিকে তার স্মৃতিতে সঞ্চয় করে রাখে। শিল্পের ইতিহাসে অজস্র পুনর্জাগরণ, আপাত জড় পুরনো শৈল্পিক ভাষা বারবার ফিরে এসেছে।"[২২] য়ুরি লোৎমনের এই বিশ্লেষণ আমাদের বুঝিয়ে দেয় কেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত ধ্রুপদী আঙ্গিক ব্যবহার করেন, কেন রবীন্দ্রনাথ বেদ-উপনিষদের কাছে, পুরাণের কাছে, বৈষ্ণব পদাবলী সুফি সন্ত বাউল সহজিয়াদের কাছে ফিরে যান, কেন তরুণতম কবিরাও কবিতায় লোককথা, পুরাণ ব্যবহার করেন, অচলিত তৎসম শব্দ ব্যবহার করেন।

"উপাচার, যজ্ঞবেদী, অগ্নিও প্রস্তুত
মেঘার্ত নদীর কাছে নগ্ন আমি, নিরঞ্জন আমি
তর্পন প্রস্তুত তবু আমাকে কর্ণের কথা বলো।"
—অমিতাভ গুপ্ত, "যুধিষ্ঠির : কুন্তীকে", 'মাতা ও মৃত্তিকা', ১৯৮৩ ॥

"তোমাকে দিলাম নারী, আমার সন্ন্যাস
কঠিনতা, পরাজয়, অজিন, বল্কল,
তুমি দাও বিজয়ীর সপ্তপর্ণী পাতা"
—শিশিরকুমার দাশ, "২৭", 'অবলুপ্ত চতুর্থ চরণ', ১৯৮৬ ॥

৫.১. "উক্তি যখন নিজেই আকর্ষক হয়ে ওঠে, বার্তার মধ্যে যখন সাধারণ তাৎপর্য প্রকাশিত হলেও বার্তার প্রকাশভঙ্গি, অর্থাৎ কিভাবে বলা হয় তার প্রতি গ্রাহক (উদ্দিষ্টজন) বিশেষ ভাবে সচেতন হয়ে ওঠে তখন ভাষার কাব্যিক বৃত্তি (বা কবিতা-বৃত্তি) মুখ্য হয়ে ওঠে। বার্তার মুখ্য লক্ষ যখন প্রেরক (ভাষী) নিজে (উত্তম পুরুষ) তখন ভাষার আবেগ-বৃত্তি প্রাধান্য লাভ করে।"
"প্রেরক বা ভাষী যদি গ্রাহক বা উদ্দিষ্ট জনকে প্রসঙ্গ সম্পর্কে সচেতন করতে চান, বার্তার অবলম্বন প্রসঙ্গই যখন বার্তার মুখ্য লক্ষ্য হয় তখন ভাষার প্রসঙ্গ-বৃত্তি প্রাধান্য লাভ করে।"[২৩] ভাষার কাব্যিক বৃত্তি (বা কবিতা বৃত্তি) এবং প্রসঙ্গ বৃত্তিকে—এ ভাবেই বর্ণনা করেছেন রোমান ইয়াকবসন। "প্রসঙ্গ-বৃত্তির ওপর কাব্যিক বৃত্তির প্রাধান্য প্রসঙ্গকে তুলে দেয়না বরং তাকে দ্ব্যর্থক করে তোলে। দ্ব্যর্থক বার্তা বিভক্ত প্রেরক, বিভক্ত গ্রাহকের মধ্যে সমসূত্রতা খুঁজে পায়, সর্বোপরি খুঁজে পায় বিভক্ত প্রসঙ্গ।"[২৪] "কবিতায় কেবল ভাষার কাব্যিক বৃত্তিই বর্তমান থাকে এমন নয়, অন্যান্য বৃত্তিও উপস্থিত থাকে। প্রথম পুরুষে বর্ণিত কাহিনী কাব্যে প্রসঙ্গ-বৃত্তি এবং গীতিকবিতায় আবেগ-বৃত্তির প্রাধান্য লাভ করে। বিজ্ঞাপন কি শ্লোগানেও কাব্যিক বৃত্তি কবিতার চরিত্রলক্ষণ হয়ে দাঁড়ায়।"[২৫] ভাষার আবেগ বৃত্তির সঙ্গে কাব্যিক বৃত্তিকে গোলমাল করে ফেলার ব্যাপারে ইয়াকবসন সাবধান করে দিয়েছেন। "কবিতায় আবেগ-ভাষার প্রাধান্য থাকে তার নিজের প্রয়োজনে।" আবেগবৃত্তি কাব্যিকবৃত্তি, বৃত্তি দুটির ব্যবহারিক পার্থক্য দুটি ভাষা পদ্ধতির পার্থক্য।[২৬] ইয়াকবসন বলেন 'কি ভাবে বলা হল তার প্রতি উদ্দিষ্ট জন বিশেষ ভাবে সচেতন হয়ে উঠে'—এই ধারণা, বহু বিতর্ক সৃষ্টি করলেও এখনও গ্রহণযোগ্য'। বাগর্থতত্ত্ববিদরা বলতে পারেন 'কি উদ্দেশ্য বলা হ'ল' সেটাই কবিতার লক্ষণ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"হয়তো-বা মানবের সমাজের শেষ পরিণতি গ্লানি নয়,
হয়তো-বা মৃত্যু নেই, প্রেম আছে, শান্তি আছে,
মানুষের অগ্রসর আছে,"
—জীবনানন্দ দাশ, "মহাত্মা গান্ধী", 'বেলা অবেলা কালবেলা'।

এই কবিতাংশে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি ভাবে বলা হ'ল তার প্রতি পাঠক সচেতন হয়ে উঠবেনই এবং কি উদ্দেশ্যে বলা হ'ল সে দিকেও। মানবিকতার উদ্দেশ্যে কথা বলা দীর্ঘকাল ধরেই কবিতার উদ্দেশ্য।

৫·২ "মুখের ভাষা কবিতার গভীরে (বর্ণনার গভীরে) ঢুকে যেতে পারে, কিন্তু মুখের ভাষা লেখ্যরীতিকে কখনোই পুরোপুরি বিচ্যুত করতে পারে না, যেহেতু, চরম দৃষ্টান্তগুলির ক্ষেত্রেও শিল্পিত কৃতি [কবিতা] মৌখিক কথন মাত্র নয়—বরং তাকে বলা চলে লেখ্যভাষার উপরে মৌখিক কথনের প্রতিফলন।"[২৭] আমরা দেখছি মুখের ভাষা, দৈনন্দিন কথাবার্তার ভাষা আকৃত হয়ে 'কবিতা' রূপ নেয়। মুখের ভাষার সঙ্গে লেখ্যভাষার একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য সব সময়েই থেকে যায়, সব ভাষাতেই।

গুরুচরণ কামার, দোকানটা তার মামার
হাতুড়ি আর হাপর ধারের (জানা ছিল আমার)
দেহটা নিজস্ব।

রাম নাম সত্ হ্যায়

—অমিয় চক্রবর্তী "সার্বেক", 'পারাপার', ১৩৬০।

এখানে স্বাভাবিক ভাষার বিশেষ রূপ পাওয়া যাচ্ছে যা ছন্দ এবং মিল বজায় রেখে প্রকাশিত, 'রাম নাম সত্ হ্যায়' যোগ হতেই একটা মণ্ডন হয়ে গেল ভাষায়॥ বাংলা কথ্য ভাষার সঙ্গে হিন্দী কথ্যতা রাম নাম সত্ হ্যায়ের দ্বন্দ্ব তৈরি হল এখানে ধ্বনিকল্পের বিন্যাসও লক্ষণীয়।

"দৈনন্দিনের ভাষার উপাদানগুলি শিল্পগত ভাবে অর্থপূর্ণ হয় তখনই যখন কেউ তাতে পূর্ব পরিকল্পনা আঁচ করতে পারেন, যখন একটি অশৈল্পিক পাঠ্যের কোনো বিষয় ভাঙা হয় : যখন একটি বিশেষ আঙ্গিকের প্রচলনের বহুত্ব অথবা অল্পত্ব সাধারণ ভাষিক সূচক থেকে লক্ষণীয় ভাবে ভিন্ন হয়, যদি একই ভাষিক বৃত্তিকে নির্দেশ করার জন্য দুই বা অধিক সম কৌশল থাকে এবং তার মধ্যে একটি বেছে নেওয়া হয়, ভাষায় উপস্থিত ব্যাকরণগত অথবা বাগর্থগত অথবা শৈলীগত বাঁধনের জন্য—কিছু প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় কথামালা (WORD CHAINS) সঠিক সংস্থাপনের জন্য। এই বিধিনিষেধগুলির কোনোটি লঙ্ঘন করা হলে খণ্ডিত বাঁধনটি (যেটি বাধ্যতামূলক স্তর থেকে ঐচ্ছিক স্তরে সরিয়ে নেওয়া হয়) কিছু অর্থের বাহক হয়ে দাঁড়ায় (যেখানে বাধ্যতামূলক স্তরে সেটি বাগর্থগত ভাবে নিরপেক্ষ ছিল)।"[২৮]

"কাব্যিক বা কবিতা-কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য এই যে, যে সব গ্রন্থনবহির্ভূত উপাদান ভাষার নয়, কথনেরই নিজস্ব, সেগুলোও কাব্যিক কৃতিতে গ্রন্থনভুক্ত হয়ে দাঁড়ায়।"[২৯]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"তবে এমন নয় যে গ্রন্থনবহির্ভূত উপাদানকে গ্রন্থনভুক্ত করে নিয়ে কবিতার গ্রন্থন কথনকে ভাষার জাতে তুলে নেয়। এ গ্রন্থন কথনের উপাদানগুলোর অর্থবহতার রীতিনীতি আমূল পাল্টে দেয়। নিঃশিল্প / আটপৌরে কথনে যে উপাদান অতিরেকী (স্বতন্ত্র অর্থবহতায় বঞ্চিত) তাও কবিতায় অর্থবহ হয়ে ওঠে।"[৩০]

"এই অন্ধকার তাদের একার নয়।

ফুটপাথের ন্যাংটো ছেলেরা
আজ বাবুদের স্বদেশ দেখছে…"

—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "এই অন্ধকার",
'শিশুর কান্নার ঘর শিশুর স্বপ্নের ঘর' ॥ মে ১৯৭৯ ॥

"কবিতায় গ্রন্থনের সারল্যকে (সংযুক্তির লঘু স্তর) কৃতি-অতিরিক্ত জটিল গ্রন্থনের পটভূমিতে রাখা যায়, এবং এইভাবেই (কবিতাটি) বাগর্থিক পরিপূর্ণতা অর্জন করে।"[৩১]

"কবিতায় এককের ভাষিক বিভাজন এভাবে করা হয় না যে তার অর্থবহ (অভিধায়ক) এবং সম্পর্কজ্ঞাপক (অন্বয়ক্রমিক/সমবায়ী/SYNTAGMATIC) এই দুটি দিক আছে।"[৩২]

দৈনন্দিন কথাবর্তার সাধাসিধে ভাষায় কবিতা লিখলে সারল্যের দ্বারাই কবিতায় অতিরিক্ত গ্রন্থন তৈরি করা হয় যাকে আপাত ভাবে মনে হবে এর মধ্যে কোনো শিল্পিত আকরণ নেই। দৈনন্দিনের কথাবার্তার ভাষার কবিতা পড়ে পাঠকের ভাষার সারল্য থেকে উদ্ভূত বিশেষ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। "সরলীকরণের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় তীক্ষ্ণভাবে কবিতার গ্রন্থনে জটিলতার স্তর বিস্তার করে।"[৩৩]

"কথাগুলোকে তাদের অভ্যেস থেকে ছাড়িয়ে নিতে গেলে তারা স'রে স'রে আবার পুরোনো খাতে। তাদের ধান্দাবাজি নাটুকেপনা বকবকানি অন্ধ ঘোরা ধাপ্পা ভাঙা-গলা সমানেই চলতে থাকে। এ-আচরণ কাঁহাতক সওয়া যায় ?"

—অরুণ মিত্র, "কথাগুলোকে", শারদীয়া পরিচয় ১৯৭৯ ॥

"কবিতা লেখাতে, চেষ্টা করি
ওদের দুটি আলো দিতে : একটি
পড়বে, সহজ ছকে, অন্যটি তির্যকে।"

—বিষ্ণু দে, "বিদেশী ছড়ার অবলম্বনে", শারদীয়া পরিচয় ১৯৭৯ ॥

"হেঁটে যেতে যেতে
বিজ্ঞাপন এবং সাইনবোর্ডগুলো মুছে ফেলে
সেখানে আমার প্রিয় কবিতাবলীর
উজ্জ্বল লাইন বসালাম",

—শামসুর রাহমান, "হরতাল", 'নিজবাসভূমে', ১৯৭০।

৫.৩. কবিতার ভাষা সম্পর্কে দার্শনিকদের কাছ থেকেও আরেক ধরনের মতবাদ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পাই। ভিটগেনস্টাইন লিখেছেন, "ভুলো না যে একটি কবিতা যদি তথ্যজ্ঞাপক ভাষায় (LANGUAGE OF INFORMATION) গঠিত হয়ও, তা তথ্য-জ্ঞাপনের বাক্‌ক্রীড়ায় (LANGUAGE GAME) ব্যবহৃত হয় না।"[৩৪]

কবিতা বলতে এখনও এ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে কবি, পাঠক এবং সমালোচকদের মনে আছে, যে আবেগের উদগার, কাব্যিক শব্দব্যবহার (আধ-আধ ভাষ গদ্‌গদ ভাষ) এবং ন্যাকামীর প্রকাশই হবে কবিতা। খুব কৃত্রিম আরোপিত ভাষা ছাড়া কবিতা হয় না এ রকম ধারণাও বজায় আছে আমাদের ভাববাদী রম্যবাদী কবি, সমালেচক-দের মধ্যে। ভাষাবিজ্ঞান (বাগর্থতত্ত্ব ও শৈলীবিজ্ঞান সমেত) ও চিহ্নবিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জেনেছি দৈনন্দিনের ভাষাতেও কবিতা হয়, স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় এই দৈনন্দিনের কথাবার্তার ভাষা কবিতার ভাষায় আকৃত হয়ে ওঠে। তাই রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শামসুর রাহমান, আল্ মাহমুদ থেকে আজকের তরুণ কবিরা পর্যন্ত সকলেই দৈনন্দিন কথাবার্তার ভাষায় কবিতা লিখেছেন, কিছু না কিছু। আমরা দেখেছি অনেকেই স্বাভাবিক কথাবার্তার ভাষায় কবিতা লেখেন না কারণ তাঁদের ব্যক্তিভাষাই আকৃত, সে ক্ষেত্রে ব্যক্তি ভাষা আকৃত হ'য়ে কবিতার আকরণ হবে না, আকৃত ব্যক্তিভাষা আরো আকৃত হ'য়ে কবিতার আকরণ হবে, 'কাব্য' সরে আসছে 'কবিতা'র দিকে।

৫.৪. আলোচনার সুবিধার্থে প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালকে যদি 'আধুনিক' কাল বলা হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে উনিশো সত্তরকে বলা যেতে পারে 'সাম্প্রতিক' কাল। আধুনিককালে আমরা পেয়েছি কাব্য ভাষার প্রাবল্য থাকলেও, কাব্যভাষা এবং দৈনন্দিন কথাবার্তার ভাষার দ্বন্দ্ব, সাম্প্রতিক কালে আমরা পেয়েছি দৈনন্দিন কথাবার্তার ভাষায় কবিতার প্রবণতা, যদিও কাব্য-ভাষার সঙ্গে কথাবার্তার ভাষার দ্বন্দ্ব বর্তমান, কিন্তু পুরোপুরি 'কাব্যভাষা' উঠে গেছে। অমিতাভ গুপ্ত লিখেছেন 'আধুনিক কাল' [সাম্প্রতিক কাল সহ] শেষ হয়ে এসেছে এখন উত্তর-আধুনিক কাল। "উত্তর-আধুনিক কবিতার প্রাণের জোর তার সংশ্লেষ প্রবণতায়, বহুবিচিত্র বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যদানের চেষ্টায়। পঞ্চাশের ও ষাটের আধুনিকদের [সাম্প্রতিকদের] "মতো" সংকীর্ণতা এখন আর নেই, তবু কুসংস্কার কাটিয়ে ওঠা গেছে এ'কথা বলা যায় না। যেমন, কমিউনিজমকে ভক্তি জানাতে গিয়ে কেউ কেউ কবিতায় ভারতীয় পুরাণের ব্যবহারের বিরোধিতা করেন। এই বিরোধিতার উৎস অবশ্যই, প্রথমত, মার্কস-এঙ্গেলসের চিন্তার সঙ্গে-অপরিচয়। দ্বিতীয় কারণটি হ'ল, পঞ্চাশ-ষাটের কবিরা ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে তাচ্ছিল্য ক'রে ইউরোপ আমেরিকার কাছে ভিক্ষা চাওয়াটাই ভালো মনে করেছিলেন"।[৩৬] [বহুজাতিক শিল্প সংস্কৃতি, ভাষার ঔপনিবেশিকতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে]। ভবিষ্যতে অমিতাভ অবশ্যই প্রমাণসহ তত্ত্বটিকে ব্যবহার করবেন। 'উত্তর-আধুনিক' কথাটা ব্যাকরণসম্মত হয়ত না হলেও আধুনিকতা চিহ্নিত হয়ে গেছে, বাংলায়। উত্তর-আধুনিক কবিতায় দ্বন্দ্বের বৈশিষ্ট্য বিস্তৃত, সারল্যের সঙ্গে সারল্যের দ্বন্দ্ব, কথাবার্তার ভাষার সঙ্গে কথাবার্তার ভাষার দ্বন্দ্ব, আধুনিক অতিকথার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(Myth) [যেমন আণবিক বোমা, তৃতীয় বিশ্ব, তেজস্ক্রিয়তা, বহুজাতিক সংস্থা, বহুজাতিক সংস্কৃতি, নয়া-উপনিবেশবাদ এগুলি আধুনিক 'মিথ'] সঙ্গে, পৌরাণিক অতিকথার দ্বন্দ্ব, কাব্য ভাষা-কথাবার্তার ভাষার একত্রিত দ্বন্দ্বের সঙ্গে সারল্যের দ্বন্দ্ব। দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্মবোধ, আন্তর্জাতিকতা ও তৃতীয় বিশ্বের সঙ্গে একাত্মবোধ উত্তর-আধুনিক কবিতার আরেক লক্ষণ। দুটি দৃষ্টান্ত দিলাম—

"এই কঠিন ধোঁয়া পৃথক ; বুঝতে পারেনি
আকাশ কিভাবে ধীরে-ধীরে পথ কাটে
পাথর-খাদক শূন্যতা দুই গ্রীবার পিতা
বিষাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে-নেওয়া বিষাদ।

হৃদয়ের প্রথা নিশ্চিহ্ন করবে ব'লে
যে আরো গভীরে নামে, কালগুণ তার বাধা
অবশেষে বায়ুর বাহু নিদ্রাসুখী, স্থির ; সহায় হোক
সেই বিন্দু অকাশ যেখান থেকে ফেরে।"

—গৌতম বসু, "কচ ও দেবযানী", গাঙ্গেয় পত্র—৯, ১৯৮২ ॥

"ক্ষতপ্রতিমার মতো। পড়ে আছে ভাঙা অন্ধকার।
কিছু অন্তর্জ্বালা।
আমিও এসেছি আজ, এইখানে, প্রতিনিধি গৌড়বাংলার।
যে আকাশে ভাষা নেই, তার বুকে একটি তারার
মিতাক্ষরমালা
একটি অথবা দুটি, দিব্যোক চন্দ্রবর্মা বাঁশের কেল্লার
তিতুমীর। আমাকে বাঙ্ময় করো। কোন্ দেবতার
স্মৃতির নিরালা
ছুঁয়েছি এখানে, বলো। দূরে অপাবৃত চূড়া, ত্রিশূল-নন্দার।

—অমিতাভ গুপ্ত, "বাগেশ্বর", 'মাতা ও মৃত্তিকা', ১৩৯০ ॥

উত্তর আধুনিক কবিতার আরো এক লক্ষণ বহুবিধ তৎসম, তৎভব, দেশজ শব্দকে টেনে আনা যা বাংলা সাহিত্যে অচলিত হয়ে গিয়েছিল। বহু ব্যবহারে জীর্ণ ক্লিশে শব্দগুলোও কবিতায় ফিরে আসছে নতুন বাগর্থিক গ্রন্থন তৈরি করে। ভাষা নিজস্ব সংস্কৃতিমুখী হয়ে উঠছে। পাঠকের মনে, চেতনায় এবং নিষ্ক্রিয়তার জন্য কবিতার ক্লিশে গ্রন্হনগুলির অস্তিত্ব বজায় থাকে, নান্দনিক গ্রন্হন বলে পাঠকের মনে নিজস্ব একটা ছবি আছে, কারুর কাছে যুদ্ধ পূর্ব বাংলা কাব্যই কবিতা—শিল্পিত কৃতি। এই পুরনো নান্দনিক কাব্যিক গ্রন্থনের বদলে পাঠক যখন নতুন কবিতার নান্দনিক গ্রন্থন সামনে পান তখন তাঁর মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব তৈরি হয়, এই নতুন কবিতার নন্দনতত্ত্ব অনেকটাই কৃতি-অতিরিক্ত গ্রন্থন। ক্রমে ক্রমে এই দুই গ্রন্থনের দ্বন্দ্ব থেকে পাঠক, কৃতি-অতিরিক্ত গ্রন্থনটি আসতে আসতে ধরতে পারেন। উত্তর আধুনিক কবিতায় তাই 'গ্রীবা' 'বিষাদ' 'শূন্যতা' 'হৃদয়' 'ক্ষতপ্রতিমা', 'অন্তর্জ্বালা' 'স্মৃতি' 'নিরালা' শব্দগুলির ব্যবহার হচ্ছে প্রচলিত নান্দনিক ধারণা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
কাব্যিক আকরণ সামনে, বহিরঙ্গে রেখে তার উল্টো আকরণ অর্থাৎ নতুন নান্দনিক ধারণা, কবিতার আকরণকে তুলে ধরার জন্য, নতুন-পুরনোর দ্বন্দ্বের সাহায্যে, কৃতি অতিরিক্ত আকরণের জন্য। লোৎমন বলছেন, "সন্নিহিত (JUXTAPOSED) এককগুলি যা একটি পদ্ধতিতে অসঙ্গত তা পাঠককে আরেকটি গ্রন্থন তৈরি করতে বাধ্য করে, এই গ্রন্থন অসঙ্গতি সরিয়ে দেয়। কৃতিটি দুটির সঙ্গেই সংযুক্ত এবং এভাবেই কৃতির [কবিতার] বাগর্থিক সম্ভাবনা বিস্তারিত হয়।"[৩৬] "যে কোনো শিল্পের [শিল্পিত কৃতির] মূল গ্রন্থনের নিয়ম হচ্ছে তার অসমতা; বিভিন্নধর্মী গ্রন্থনভুক্ত খণ্ডাংশের এককালে [এক সময়ে] সংঘটন।"[৩৭] অমিতাভ গুপ্তের 'বাগেশ্বর' কবিতায় আমরা পাচ্ছি ভাঙা অন্ধকার কিছু অন্তর্জালা পড়ে আছে সেখানে আমি [কবি] গৌড়বাংলার প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত। এই দুটি ভিন্নধর্মী খণ্ডাংশের গ্রন্থন এবং তার একত্রে ঘটে যাওয়া 'পড়ে আছে' 'এইখানে আমি এসেছি।' এই সূত্রটি চিত্রকলা ও চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও একই ভাবে প্রযোজ্য; সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা'তে দেখা যায় রাস্তা দিয়ে ফিরিওয়ালা যাচ্ছে আর ঘর থেকে মাধবী মুখোপাধ্যায় (নায়িকা) দেখছেন-যাওয়া, দেখা—দুটি বিভিন্নধর্মী কাজ, গ্রন্থনভুক্ত খণ্ডাংশ এক সময়ে ঘটছে। কবি অনেক সময় কবিতাকে সরল করে চেষ্টা করেন কৃতি-প্রান্তিক গ্রন্থনের জটিলতা বাড়িয়ে দিয়ে অর্থাৎ কবিতাকে দেখতে সরল করে লেখা যায় কিন্তু জটিল অনুমান বা কৃতি-প্রান্তিক সাংস্কৃতিক সংযোগ ভালভাবে অনুধাবন না করলে যাকে ধরা যাবে না। পাঠক খুব সহজেই সংযোগ স্থাপন করতে পারেন সেই সব কবিতার সঙ্গে যার বিন্যাস পরিচিত যেমন প্রথমদিকের রবীন্দ্রকাব্য, লোকগাথা, সত্যেন দত্ত, ঈশ্বর গুপ্ত, নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদারের কবিতা, বৈষ্ণব পদাবলী এবং মঙ্গলকাব্য। পাঠক জনপ্রিয় ধরনের শিল্পিত-কৃতি পছন্দ করেন কেন না তিনি জনপ্রিয় সংস্কৃতির অঙ্গীভূত। এই কারণেই যুদ্ধোত্তর বাংলা কবিতার অনেকটাই জনপ্রিয় নয়, কোনো কোনো পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য।

লোৎমনের সূত্র ধরে বলা যায় একটি শিল্পিত কৃতি / রচনা [কবিতা] তার ভাষার সাহায্যে যে ভাষা শিল্পের ভাষা—অন্য যে কোনো বাঙ্ময় বয়ানের চেয়ে অধিকতর তথ্য বিস্তার করতে এবং তার সংরক্ষণ করতে পারে।

৫.৫. "প্রত্যেকটি ধ্বনি যখন অভিধায়ক অর্থ নিতে থাকে তখন স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়, যা কখনই স্ব-নির্ভরতার সগোত্র নয়, কারণ তার স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে নির্ধারিত হয় তার সঙ্গে শব্দের বাগর্থিক বন্ধনের জন্য। তাই বাগর্থ চালিত ধ্বনিকল্পগুলি ইঁটের মত হয়ে যায় যার, থেকে ঐ এক শব্দ পুনর্গঠিত হয়। অর্থাৎ কোনো শব্দ কবিতায় অঙ্গীভূত হওয়া মাত্র তার অমোঘ চরিত্রান্তর ঘটে যায়। সে তখন আর ভাষার শব্দ থাকে না, ভাষার শব্দের প্রতিকৃতি হয়ে দাঁড়ায়; শব্দটার সঙ্গে সে সেই সম্পর্ক পাতিয়ে নেয় যে সম্পর্কে বস্তুর সঙ্গে বস্তুর শিল্পরূপ সম্পৃক্ত [শিল্পিত কোনো বাস্তবতার চিত্রকল্পের সঙ্গে নির্দিষ্ট বাস্তব বস্তুর, যাকে শিল্প পুনর্নির্মাণ করে]। ফলে সে প্রতীকাদর্শের প্রতীকাদর্শ হয়ে ওঠে। তাৎপর্যিক আর্দ্রতায় সে নিঃশিল্প/আর্টপৌরে ভাষার শব্দ থেকে একেবারে আলাদা।"[৩৮]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৫.৬. "কথনের স্বচলনের জন্য যে শব্দটির ব্যাকরণগত দিক কবির চেতনা থেকে মুছে যায় সে শব্দটিও একটি অর্থ অর্জন করে।"[৩৯]

"স্বাভাবিক ভাষা-সংস্থানে যে সব শব্দ পরস্পর-বিচ্ছিন্ন, তারা যখন সমগ্রথিত অবস্থানে এসে দাঁড়ায় তখন তারা সমান বা বিপরীত বৃত্তি গ্রহণ করে। এতে তাদের ভেতরকার এমন সব তাৎপর্য শক্তি ফুটে ওঠে যা স্বাভাবিক ভাষা-সংস্থানে তাদের যে তাৎপর্য গ্রন্হন [বাগর্থগত] তাতে প্রকাশ পায় না। এই যে আলাদা শব্দকে সমার্থবহ বা একই শব্দকে বিভিন্ন গ্রন্হনগত স্থানভেদে অসমার্থবহ করে তোলার ক্ষমতা, এ সব সত্ত্বেও শিল্পিত বয়ান [কবিতা] স্বাভাবিক ভাষার বয়ানই থেকে যায়। এই দ্বৈত অস্তিত্ব, দুই তাৎপর্যতন্ত্রের মধ্যে এই সংঘর্ষ, কবিতা বা কাব্যিক তাৎপর্যের ঐশ্বর্যের জন্য দায়ী।"[৪০]

"নড়িতেছে—জ্বলিতেছে—মায়াবীর মতো যাদু বলে
সে—আগুন জ্ব'লে যায়—দহেনাকো আর
সে—আগুন জ্ব'লে যায়
সে—আগুন জ্ব'লে যায়
সে—আগুন জ্ব'লে যায় দহেনাকো কিছু।"

—জীবনানন্দ দাশ, 'একটি কবিতা', সাতটি তারার তিমির ॥

"যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়,
জল হয়ে সে মিশায় জলে ॥"

—রামপ্রসাদ সেন ॥

"যেমন গঙ্গা পূজা গঙ্গা জলে।"

—রামনিধি গুপ্ত ॥

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় চারবার 'জ্ব'লে' শব্দটি, এবং একবার 'জ্বলিতেছে', রামপ্রসাদ সেনের কবিতায় চারবার 'জল' শব্দটি এবং রামনিধি গুপ্তের কবিতায় দুবার 'গঙ্গা' শব্দটির পুনরাবৃত্তি যাতে অভিধা-বাগর্থিক আভিধায়ক অর্থের একত্রে সংঘটন "একটি একক পার্থক্যকারকের আভাষ দেয়—স্বরন্যাস এবং স্বরন্যাস এইভাবে ব্যাখ্যা করলে আমাদের প্রণালী সংক্রান্ত সৈদ্ধান্তিকতার বৈশিষ্ট্যটি অন্তর্ভুক্ত করতে সাহায্য করে। এই প্রমাণী করণের শক্তি শব্দের স্বাভাবিক ভাষিক অর্থের অংশ নয়। এই বৈশিষ্ট্য শুধু মাত্র যে যোগ করা হয় তা নয়, এতে পরিমাণবাচক উত্থানের মান তৈরি হয়।"[৪১]

বিষ্ণু দে'র "সেই অন্ধকার চাই" কবিতায় 'অন্ধকার' শব্দটি ন'বার ব্যবহৃত হয়েছে। 'অন্ধকারে তীব্র অন্ধকার', 'যে-বাতাসে অন্ধকারে স্বভাবত ফুলে ওঠে গোখরো, ময়াল' 'অন্ধকার দিয়ে ঢাকে লালদীঘির লাল অন্ধকার', 'অন্য অন্ধকার আছে?' 'মৃত্যুর ক্ষিপ্র দিব্য অন্ধকার', 'থেকেছি যে-অন্ধকারে', 'সেই অন্ধকার চাই শরীরে, হৃদয়ে'—অন্যান্য আকরণের বৈশিষ্ট্য ছাড়া এখানে 'একই শব্দকে বিভিন্ন গ্রন্থনগত স্থান ভেদে অসমার্থবহ করার ক্ষমতা' সূত্রটির প্রয়োগ লক্ষণীয়। সাম্প্রতিককালে বীতশোক ভট্টাচার্য তাঁর 'মৃত্যু নয়' (এই মুহূর্তের কবিতা, ১৩৮৮) কবিতায়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'মৃত্যু' এবং 'নয়' শব্দ দুটি একুশবার ব্যবহার করেছেন, একসঙ্গে 'মৃত্যু নয়'। এরকম আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, কবিতার ভাষা বিশ্লেষণ এ নিবন্ধের লক্ষ নয়, এ বিষয়ে সূত্রগুলির আলোচনাই এ নিবন্ধের লক্ষ।

৫.৭. কবিতার ভাষা ইঙ্গিতপূর্ণ (Gestic/Gestual/Gestish) হতে পারে। ব্যের্টোল্ট ব্রেশট বলছেন "বাক্যটি সম্পূর্ণভাবে বক্তার ইঙ্গিতকে অনুসরণ করবে। বাইবেলীয় 'Pluck out the eye that offends thee' ইঙ্গিতভিত্তিক—আদেশের ইঙ্গিত, কিন্তু সম্পূর্ণ ইঙ্গিতপূর্ণভাবে ব্যক্ত নয়, কেননা 'That offends thee' এই অংশটার মধ্যে আরো ইঙ্গিত রয়েছে যা অব্যক্ত, ব্যাখ্যার ইঙ্গিত।" সাধারণভাবে বলা যেত If thine eye offends thee, Pluck it out এখানে ইঙ্গিত রয়েছে স্বাভাবিক That offends thee-র মত পুনরিঙ্গিত নেই[৪২] অর্থাৎ 'Pluck out...thee', বাক্যটি আরো বেশি আকৃত। প্রচলিত ছন্দমিল সম্পর্কে ব্রেশট ক্লান্ত বিরক্ত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। ব্রেশট-এর কবিতা একটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হ'ল—

এমনকি সেই মহাপ্লাবন
অনন্তব্যাপী হয়নি
কমতে কমতে নেমে গেছে
কালো জল
অথচ কত কম লোক
দীর্ঘ দিন বেঁচেছিল।—'হরেস পড়ার সময়' অনুবাদ লোঠার লুৎসের সহযোগে বর্তমান নিবন্ধকারের।

৬.১. বাংলা কবিতায় ভারতীয় অতিকথার (মিথ) ব্যবহার প্রায় উঠেই গিয়েছিল, আধুনিক অতিকথার ব্যবহার অবশ্য পাওয়া গেছে। কবিতার ভাষায় 'অতিকথা' কি কি কাজ করে ?

(ক) অতিকথা একটি উদ্দীপক।
(খ) অতিকথার সাহায্যে কবিতায় একটি মাত্র শব্দের সাহায্যে অনেক ঘটনা বলা যায়।
(গ) অতিকথায় ব্যক্তি সমাজের অনেক দ্বন্দ্ব বৈপরীত্য স্পষ্ট উচ্চারিত হয়।
(ঘ) মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যে সব অলৌকিক শক্তি, বিশ্বাস আছে তার সত্যাসত্য সম্পর্কে দ্বন্দ্ব তৈরি করা যায়।
(ঙ) অতিকথা কবিকে নিয়ে যায় এক সার্বজননীতার দিকে, ধ্রুপদী পৌরাণিক সংস্কৃতির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে।
(চ) বাক্যে এক ধরনের সংকেত-প্রতীক চিহ্ন স্থাপন করা যায়।
(ছ) পৌরাণিক অতিকথা, কিংবদন্তী, আধুনিক অতিকথা, লোক (অতি) কথা আধুনিক-অতিকথার দ্বন্দ্ব তৈরি করা যায়।
(জ) অতিকথার সাহায্যে এক কৃতি অতিরিক্ত গ্রন্থন পাওয়া যায়, বাগর্থের আরেকটি স্তর তৈরি করা যায়।
(ঝ) এমনও বোঝানো যায়, ঘটনাটি সাবেক পুরাণের যুগে ঘটেছিল বা ঘটেনি,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ একটা অলীক কাহিনী। 'অমুক' বিশ্বাসটা মিথ্যা। পুরাণ বা মিথ বা অতিকথা শব্দের মধ্যেই বিশ্বাস অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব আছে।

৬.২. মিথ বা পুরাণ বা অতিকথার মত কবিতায় প্রবাদের ব্যবহারেরও আলাদা তাৎপর্য আছে। কবিরা অনেক সময় প্রবাদকে সাহিত্যে প্রবিষ্ট করেন বক্তব্যের জন্য, গ্রন্থনের জন্য, তাৎপর্যের জন্য। কবিরা অনেক সময় প্রবাদ তৈরি করেন বা কবিতার পদ প্রবাদ হয়ে যায়। বাংলা কবিতায় সেই চর্যাপদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত প্রবাদের ব্যবহার চলে আসছে; যদিও উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে কবিতায় প্রবাদের ব্যবহার ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে হতে প্রায় বিলুপ্ত। প্রবাদ মিথ বা অতিকথার ৬.১. পর্যায়ে বর্ণিত (ক) (গ) (ঘ) (ঙ) (চ) (জ) ভূমিকাটি পালন করে। মিথকে যদি মিথ্যার সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে সুশীলকুমার দে অবলম্বনে বলা যায়, প্রবাদের মধ্যে যে সত্যটি ধরা আছে তা প্রায়ই আপেক্ষিক সত্য—তত্ত্বের সত্য নয়, তথ্যের সত্য। প্রবাদ মূলত বাস্তব ঘেঁষা, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ, দীর্ঘ অভিজ্ঞতাপ্রসূত সংক্ষিপ্ত বাক্য। প্রবাদে মিথের মত অতটা দ্বন্দ্ব নেই, জটিলতা নেই। প্রবাদ সহজবোধ্য, ও নিতান্ত সাধারণ সামান্য। প্রবাদের ভাষা প্রায়ই জোরাল—অনেক সময়েই 'সরাসরি' বলা যায়। যে বিষয় উপলক্ষ্যে প্রবাদের প্রয়োগ তা অব্যক্ত থাকলেও অস্পষ্ট নয় এবং 'চুম্বকে প্রকাশিত ব্যঞ্জনা ও দৃষ্টান্তের সহজ সার্থকতার' ওপরই প্রবাদের 'মূল্য ও সমাদর' নির্ভর করে। 'শব্দের স্বল্পতা ও অর্থের আধিক্য প্রবাদের একটি সাধারণ লক্ষণ', 'কিন্তু লঘু বাক্‌সূত্রের যে সংহত চাতুর্য আছে' তা প্রবাদের একমাত্র সম্বল নয়।[৪৩] আজকের বাংলা কবিতায়, সংস্কৃতির সঙ্গে ভাষার যে যোগ রবীন্দ্রনাথ, সুশীলকুমার দে, সাপীর এবং লোৎমন বলেছেন, সেই যোগসূত্রটির বড় অভাব। বহুজাতিকতার প্রভাবে হয়ত আজকের বাঙালি কবিদের ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠতা নেই বলেই।

৭.১. কবিতাকে যদি একটা কাজ বলে ধরি তাহলে তার জন্য একটা কারণ থাকবে না তা হয় না। চিন্তা হ'ল এক ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া। কোন মানুষের মনে চিন্তা জাগ্রত হলে সে যদি সেই চিন্তা অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চায় তাহলে চিন্তাকে প্রকাশের জন্য ভাষার আশ্রয় নিতে হয়। ভাষা চিন্তার বাহন মাত্র, চিন্তার বহিঃপ্রকাশের সাহায্য করে। ভাষা না থাকলে চিন্তার প্রকাশ ঘটত না। কবি ব্যক্তিটির চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে তার কবিতার ভাষায়। কবিতা রচনার আগে কবিমনে উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে, এই উত্তেজনা ভাষা ব্যবহারের অব্যবহিত পূর্ব কারণ আর ভাষা হ'ল তার অন্যতম প্রতিক্রিয়া [উত্তেজনার ভাষিক প্রকাশ ছাড়াও প্রতিক্রিয়া হয় নানা ধরনের] আবার উত্তেজনাও ভাষায় প্রকাশের পূর্বাবস্থা নাও হতে পারে যেমন প্রতিক্রিয়া সব সময়ে ভাষা নাও হতে পারে।[৪৪] ভাষাতেই, কবিতার ভাষাতেই, উত্তেজনা ও প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়, তৈরি করা যায়।

৭.২. রাজকৃষ্ণ রায়ের 'বর্ষার মেঘ' নামে গদ্য-পদ্য মিশ্রিত এক কৃতি ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, যার পাদটীকায় তিনি লিখেছিলেন, "যে সকল গদ্যে পদ্যের কাব্যাত্মক ভাব থাকে, সেই সকল গদ্যের কোন কোন বিষয় এইরূপ পদ্য-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
পোঙ্‌ক্তিক প্রণালীতে সাজাইয়া লেখা আমার বিবেচনায় ভাষার একটী নূতন অঙ্গ।" 'বর্ষার মেঘ' থেকে কিছু অংশ তুলে দেওয়া হ'ল—

"আকাশ নীল—অনন্ত নীল,
মানব চক্ষু অনন্ত নয়—
সুতরাং আকাশ অনন্ত নীল !

*

তা'রা কখনো ক্ষুদ্র ?
তা'দের চেয়ে তবে বড় কে ?—ঈশ্বর।
ও একই কথা—যে ঈশ্বর সেই পরমাণু।"

এতো প্র-ভাষা ! পদ্যপোঙ্‌ক্তিক সাজে দর্শনের আলোচনা, তথ্যের স্তর সঙ্কীর্ণ। রাজকৃষ্ণ রায়ের এই কৃতিটিকে কবিতা আখ্যা দেওয়ার আগে সংশয় প্রকাশ করব। ১৮৮৪ সালে তিনি যে ভাষার 'নূতন অঙ্গ' সম্পর্কে ভাবতে পেরেছিলেন এটাই বড় ঘটনা।[৪৫]

রবীন্দ্রনাথ লিপিকায় 'অ-ছন্দের শক্তিতে কাব্যের স্রোতকে তার বাঁধ ভেঙে প্রবাহিত করা'র·····চেষ্টা করেছিলেন। 'লিপিকা লেখার পর বহুদিন আর গদ্যকাব্য লিখিনি। বোধ হয় সাহস হয় নি বলেই।' লিপিকা কাব্যধর্মী গদ্য, [এইরকম কাব্য আর কবিতাধর্মী গদ্য বঙ্কিমচন্দ্র, বিভূতিভূষণ-মানিক-তারাশঙ্কর—তিন বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলকুমার এবং অমিয়ভূষণের উপন্যাসে পাওয়া যায়] রেখাগত আকম্পের দিক দিয়ে আমরা যদি দেখি, এবং তথ্যের স্তরও ঘননিবদ্ধ নয়, খানিকটা গদ্যের মত বিস্তৃত। 'পুনশ্চে' এসে রবীন্দ্রনাথ রেখাগত আকম্পে সংশয় কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন, কিন্তু তথ্যের স্তর সম্পর্কে তাঁর সংশয় ছিল। আবার সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 'সংবর্তে'র (১৯৫৩) মুখবন্ধে লিখেছিলেন, "বিশ বৎসর যাবৎ আমি যদিও জ্ঞানত গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ চাই, তবু এখনও আমার সাধ ও সাধ্য মাঝে মাঝে পরস্পর বাধ সাধে। ফলত ছন্দোরক্ষার খাতিরে অথবা মিলের গরজে সাধু ও প্রাকৃত ভাষার সংমিশ্রণ, নামধাতুর বাহুল্য, বিভক্তি বিপর্যয়, ইত্যাদি বাংলা কাব্যের অনেক অভ্যাস দোষ একাধিক কবিতায় র'য়ে গেল ;" সুধীন্দ্রনাথ সচেতন ভাবেই 'অসংকুচিত' গদ্যরীতি তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেন নি তবে চলিত ক্রিয়াপদ ধারাবাহিক ভাবে ব্যবহার করে গেছেন তৎসম কথামালার সঙ্গে। এই সচেতন গ্রন্থন, রেখাগত আকম্প, ছন্দমিলের গৃহীত রূপ এবং তথ্যের স্তরে ঘননিবদ্ধতা, সব দিক দিয়েই তাঁর কবিতা কাব্যকবিতাধর্মী।

৭.৩. শিল্পিত ভাষা [কবিতা, গল্প, উপন্যাস] সাধারণ ভাষার চেয়ে অনেক বেশি তথ্য বহন করে। কবিতার ভাষা গল্প, উপন্যাসের ভাষার চেয়ে আরো বেশি তথ্য বহন করে, কবিতায় তথ্য চিহ্নের স্তরে, শৈলীর স্তরে, বাগর্থের স্তরে ঘন নিবদ্ধ—গল্প উপন্যাসে যা বিস্তারিত।

"স্বাভাবিক মধ্যশ্রেণী নিম্নশ্রেণী মধ্যবিত্তশ্রেণীর পরিধি থেকে ঝ'রে
এরা তবু মৃত নয় ; অন্তবিহীন কাল মৃতবৎ ঘোরে।"

—জীবনানন্দ দাশ, 'এই সব দিন রাত্রি' : শ্রেষ্ঠ কবিতা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"প্রলেটারিয়েটদের নেতা প্রলেটারিয়েটদের ভেতর থেকেই হওয়া উচিত। বুর্জোয়ারা আসে কেন আমাদের কাপ্তেনি করতে? সুতীর্থবাবু তো বালিগঞ্জের লণ্ডিরে ইন্তিকরা বুর্জোয়া; বস্তি দেখেননি কোনদিন, শ্রমিকদের চেনেন না, কিষাণদের চেনন না, আন্দোলনের ইতিহাস জানা নেই, মানুষকেই দেখেননি তিনি এমনই মহামানুষ,—এই সব পাতিমানুষ কেন ফোপরদালালি করতে আসে হে?

—জীবনানন্দ দাশ, 'সুতীর্থ' (উপন্যাস)।

[ ] তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে মন্তব্য নিবন্ধকারের।

পাদটীকা ও গ্রন্থনির্দেশ

১ LOTMAN 1977 পৃ ২৪। রুশ ভাষার মূল গ্রন্থ 'STRUKTURA KHUDOZHESTVENNOGO TEKSTA' (1970) মস্কোর ISKUSSTVO প্রকাশন থেকে প্রকাশিত।

২) BARTHES, 1972 ধ্রুপদী কবিতা ও আধুনিক কবিতার পার্থক্য দেখিয়েছিলেন—চিহ্নবিজ্ঞানের ভিত্তিতে। এ প্রসঙ্গে নিবন্ধকারের কাছে প্রবাল দাশগুপ্তের বিশ্লেষণ উদ্ধৃত করা হ'ল—

"Barthes assumes that an ordinary semiological system, an ordinary system of signs, attempts to PROGRESS or expand, attempts to MEAN something in addition to the starting point (the signs themselves). In the case of classical literature, of all kinds, Barthes contends that, first, the words and sentences function at a primary level as ordinary signs, and they project a first ordinary meaning (as they would in any use of language, e. g. everyday conversation), and that, at a secondary level, the PAIR constituted by the primary signifier (the language-body of the literary work) and the primary signified (the 'first ordinary meaning' which I just mentioned), as a whole, acts as a second-level signifier which projects a second-order meaning or signified. This, if I understand Barthes, is the mythical level. Myth is the mechanism of second-order signification. Classcal literature uses specific machinery, such as metre, alliteration, narrative technique, etc. to regulate the process of second-order signifieation. All this machinery may be viewed as 'second-order signs' superimposed on the first-order (ordinary) words and sentences.

In contrast, the anti-semiological system of modern poetry is regressive. Its project is to make the signifier-signified pair turn back on itself and eliminate the signifier, leaving only the pure signified essence itself, something behind language or underneath language, reality itself if one can imagine it directly. The manner in which modern poetry attempts to carry out this impossible project is the exact reverse of the manner of classical poetry. Modern poetry, instead of enriching the language-body, deliberately impoverishes it

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

and strains it. Barthes says it 'clouds the language,' etc., on p. 133, lines 17—20, of the photocopy you have sent me.

Ordinary language is a first-order semiological system ; here, the singnifier (words, sentenees) projects a meaning, a signified

Classical poetry is a second-order semiological system ; there, the second-order signifier (which CONSISTS of the first-order signifier CARRYING the first-order meaning) carries a second-order signified ; this is done by superimposing certain formal extras (like alliteration metre...) on the first-order signifier.

Modern poetry wishes to be a zero-order semiological system ; it wants there to be NO signifier, ideally pure silence, carrying a true signified, undistorted by the arbitrary vagaries of a first or second-order process. But the goal of this process is unattainable, since pure silence would in fact communicate nothing. So modern poetry tries to pull language 'back towards silence', and tries to show that it is trying to do this. It tries to show this by such gestures as impoverishing the language of poetry, direct imitation of reality (as in e. e. cummings' wavy mode of printing), direct screams (as in Artaud), etc ". এ প্রসঙ্গে LOTMAN, 1977 পৃ ৯ দ্রষ্টব্য।

৩) LOTMAN 1977 পৃ ১০৪।

৪) সুশীলকুমার দে ১৯৪৫, পৃ ২৪।

৫) SAPIR, 1921, পৃ ২১৯, ২২৫,

৬) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৬৮ ব, 'গদ্যছন্দ', পৃ ২৭০।

৭) নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১৯৬০, পৃ ৪৮ (২)।

৮) ঐ পৃ ৯৭-৯৮।

৯) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৭৩ ব, 'ভাষার কথা', পৃ: ২১১।

১০) সুশীলকুমার দে, ১৯৪৫, পৃ ২২।

১১) শিশিরকুমার দাশ, ১৩৯২ব, পৃ ৩২।

১২) Milton, 1674

"The measure is English heroic verse Without rhyme, as that of Homer in Greek, and of Virgil in Latin ; rhyme being no necessary adjunct or true ornament of poem or good verse ; in longer works especially, but the invention of a barbarous age, to set off wretched matter and lame metre ;"

(The Verse, Introductory note to Paradise Lost)

মধুসূদন প্রসঙ্গে মিলটনের তত্ত্ব সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অমিতাভ গুপ্ত।

১৩) রবীন্দ্রনাথ, ১৩৬৮ ব, 'তথ্য ও সত্য', পৃ ৩১৭।

১৪) Levin 1962, পৃ ১৭৯ ধৃত।

১৫) পবিত্র সরকার, ১৯৮৫, পৃ ২২।

১৬) মৈত্রেয়ী দেবী, ১৯৪৩, পৃ ১১১।

১৭) লোঠার লুৎসে, ১৩৮৪ ব, পৃ ৮২/৮৩।

১৮) প্রমথ চৌধুরী, ১৯৫২, পৃ ১৩৯।

১৯) মনসুর মুসা, ১৯৮০, উদ্ধৃত।

২০) ঐ,

২১) ঐ, উদ্ধৃত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

২২) Lotman 1977 পৃ ১৬। এ প্রসঙ্গে সুশীলকুমার দে, ১৯৪৫ Sapir, 1921 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৬৮ ব এবং শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ১৩৫৮ ব, পৃ ৯৭-৯৮ দ্রষ্টব্য।

২৩—২৬) Jakobson, 1960, পৃ ৩৫০—৭৮। উদ্ধৃতির বাংলা অনুবাদ ২৩ ও ২৫ পুষ্কর দাশগুপ্ত, ১৯৮২ অবলম্বনে, ২৪, ২৬ নিবন্ধকারের।

২৭) Lotman, 1977 পৃ ৯৮।

২৮) ঐ, পৃ ২০৪।

২৯) ,, ,, ১৫৪।

৩০) ,, ,, ১৫৪-৫৫।

৩১) ,, ,, ১৬৮।

৩২) ,, ,, ১৮৬।

৩৩) ,, ,, ২৭০।

৩৪) Wittgenstein, 1967, পৃ ২৮।

৩৫) অমিতাভ গুপ্ত, ১৯৮৫, পৃ ১০১-১০৩।

৩৬) Lotman, 1977, পৃ ২৮৩।

৩৭) ,, পৃ ২৮৪।

৩৮) ,, ,, ১৭৭।

৩৯) ,, ,, ১৬৯।

৪০) ,, ,, ১৭০।

৪১) ,, ,, ১৭৪।

৪২) Brecht, 1981, On Rhymeless Verse with Irregular Rhythms, পৃ ৪৬৫। মূল নিবন্ধ 'Das Wort' গ্রন্থে, ১৯৩৯ এ প্রথম প্রকাশিত।

৪৩) সুশীলকুমার দে, ১৯৪৫, পৃ ১৮। প্রবাদ প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ডঃ শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়কে কৃতজ্ঞতা জানাই।

৪৪) ভাষাবিজ্ঞানের গবেষক তরুণ ভট্টাচার্য এই সূত্রটি নিবন্ধকারকে ব্যাখ্যা করেছেন। এ প্রসঙ্গে শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ১৩৮০ ব, পৃ ৩৪-৩৫ দ্রষ্টব্য।

৪৫) আর্য্য দর্শন ১৮৮৪, পৃ ১৭৫-৭৬। কৃতিটি সংগ্রহ করে দিয়েছেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রশান্ত রায়।

গ্রন্থপঞ্জী

অমিতাভ গুপ্ত। ১৯৮৫। প্রিয়বরেষু। জনপদ-২, ১৩৯২ কলকাতা।

অরিন্দম চক্রবর্তী। ১৯৮২। মানে বিষয়ক দার্শনিক সমস্যাবলী। গাঙ্গেয়পত্র। কলকাতা।

আর্য্য দর্শন। ১৮৮৪। ১০ম খণ্ড। ১ম সংখ্যা। বৈশাখ ১২৯১।

উদয়নারায়ণ সিংহ। ১৯৭৯। চর্য্যাবাক্যব্যবচ্ছেদ বিষয়ক প্রস্তাব। গাঙ্গেয়পত্র ৭ ১৯৭৯। কলকাতা।

,, । ১৯৭৭। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কবিতা বিষয়ক আলোচনা। গাঙ্গেয়পত্র—৫, ১৯৭৭। কলকাতা।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু। ১৯৭৯। কাহ্নের দোহা ও ভাষাবিচার। গাঙ্গেয়পত্র ৭, ১৯৭৯। কলকাতা।

নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ১৯৬০। রাজশেখর ও কাব্যমীমাংসা। বিশ্বভারতী। শান্তিনিকেতন।

পবিত্র সরকার। ১৯৭৯। শাক্তপদাবলী : সাদা চোখে। গাঙ্গেয় পত্র ৭, ১৯৭৯। কলকাতা।

,, । ১৯৮৫। গদ্যরীতি পদ্যরীতি। সাহিত্যলোক। কলকাতা।

পরিভাষাকোষ : ভাষাতত্ত্ব। ১৯৭০। বাংলা একাডেমী ঢাকা।

পুষ্কর দাশগুপ্ত। ১৯৮২। কবিতা-অকবিতা প্রসঙ্গে। পিলসুজ-১৭, ১৯৮২। হাওড়া।

প্রবাল দাশগুপ্ত। ১৯৭৫। ভাষাবিদ্যার সাহিত্য চিন্তা। গাঙ্গেয় পত্র-১, ১৯৭৫। কলকাতা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রবাল দাশগুপ্ত। ১৯৭৭। অন্নদামঙ্গল প্রসঙ্গে। গাঙ্গেয়পত্র-৪, ১৯৭৭। কলকাতা।
" । প্রকাশিতব্য। কথার ক্রিয়া ও কর্ম। দে'জ। কলকাতা।
প্রমথ চৌধুরী। ১৯৫২, ৫৪। প্রবন্ধ সংগ্রহ। সংশোধিত সংস্করণ ১৯৭৪। বিশ্বভারতী। কলকাতা।
প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা। ১৯৮৬। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি। প: ব: সরকার। কলকাতা।
মনসুর মুসা। ১৯৮০। ঔপনিবেশিক ভাষানীতি প্রসঙ্গে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা-১২, ঢাকা।
মৈত্রেয়ী দেবী। ১৯৪৩। মংপুতে রবীন্দ্রনাথ। রূপা (১৯৬৭ সং) : কলকাতা।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৩৬৮ ব। রচনাবলী। চতুর্দশ খণ্ড। প: বঙ্গ সরকার। কলকাতা।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৩৭৩ ব। রচনাবলী। পঞ্চদশ খণ্ড। প: বঙ্গ সরকার। কলকাতা। জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ।
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। ১৩৫৬ ব। রচনাবলী। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ : কলকাতা।
শশিভূষণ দাশগুপ্ত। ১৩৫৮ ব। শিল্প-লিপি (৩য় মুদ্রণ ১৩৮২ ব)। এ, মুখার্জি। কলকাতা।
শশিভূষণ দাশগুপ্ত। ১৩৮৩ ব (৭ম সং)। বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ। এ. মুখার্জি। কলকাতা।
শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৮৩। প্রসঙ্গ : জীবনানন্দ। অয়ন। কলকাতা।
শিশিরকুমার দাশ। ১৩৯২ ব। গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব। দে'জ। কলকাতা।
সোঠার লুৎসে। ১৩৮৪ ব। প্রসঙ্গ : ফুটবল (শক্তি চট্টোপাধ্যায়)। কালপুরুষ ৩য় বর্ষ; সংকলন-১। কলকাতা।
" । ১৯৮১। সাহিত্যে পরিবর্তন (অনু: উদয়নারায়ণ সিংহ) গাঙ্গেয় পত্র-৮, ১৯৮১। কলকাতা।
সুকুমার সেন। ১৩৬৪ ব। ভাষার ইতিবৃত্ত। ইষ্টার্ন পাবলিশার্স। কলকাতা।
" । ১৯৪০। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। " । " ।
সুধীরকুমার দাশগুপ্ত। ১৩৮৬ ব। কাব্যালোক। (পঞ্চম সং.) এ. মুখার্জি। কলকাতা।
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ১৯২৯। বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। কলকাতা।
সুশীলকুমার দে। ১৩৪৫। বাংলা প্রবাদ। ৩য় সং, ১৩৯২। এ. মুখার্জি। কলকাতা।
" । ১৯৫৪। নানা নিবন্ধ। মিত্র ও ঘোষ। কলকাতা।
হুমায়ুন আজাদ। ১৯৮৩ ক। বাংলা ভাষার শত্রু মিত্র। বাংলা দেশ ভাষাবিজ্ঞান পরিষদ ও লোকালয়-মুদ্রায়ণ। ঢাকা।
" । ১৯৮৩ খ। শামসুর রহমান / নিঃসঙ্গ শেরোপা। বাংলা একাডেমী। ঢাকা।
" । ১৩৮৫। বাংলা ভাষা (সম্পাদিত)। বাংলা একাডেমি। ঢাকা।

খ. বিদেশী ভাষায়

Basin, Yevgeny. 1979. (Trs) Semantic Philosophy of Art. Progress, Moscow
Barthes, Roland. 1977. (Trs) Image-Music-Text. Fontana, U. K.
" 1972. (Trs) Mythologies, J. Cape, London.
" 1967. (") Writing Degree Zero. " "
Brecht, Bertolt. 1981. (Trs) Poems 1913—1956, Radha Krisna. New Delhi.
Chapman, Raymond. 1973, Linguists and Literature, Edward Arnold ; London.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Culler, Jonathan. 1975. Structuralist Poetics, Ithaca : Cornell.
" ". 1979. Barthes, Fontana ; U.K.

Friedrich, Paul. 1979. Language, Context and the Imagination, Stanford University Press ; California.

Fowler, Roger. 1971. The Language of Literature. Routledge and Kegan Paul ; London.

Garvin, Paul. ed. 1964. A Prague School Reader on Esthetics, Literaturary Structure, and Style ; George Town.

Jakobson, Roman 1960. Linguistics and Poetics. In Sebeok,
" " & Halle, Morris. 1959. The Fundamentals of Language, Mouton ; The Hague.

Jauss, Hans-Robert. 1982. Trs. Toward an Aesthetic of Reception The Harvester Press Ltd ; Sussex

Levin, Samuel R. 1962. Linguistic Structures in Poetry. Mouton : The Hague.

Lotman, Jurij (Yuri) 1976. Trs. Analysis of the Poetic Text. Ardis : Ann Arbor.
" 1977. Trs. The Structure of the Artistic Text. The University of Michigan, Ann Arbor : Michigan.

Majejka, Ladislav and Pomorsa, Krystyna. 1971 Edt. Trs Readings in Russian Poetics. Formalist and Structuralist Views, M I.T Press : Cambridge.

Marx, Karl and Engels, Friedrich. 1959. Edt. Basic Writings on Politics And Philosophy Doubleday Anchor : New York.

Milton, John. Paradise Lost. Ed II, 1674.

Mukarovsky, Jan 1964. Standard Language and Poetic Language. In Gravin.

Nowottny, Winifred. 1965. The Language Poets Use. The Athlone Press.

Pears, David. 1971. Wittgenstein. Fontana : U. K.

Preminger, Alex. 1965. Edt. Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. The Macmillan Press Ltd : London. Enlarged Edn, 1975.

Riffaterre, Michael. 1978. Semiotics of Poetry. Methuen : London.

Sapir, Edward. 1921. Language. Harcourt, Brace : New York.

Sebeok, Thomas. 1960. Edt. Style in Language. MIT : Cambridge.

Todorov, Tzvetan. 1982. Edt. Trs. French Literary Theory Today : A Reader. Cambridge University Press ; Cambridge.

Wittgenstein, Ludwig. 1967. Trs. Zettel. Oxford U. Press : Oxford.

Valéry, Paul. 1958. Trs. The Art of Poetry. Pantheon Books. New York.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অমিতাভ গুপ্ত

ন্যগ্নে নব্যসা বচস্তনূষু শংসমেষাম্*

১.

যে কোনো যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের লড়াই করতে হয় সমসাময়িক অবক্ষয়ের সঙ্গে। যে কোনো শ্রেষ্ঠ মানুষকেই বোধহয় এই লড়াইয়ে নামতে হয়, কিন্তু সাহিত্যিকদের বেলায় সেটা স্পষ্ট চোখে পড়ে এবং তাঁদের চরিত্রে এই লড়াকু প্রবণতা থাকাটা এক রকমের অনিবার্য দাবি হ'য়ে ওঠে। এ' দাবি মানবসভ্যতার দাবি, সংস্কৃতির দাবি।

তা হ'লে কি ধ'রে নিতে হবে, একজন সাহিত্যকর্মীর এমন বিরল প্রতিভার অধিকার আছে যা সমসাময়িক বিজ্ঞানীর বা চিকিৎসকের, রাজনীতিবিদ্ বা সমাজ-নেতার অর্জন করা সম্ভব নয়? এই প্রশ্নের সরল উত্তর সকলেরই জানা। সাহিত্যিকের কাজের উপকরণ আলাদা, তাঁকে কাজ করতে হয় ভাষা নিয়ে—যে ভাষার বহুমাত্রিক আকরণ বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, রাজনীতিবিদ্ বা সমাজনেতাকে বিভিন্ন স্তরে ছুঁয়ে রয়েছে। প্রাসঙ্গিক সবচেয়ে বিদিত দৃষ্টান্তটি বোধহয়, আণবিক বোমার প্রথম বিস্ফোরণ দেখে বিহ্বল ওপেনহাইমার গীতাকাব্য দিবিসূর্যসহস্য ইত্যাদি আবৃত্তি করেছিলেন। আবার, ভাষা নিয়ে কাজ করবার সুযোগেই একজন সাহিত্যকর্মী অবক্ষয়ের সঙ্গে তাঁর যুগের অবসাদের সঙ্গে লড়াই করবার নতুন জমি খুঁজে পান। যদিও ভাষার চরিত্রলক্ষণে ইতিহাসের পরম কৌতুকপ্রিয়তা ধরা পড়ে, যদিও যে ভাষা ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানমুখী জীর্ণ কবিরা খ্যাতি ও অর্থের পশ্চাদ্ধাবন করেন—একজন উত্তর-আধুনিক কবি সেই একই ভাষা ব্যবহার করে আজকের বিদ্রোহের রূপায়ণ স্বচ্ছন্দে করতে পারেন, তবু বিদ্রোহীর কলমে সেই একই ভাষা এক হয়েও যেন অন্যতর রূপ পায়।

২.

ভাষার এই আপাতজটিল তীক্ষ্ণতাকে না বুঝলে উত্তর-আধুনিক কবিতার গ্রন্থনরীতিকে স্পষ্টত চেনা যায়না। আমাদের প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা, এবং পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-আধুনিক কবিতা। উত্তর-আধুনিক কথাটি ব্যবহার করতে হচ্ছে আমাদের সাম্প্রতিক কবিকর্মের নতুন চেহারার একটা কাজ-চালানো-গোছের পরিচয় দেওয়ার জন্যে। শব্দবন্ধটি হয়ত ব্যাকরণদোষে দুষ্ট কিংবা অপূর্ণ-অবয়ব। তবু, এই উত্তর-

* হে অগ্নি, আমাদের জন্য নতুন কবিতা রচনা কর।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আধুনিক শব্দটি ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গেই একঝলক্ সতেজ নবীন হাওয়া ঝাঁপিয়ে পড়ে। মনে পড়ে যায় গত দশবছরে তরুণদের লেখালেখির কথা। অবশ্য এই দাবিও অসঙ্গত যে সব তরুণ-তরুণীই উত্তর-আধুনিক। গত দশবছরে এমন অনেক তরুণ-তরুণীর লেখাও পড়েছি প্রথম থেকেই যাঁদের পাকা মাথা। প্রথম থেকেই যাঁরা ইউরোপ-আমেরিকার উচ্ছিষ্ট আধুনিকতার কাছে আত্মনিবেদন করে রেখেছেন। যেহেতু এই আত্মনিবেদন তাঁদের কোনো একদিন সুনীলসাপ্তাহিক প্রতিষ্ঠানপণ্যশালা ইত্যাদির কোটরে ঢুকিয়ে দেবে।

তাঁদের বাদ দিলেও—এবং তাঁদের বাদ দিতেই হবে—এমন নবীন কবির সংখ্যা আজ কিন্তু কম নয় যারা অত্যন্ত সাবলীলভাবে ওই পচাগলা আধুনিকতা থেকে কলম সরিয়ে রেখেছেন। তাঁদের কয়েকজনের কবিতা পাঠ করে আমরা উত্তর-আধুনিক কবিতার আকরণ বুঝবার চেষ্টা করছি। কেবলমাত্র বর্তমান লেখকের অজ্ঞতার জন্যেই তাঁদের সকলের কবিতা এখানে উপস্থিত করা গেলনা। মনে রাখা দরকার, উত্তর-আধুনিক কবিতার এই আলোচনা সামান্য ও আংশিক। এই আলোচনাকে বৃহত্তর কোনো প্রবন্ধের উপক্রমনিকামাত্র হিসেবে নিবেদন করা হ'ল। যে প্রবন্ধ খ্যাতি-প্রতিষ্ঠার কুয়াশা ও কুসংস্কার মুছে গেলে, লোভী শৃগালদের সব চীৎকার থেমে গেলে, যোগ্যতর কেউ লিখবেন।

৩.

ভিখারির মতো, কখনো বোদলেয়ার কখনো গীন্সবার্গ কখনো কামিংস্ কখনো প্যাপার কাছে কবিতার গ্রন্থনরীতি ও ভাষাব্যবহার চেয়ে বা চুরি করে আনা, এ' দেশের আধুনিকতার এই ছিল প্রধান লক্ষণ—অন্তত তার শেষদশায়, ষাটে ও সত্তরে, সত্তর দশকে তার মৃত্যু পর্যন্ত, এবং মৃত্যুর পরে এখনও তার প্রেতবাহকদের লেখা-লেখিতে ওই একটি লক্ষণই অলজ্জ। ন্যাংটোপাগলের যেমন লজ্জাবোধ থাকেনা আর কি, যেমন আন্তর্জাতিকতাবোধের একটি গালভরা নামে ওই চুরি ও জোচ্চুরিকে সাজানো যায়। মুখস্থ করতে পারলেই বা নকল করতে পারলেই যদি শিল্পী হওয়া যেত তা'হলে শিম্পাঞ্জি বা তোতাপাখির চেয়ে বড়ো শিল্পী আর কে।

৪.

ষষ্ঠ দশকের গোড়ার দিকে বিখ্যাত কৃত্তিবাসী ও অন্যান্য প্ররোচনায় বাংলা কবিতার আকরণিক পরিবর্তন নাকি ঘটেছিল। আসলে কিছুই ঘটেনি। নেশা, যৌনতা, লুম্পেনিজম্ ইত্যাদি ক্ষেত্র থেকে কিছু শব্দ সংগ্রহ করে কবিতার এখানে ওখানে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা দেখা গেল, এইমাত্র। সেইসব আত্মঘোষণাসর্বস্ব কবিদের এ'তথ্যটি জানা ছিলনা যে ভাষা কেবলমাত্র শব্দনির্ভর নয়, কিংবা শব্দের ব্যঞ্জনা ছাড়াও কবিতার একটি গ্রন্থন রীতি আছে। উত্তর-আধুনিক কবিতাগুচ্ছের একটি উল্লেখ করা যাক্ :

> বাদল ফিরে এসে, মাঠ কেটে, নিজের মনের মতো
> জলাশয় গড়লো ; পঞ্জরময় গাভী, রেলব্রিজের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পিছনে দাগী আকাশ, সবই আছে, কিন্তু এমনভাবে,
ভাতের হাঁড়ির নিচে আগুন নেই, জল
নদীতে জল নেই, আগুন ; উদ্বেগ এইজন্য।[১]

একটি সম্পূর্ণ ছবির আয়োজন : আপাতভাবে এই ভাষাপ্রয়াসে। কিন্তু ছবিকে অতিক্রম ক'রে যে চিত্রবিপর্যয়ের দিকে লেখক আমাদের টেনে নিতে চাইছেন, ভাষাই তাকে বিশিষ্ট গতিমুখ দান করেছে। প্রথম দু'ছত্রের বাদল ও জলাশয়, দ্বিতীয় দু'ছত্রের দাগী ও আগুন-এর বিপরীত বিন্দুতে এসে যে গতিসঞ্চার করেছে—শেষছত্রের উদ্বেগ যা পাঠককে ভাষিক উত্তেজনার দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তার স্বাভাবিক পরিণতি।

কেবল এ'টুকু বললে উত্তর-আধুনিক কবিতার আঙ্গিক কুশলতার দিকেই মাত্র ইঙ্গিত করা হয় যেন। উত্তর-আধুনিক কবিতার ভাষা কেবলমাত্র আঙ্গিকমুখী নয়, আলোচ্য কবিতারও নয়। এই সম্পূর্ণ কবিতাটির অঙ্গিকের ঘনবদ্ধতা ও সমতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকতে পারেনা, কিন্তু কাব্যভাষা এখানে তার চেয়েও অতিরিক্ত কিছু দান করেছে আমাদের। একটি অন্তহীন মানবপটভূমির মাঝখানে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে এই কাব্যভাষা।

৫.

আধুনিক কবিতার ভাষা যে আড়ষ্ট ও প্রায়ই সীমিত শক্তির অধিকারী হয়েছিল, তার প্রধান কারণ বোধহয় আধুনিক কবিদের এই মানবপটভূমি সম্পর্কে সচেতনতার অভাব। তাঁদের বিখ্যাত মানবতাবাদ এত বেশী বানানো, এত বেশী অন্তঃসারশূণ্য যে তাঁদের ব্যবহৃত কাব্যভাষায় আড়ষ্টতা এসে যেতই। মনে রাখা দরকার, আধুনিকরা ততটাই মানবপ্রেমী যতদূর গিনিপিগপ্রেমী হতে পারেন একজন গিনিপিগ ব্যবসায়ী। প্রসঙ্গত, এ'কথাও মনে রাখা দরকার যে উত্তর- আধুনিক কবিতার প্রতিতুলনায় আমরা বর্তমান নিবন্ধে যে আধুনিক কবিদের উল্লেখ করছি, তাঁরা আধুনিকতার শেষদশার, অর্থাৎ পঞ্চাশ—ষাটের প্রজন্মের কবি। স্বভূমিবিমুখ, আমেরিকান জীবনচর্যায় দীক্ষিত ও শিশ্নসর্বস্ব যৌনতাবাদে মুগ্ধ ওই কবিরা কেবলমাত্র খ্যাতিলাভের জন্যেই বাংলাভাষাকে অবলম্বন করেছিলেন। ভাষার প্রতি তাঁদের কোনো অঙ্গীকার ছিলনা এবং তাঁদের ভাষাচর্চার একটি দৃষ্টান্তও আমরা দেখতে পাই না। জীবনপ্রবাহ থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ক্রমাগত মই বেয়ে উঁচু গম্বুজে উঠতে চেষ্টা করেছেন, ফলে, ভাষা—যা জীবনপ্রবাহের প্রতিটি ঢেউয়ের অভিঘাত গ্রহণ করে—তাঁদের আয়ত্তের বাইরেই রয়ে গেল। তাঁদের রচনা উদ্ধার করবার কোনো দায়িত্ব আমাদের নেই, প্রিয় পাঠক ইচ্ছে হ'লে যে কোনো 'বিখ্যাত, আধুনিক কবির বিজ্ঞাপনবিকীর্ণ কাব্যগ্রন্থের যে কোনো পাতা খুলে দেখতে পারেন। আমাদের প্রয়োজনবশত আমরা এখানে আরেকজন উত্তর-আধুনিক কবির রচনা তুলে আনছি :

মানুষের ঘরে গেছে মনুষ্য-কঙ্কাল

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নুপুরের ধ্বনি ফেলে রেখে মেয়েরা গেছে ধানক্ষেতে
ক্ষেতের ফাটলে খুঁজছে আগুন
মানুষকে সাজাবে আরও আগুনে

আনন্দ তো এই
মানুষকে সাজাবে আরও আমাদের মেয়েরা

হাড়ের বাজনাতে নেই মানুষের সংসার[২]

মানুষ ও মনুষ্য, একই সঙ্গে? আধুনিকতার ভূতগ্রস্তরা হয়ত' আতঙ্কে শিউরে উঠবেন, আমরা কিন্তু না—মেনে পারছি না কী বিপুল সাবলীলতায় কবি তাঁর ব্যবহৃত শব্দগুলিতে ভাষার পূর্ণাবয়ব দান করেছেন। আমাদের মনে পড়ে যায় আধুনিক কবিদের শব্দ সম্পর্কে বাতিকগ্রস্ততার কথা। কখনো archaic, কখনো ঝকৃঝকে চলতি শব্দ, কখনো পদাবলী কখনো বিলিতি—কত অন্বেষণই তাঁরা যে করেছেন। তাঁদের ধারনা ছিল ভাষার অবয়ব শব্দনির্ভর—এবং তাঁদের এই ধারনাটিও, বলাবাহুল্য, আদ্যন্ত ভুল। 'শবদে শবদে বিয়া' দেওয়ার রীতি যে আমলে চালু ছিল, মালার্মের দোহাই দিয়ে 'কবিতার উপজীব্য শব্দ—শব্দই কবিতার উপজীব্য' এ' বাণী প্রচার ক'রে আধুনিকের দল সেই আদল থেকে খুব বেশি দূরে নিজেদের নিয়ে যেতে পারেননি। উত্তর-আধুনিকরাই প্রথম সম্যকভাবে চেষ্টা করলেন কাব্যভাষার সম্পূর্ণ গ্রন্থনের মধ্যে শব্দকে রেখে শব্দের গুরুত্ব বুঝে নিতে।

এই কবিতাটি তাই উত্তর-আধুনিক শব্দ চেতনার দলিল হয়ে উঠেছে। নুপুরের ধ্বনি ফেলে রেখে যে মেয়েরা খেতের ফাটলে আগুন খুঁজতে গিয়েছে, যারা মানুষকে আরও সাজিয়ে দেবে—তাদের প্রতিজ্ঞা ব্যঞ্জনা এই কাব্যভাষার গ্রন্থনে যথাযথ শব্দসংস্থাপনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। শব্দসংস্থাপনের একটি বিশিষ্ট প্রক্রিয়ার ফলে নির্বাচিত শব্দগুলি তাদের অর্থসীমা প্রসারিত করে দিয়েছে। উপস্থিত শব্দগুলির মধ্যে প্রতিজ্ঞার সমবাচক কোনোটি নয়—মেয়েদের কর্মিষ্ঠ দৃঢ়তার কথাও অনুচ্চারিত তবু সবই যেন বলা হয়েছে। কাব্যভাষার যে অবয়ব শব্দকে অতিরিক্ত মাত্রা দিতে পারে,—এবং তার মাত্রাকে সম্পূর্ণ করতে পারে—তা' এই উত্তর আধুনিক বাংলা কবিতায়ই সম্ভব হ'য়ে উঠল।

৬.

ভাষা, আমরা জেনেছি, কোনো বিশেষ শ্রেণীর অধিকারগত হ'তে পারেনা—ভাষার কোনো শ্রেণীচরিত্র নেই। সাম্রাজ্যবাদীর ভাষা, পুঁজিবাদীর ভাষা ইত্যাদি সোনার পাথরবাটির মতো সত্য। ভাষা প্রকৃতপক্ষে সমগ্র মানবসমাজের, চির প্রগতিশীল একটি অভিজ্ঞান। ভাষার ইতিহাসে কখনো পিছিয়ে যাওয়া নেই। আবার, এ'কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে আলাদা আলাদা শ্রেণীর বিভিন্ন ও বিচিত্র প্রবণতা তাদের ভাষাব্যবহারে প্রতিফলিত হয়। শ্রেণীদ্বন্দ্বের আভাসও ভাষার আদলে ধরা পড়ে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যে কোনো উত্তর-আধুনিক কবির রচনাতেই এই দুটি ভাষাসূত্র অনুধাবনযোগ্য। একদিকে যেমন আধুনিক কবিতার অন্যতম ফলশ্রুতি, ভাষার অগ্রগমন—অন্যদিকে তেমনই তার কাব্যভাষায় ধরা পড়ে কবির সমাজের শ্রেণীগত জটিলতা। ভাষার বিভিন্ন শ্রেণীস্তর মিলিয়ে মিশিয়ে ভাষাকে একটি সংশ্লেষণমুখী প্রগতিচরিত্র দান করাও উত্তর-আধুনিক কবিতার বৈশিষ্ট্য। যেহেতু ভাষাব্যবহার আর্থনৈতিক অথবা পুঁজিগত স্বার্থসিদ্ধির বাহক হ'তে পারে না তাই এই সংশ্লেষণক্রিয়াটি স্বচ্ছন্দ ও স্ফূর্ত হয়ে ওঠে। সমাজলক্ষণ মান্য ক'রে বলা যায় যে উত্তর-আধুনিক বাঙালি কবিদের প্রায় সকলেই উঠে এসেছেন মধ্যবিত্ত অথবা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীস্তর থেকে : মধ্যস্বত্বভোগীদের বিচিত্র দোটানাভাব অথবা দোলাচলচিত্ততা তাদের ব্যবহৃত ভাষার প্রবণতায় কিছু অস্থিরতা কিছু অসংলগ্নতার প্রভাব দান করে। কবি এর সঙ্গে যুক্ত করেন তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাবকে :

শেষরাতে বাথরুম থেকে জলের শব্দ শোনা যায়। আরো বেশী লক্ষ্য করলে মিহি চুড়ির শব্দও শোনা যায়। পরে উগ্র চন্দনের গন্ধ ছবিটিকে নষ্ট করে দেয়। এ লোকটি ঘুমায় না। টেবিলের উপর বসে ভাবে তার সৌভাগ্যের কথা। বিনিময় প্রথার মধ্যেই সে বুঝেছিল নষ্ট সম্পর্ক ও মুদ্রার উজ্জ্বল আশ্বাস। কুয়াশায় তার নিজের ছায়াটিও আজ আর ততো পরিষ্কার নয়। সীল খুলে সে সাজিয়ে রাখে বিদেশী তাস। কে খেলবে তার সাথে। এইবার বইগুলিকে শেখাবো বীজ। সে ভাবে। আর ছড়ানো তাসের মধ্যেই তার মনে পড়ে ভয়ংকর ঐতিহ্য ও ততোধিক সৌভাগ্যের কথা[৩]।

প্রতিতুলনার প্রয়োজনে অন্য একটি দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যাক্ :

দেখা পাই না পাই স্মৃতিঠাকুরের সঙ্গে থাকি—
শুভ হাসি—বাতাসের শেষ নেই ;
যেদিকেই যাই, দারিদ্রের প্রণয়দুহিতার কপালে
ফুটে ওঠে দিক্-নির্ণয়ের দ্যুতি, আছি ভালো ;
দৃশ্যান্তরে কচ ও যযাতি একাকার।
তুমি মন সন্ততি, মাথায় তোমার ধান-দুর্বা,
গান করো,
বাকিটা জীবন যেন ঋষিবালকের দেশে কাটে[৪]।

দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীত ভাষা প্রবণতার আয়োজন, তবু আমরা লক্ষ্য না ক'রে পারিনা উভয় কবিই তাঁদের নিজস্ব ধরনে আশ্লিষ্ট জীবনপদ্ধতির প্রতি তাঁদের প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করছেন। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের 'আছি ভালো' ভাষাসংস্থানের প্রভাবে আর্তির যে সূচিমুখ দান করেছে, প্রথম দৃষ্টান্তের নামহীন লোকটি সম্পর্কে ব্যবহৃত 'ভাবে' ক্রিয়াপদের প্রতিক্রিয়া পাঠকের মনে একই ধরনের নিঃস্বতাবোধের সঞ্চার করে। 'আছি' এবং 'ভাবে' এই উভয়েরই প্রাক্কথনে যে প্রস্তুতি তা' পাঠককে বাধ্য করে ভাষাবয়বের পূর্ণ আয়তনটিকে চিনে নিতে। প্রথম দৃষ্টান্তে বিদ্রূপ উচ্চকিত, বেদনাবোধ প্রচ্ছন্ন, দ্বিতীয়টিতে ঠিক তার বিপরীত সংস্থাপন ঘ'টে যাওয়া সম্ভব হ'ল ভাষার পৃথক্ পৃথক্ মাত্রাকে, প্রয়োজন অনুসারে, অন্বয়ের সঙ্গে যুক্ত করার ফলে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রথমটির অন্বয়বিধান দৈনন্দিন উচ্চশিক্ষিত নাগরিক ব্যবহার অনুসারী, দ্বিতীয়টির বাক্য বা অঙ্গবাক্য একাধিক ক্ষেত্রে অনুরূপ নাগরিক পরিচয়ের চিহ্ন না রাখলেও ভাষা-পরিশীলনের ইঙ্গিতটি স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে। মনে রাখা দরকার, অপ্রত্যাশিত অন্বয়বিধান উত্তর-আধুনিক কবিতাকে প্রায়ই একটি বিশিষ্ট গতি দান করে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে এই বিশিষ্ট গতি অতিপ্রত্যক্ষ, প্রথম দৃষ্টান্তে যে বিশিষ্টতা নেই অথচ ভাষাব্যবহারে অনুরূপ গতিবেগ ধরা পড়ছে।

ভাষায় এই গতিবেগ—চল্‌তি কথায় যাকে মবিলিটি বলা যায়—ভাষান্তর সংশ্লেষণের একটি অন্যতম সুফল। মনে পড়ে যায়, এই মবিলিটি আয়ত্ত করবার জন্য আধুনিক কবিরা প্রায়শ শহুরে লুম্পেনের ব্যবহৃত ভাষা আমদানি করতেন। কৃত্তিবাস পত্রিকায় প্রকাশিত একটি কবিতায় (পরবর্তীকালে কবিতাটি সেই কবির শ্রেষ্ঠ কবিতার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে) সঙ্গম—শীৎকারের ব্যবহার দেখা গিয়েছিল। অপর একজন কবি মঞ্চে উঠে নব্বই সেকেণ্ড স্থায়ী একটি সিটি দিয়ে 'সিটি' নামক একটি কবিতা শুনিয়েছিলেন। খিস্তি ও সমাজবিরোধীদের ব্যবহৃত শব্দ তো তাঁরা পর্যাপ্ত ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এই ব্যবহার-রীতির যে অসারতা, ভাষার একটি বিচ্ছিন্ন বৈশিষ্ট্যকে অন্যত্র থেকে তুলে এনে কাব্যভাষার উপরে চাপিয়ে দিলে যে কিছু সুফল দেয়না—উত্তর আধুনিক কবিরা সে'কথা বুঝতে পেরেছেন। তাঁদের সংশ্লেষণ পদ্ধতি তাই আমদানিনীতি নির্ভর নয়। বরং মধ্যস্বত্বভোগীরা যে অতিরিক্ত সুবিধেটুকু পেয়ে থাকে—শিক্ষালাভ অনুশীলন ও পরিশীলনের সুবিধে—তার সদ্ব্যবহার আমরা দেখতে পাচ্ছি এই উত্তর-আধুনিক কবিতায়।

৭.

তবে এই অনুশীলন ও ভাষাবোধের সবটাই কলকাতা নগরের মনন অনুসারী, এমন কথা ভাবলে ভুল করা হবে। তথ্য হিসেবে এ'কথা মনে রাখা দরকার যে উত্তর-আধুনিক কবিদের একটি বিরাট অংশ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা হুগলী বর্ধমান পুরুলিয়া নদীয়া উত্তরবঙ্গ কৃষ্ণনগর বাঁকুড়া মেদিনীপুর ইত্যাদি অঞ্চলের সদর ও অন্দর থেকে ভাষাসম্পর্কে তাঁদের জন্মগত চেতনা নিয়ে কাজ ক'রে চলেছেন। কলকাতার বাইরে ছোট ছোট ক্ষীণায়ু যে সব লিটল ম্যাগাজিন অত্যন্ত অনিয়মিত-ভাবে প্রকাশিত হয়, উত্তর-আধুনিক কাব্যভাষা প্রকরণে তাদের অবদান—এক-কথায় বলতে গেলে, অবিস্মরণীয় হ'য়ে রইল। প্রসঙ্গত, পঞ্চাশে ষাটে সত্তরে, হয়ত এখনও এই মধ্য-আশিতেও, লিটল ম্যাগাজিনকে প্রতিষ্ঠানে আরোহণ করবার মই হিসেবে ব্যবহারের কুৎসিত ও বিপজ্জনক যে রীতি দেখা গিয়েছে, তার কলঙ্ক অনেকটাই মোচন করেছে এই ক্ষীণায়ু স্বল্পায়তন লিটল ম্যাগাজিনগুলি। তাদের মধ্যে দিয়েই, সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক শত্রুতা ও ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও, বাংলা সাহিত্য প্রবহমান এবং ভাষা বেগবতী।

এখানে, ঈষৎ আকস্মিক হ'লেও, একটি প্রশ্নকে তুলে আনা যায়। ভাষাবয়ব আকরণের একদিকে আমরা দেখছি লেখকদের সামাজিক অবস্থানগত (যার মধ্যে রয়েছে শ্রেণীগত ও অঞ্চলগত প্রভাব) ভাষা—অভিজ্ঞতা, অন্যদিকে ভাষার ঐতিহ্য

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
থেকে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়—প্রধানত লেখ্যভাষার ঐতিহ্যের অভিজ্ঞতা থেকে উত্তর আধুনিক কবিদের ক্ষেত্রে সেই অভিজ্ঞতার কী পরিচয় আমরা পাই? স্বভাবতই, প্রসঙ্গক্রমে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে যেহেতু বাংলাকাব্য-ভাষার ঐতিহ্যের বিপুলাংশ এঁদের দুজনেরই শ্রমে ও উদ্যোগে লাভ করেছি আমরা। ব্যক্তিগত সমীক্ষায় কিন্তু দেখা যাচ্ছে, উত্তর-আধুনিকদের কাছে মধুসূদন প্রায় অপঠিত—এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ স্বতন্ত্রভাবে সম্পূর্ণ পাঠ করেছেন অত্যল্প কয়েকজন। আদি ও মধ্যযুগের কবিতা নিয়ে কিছুটা উত্তেজনা দেখা গিয়েছিল সত্তর দশকের তরুণদের মধ্যে, বীতশোক ভট্টাচার্য 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'-এর সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। গত পাঁচবছরের সে' ধরনের ঐতিহ্যসন্ধান আমাদের চোখে পড়ে নি, অবশ্য দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে এমনও হ'তে পারে। ঐতিহ্য বলতে যদি তিরিশের দশকের রচনাবলী ধরা হয়, তা'হলে বিষ্ণু দে'র কাব্যপাঠ করার কিছু প্রতিক্রিয়া হয়ত উত্তর-আধুনিক ভাষাপ্রবণতায় ধরা পড়তে পারে।

এবং অবশ্যই, জীবনানন্দ। তাঁর মৃত্যুর তিনদশক পরে জীবনানন্দ দাশ বাস্তবিক হ'য়ে উঠলেন একটি নতুন প্রজন্মের উপযুক্ত কাব্যভাষার দীক্ষাদাতা। তাঁর কাব্যভাষার আকরণ আজ অবিসংবাদী ছায়া ফেলেছে উত্তরআধুনিক কবিতায়। নিজের যুগকে যতখানি অতিক্রম ক'রে গিয়েছিলেন জীবনানন্দ, ঠিক ততখানিই ভুল বোঝা হয়েছিল তাঁকে। আধুনিক কালে তাঁকে 'নির্জনতম কবি' ইত্যাদি অর্থহীন ও উদ্‌ভ্রান্তিজনক শিরোপা দান ক'রে, তাঁর কাব্যভাষার অপব্যবহার করা হয়েছিল। এ' ক্ষেত্রেও সেই একই ভুল ঘটে যায়, তাঁর ব্যবহৃত কিছু শব্দ চলনসই-ভাবে নিজেদের কবিতায় টেনে এনে আধুনিক কবিরা জীবনানন্দীয় হ'য়ে উঠতে লাগলেন। অন্যদিকে 'বনলতা সেন' পর্যায়ের কিছুটা দুর্বল (জীবনানন্দের গড়ে ওঠার পর্যায়ের রচনা, যা বুদ্ধদেব বসুকে আপ্লুত করেছিল। জীবনানন্দের কাব্যভাষা সত্যিসত্যিই যখন গড়ে উঠল, 'সাতটি তারার তিমির' ছাড়িয়ে 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় যখন মহৎ উত্তরণ ঘটল তাঁর, তখন কিন্তু বুদ্ধদেব বসু তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এই ঐতিহাসিক তথ্যটি মনে রাখা দরকার যেহেতু আধুনিকতার শেষদশায় রচিত বাংলা কবিতা—অর্থাৎ পঞ্চাশ-ষাট-অদ্যাবধিও কিছুটা—বিশেষ প্রেরণা অর্জন করেছিল বদ্ধদেব বসুর প্রচারিত সাহিত্যাদর্শ ও তাঁর অনবদ্য অনুবাদ-কর্মগুলি থেকে) অন্বয় অনুকরণ ক'রে, তরলীকরণ ক'রে, এক ধরনের সুখপাঠ্য আধুনিক রোম্যাণ্টিক কবিতা তৈরি হ'তে লাগল। লক্ষণীয়, পরবর্তীকালে প্রাগুক্ত আধুনিকেরা যখন সংবাদপত্র-প্রতিষ্ঠানের ছায়ায় পাখা মেলতে লাগলেন, কেবল জীবনানন্দের কাব্যভাষা নয়—বাংলাভাষার সম্পূর্ণ গ্রন্থনের মধ্যেই তাঁরা ঘুণ ধরিয়ে দিতে সক্ষম হলেন। তাঁদেরই বিক্রমে রচিত সর্বনাশের মধ্যে দিয়ে বাংলাভাষাকে আজ এগিয়ে যেতে হচ্ছে: উত্তর আধুনিক কাব্যভাষা আধুনিকদের সেই সব অপব্যবহারের একটি প্রতিবাদ, উত্তর-আধুনিক কাব্যভাষা সেই সর্বনাশ থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি প্রতিশ্রুতি।

জীবনানন্দের কাব্যভাষার সাবলীলতা এবং ব্যঞ্জনাধর্মিতা মাঝে মাঝে তীব্র

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
বিদ্রূপভঙ্গিতে তাঁর অন্বয়কে অগ্নিগর্ভ ক'রে তোলা উত্তর-আধুনিকদের চিত্ত জয় ক'রে নিল। এ'ছাড়া, বিষ্ণু দে'কে পেরিয়ে পঞ্চাশের ভাষানিপুণ ত্রয়ীর—শঙ্খ অলোকরঞ্জন উৎপলের—পর্যাপ্ত স্বীকৃতিও প্রতিফলিত হ'ল তাঁদের কাব্যভাষায়। মনে রাখা দরকার, পঞ্চাশের যেটুকু সুপ্রভাব উত্তর-আধুনিক কাব্যভাষায় এসে পৌঁছেছে তার আড়ালে রয়েছে শঙ্খ ঘোষ বা অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত অথবা উৎপল-কুমার বসুর বাংলা কাব্যভাষা সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও মর্যাদাবোধ। আধুনিকরা আধুনিক খ্যাতিলাভের জন্য যখন ভাষাকে ব্যবহার করেছেন, অমর্যাদার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন ব'লেই, তখন ঘটেছে বিপত্তি।

অন্যদিকে, একটি প্রশ্ন অনিবার্য হয়ে ওঠে। উত্তর আধুনিক কাব্যভাষার গ্রন্থনে প্রায়শই যে একটি নিরাভরণ প্রসাধনবিহীন নির্মাণরীতি চোখে পড়ে, তার উৎস তো জীবনানন্দ অথবা বিষ্ণু দে'র, অথবা শঙ্খ-অলোকরঞ্জন-উৎপলের অতিপরিশীলিত নিপুণ ও আত্মসচেতনভাবে শিক্ষিত শৈলী নয়। তা'হ'লে তার উৎস কোথায় খুঁজব আমরা?

৮.

এখানেই আরেকবার রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ, অপঠিত হ'লেও, যে ব্যক্তিত্বের অধিকারী—সে ব্যক্তিত্বের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া খুব সহজ নয়। উত্তর আধুনিক কবিরা যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে না-ই পড়ুন রবীন্দ্রনাথের রচনা, রবীন্দ্রগানের প্রভাব তাঁরা এড়াবেন কি ক'রে?

এই রবীন্দ্রগান, আমরা জানি, সমস্ত লৌকিক ও সহজিয়া আউল-বাউল-চারণ-কবিদের ভাষাশৈলীর ঐতিহ্য মন্থন ক'রে একটি বিস্ময়করভাবে অনাড়ম্বর অথচ মর্মস্পর্শী ভাষাশৈলী আমাদের দান করেছে। এই অনাড়ম্বর মর্মস্পর্শিতা উত্তর আধুনিকদের কাব্যভাষার অন্যতম লক্ষণ, তাই রবীন্দ্রগান তাঁদের কাছে একটি নিশ্চিত দিক্‌নির্দেশক। কথাটা বোধহয় অন্যভাবেও বলা যায়। ধাঁধা জাতীয় কবিতা রচনায় পারদর্শী আধুনিকদের কাব্যভাষাজনিত ক্লান্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে—হয়ত' নিজেদেরও অজ্ঞাতে উত্তর আধুনিক কবিরা রবীন্দ্রগানের ইন্দ্রজালের কাছে নিজেদের চরিত্রকে অনেকটাই সমর্পণ করেছেন:

একটি পোকার মৃত্যু দেবীর আঁচলে
এই দৃশ্য মানুষকে পীড়া দেয় আজো
অনেক বর্ষা কভু নামলে সঘনে
বেরিয়ে আসে বৃষ্টিভরা বৃষ্টির প্রভু[৫]

৯.

তা' হ'লে উত্তর-আধুনিক কাব্যভাষার উৎসে আমরা এই পরিকল্পনাটির সন্ধান পেতে পারি:

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নিজেদের
সামাজিক অবস্থান

আধুনিকতার শেষ পর্যায়
(আধুনিকদের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষালাভ) (কয়েকজন আধুনিকের পরিশীলন থেকে অভিজ্ঞতালাভ)

বিষ্ণু দে সঞ্জয় ভট্টাচার্য
(সমাজ বিশ্লেষণের ভাষাশৈলী)

রবীন্দ্রনাথ
(অলংকার ও বাহুল্যবর্জন)

জীবনানন্দ
(বাংলা কাব্যভাষার শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য ও নিজস্ব রীতির সমন্বয়)

আরো একটি তথ্য হয়ত' প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে। অতিসম্প্রতি কোনো কোনো তরুণ কবি আঞ্চলিক উপভাষার কবিতা নির্মাণ করছেন। তবে এই রীতি এখন পর্যন্ত ব্যক্তিগত, সামগ্রিকভাবে উত্তর আধুনিক কাব্যভাষার প্রকরণে এই রীতির প্রভাব আমরা এখনো বিশেষ লক্ষ করিনি। তবু পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আঞ্চলিক উপভাষায় রচিত একটি উত্তর-আধুনিক কবিতার দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'ল :

এমন ধান বহুদ্দিন হয় নাই হেই
এমন ধান
এমন ঘাসফুল্যা ঝুমোর্‌্যের পারা ঝুলুর
এমন পুষা খুঁখ্‌ড়ার পারা আসন লয়া
দিনকাল বদ্‌লিছে হেই ইব্‌রে
দিনকাল ভাল হছ্যে ব

বহুদ্দিন এমন ধান হয় নাই মাইরে
দেখ খামার পইলাতে পইলাতে
রঙটাই পাল্ট্যে যাছে নুনার মায়ের
বহুদিন লাল শাড়ি পরে নাই নুনার মা

বহুদ্দিন এমন ধান হয় নাই ব
বহুদ্দিন নুনী আসে নাই ঘরকে[৬]

১০.

আঞ্চলিক উপ ভাষার কবিতা যথেষ্ট পরিমাণে রচিত না হলেও আঞ্চলিকতার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আদল কিন্তু মাঝেমাঝেই ধরা পড়ছে উত্তর-আধুনিক কাব্যভাষার আয়তনে। যেমন :

> ১৯৮৪ সালের বৃষ্টিকে বৃষ্টি বলা যায় না। সমস্ত বোবা কুকুর
> সাঁতরে আসে স্তব্ধ রসাতল। কোনও স্টেশন নেই। ডাকবাক্সের
> কাছে জলের ভূতে পাওয়া চিঠি হাতে স্টেশনগার্ড।
> কেউ বলেছে দেবতার
> আক্রোশ। কেউ বাজপড়া শূন্যমাঠে বিদ্যুতের সাপ শিহরিত,
> তারাচুমকি, অন্ধকার। আসলে পরচুলার ভিতর দেখা যায়
> অপার ঘোলা জল, নষ্ট চাষীর ছায়া, আর ও পীত ফলিডল[৭]

এই কবিতাটিকে আমরা বাংলা কাব্যভাষার সাম্প্রতিক সংশ্লেষণ প্রবণতার একটি বিশিষ্ট উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করছি। মেদিনীপুরের আঞ্চলিক 'তারাচুমকি' তার ঠিক পূর্ববর্তী ছত্রের অতিজটিল, সুশিক্ষিত ভাষাবিন্যাসের সঙ্গে যেভাবে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করছে তা' পাঠককে স্তম্ভিত করে। কবিতাটিতে বৃষ্টির প্রায় কোনো বর্ণনা নেই, ভাষাকে এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যে বৃষ্টির অব্যবহিত প্রতিক্রিয়া ও মানবিক অভিজ্ঞতাগুলি ভাষাগত ব্যঞ্জনার মধ্যে দিয়ে নির্ভুলভাবে ধরা দিচ্ছে পাঠকের চেতনায়। এই কবিতার ভাষা কোথাও অলংকার পরেনি, অথচ ভাষার সমগ্র আয়তনটি অলংকারময় হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রগানের উত্তরাধিকার ছাড়াও, ভাষার এই সহজ সৌষ্ঠবে রয়েছে সজীব আঞ্চলিক রীতির গোপন টান যাকে কবি মিলিয়ে দিয়েছেন হয়ত' কলেজ স্ট্রীটের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীত ভাষাবোধের সঙ্গে।

তবে যদি আমরা মনে করি, ভাষার এই সজীবতা, স্বতঃস্ফূর্ততা কেবলমাত্র আঞ্চলিক উৎসনির্ভর, তা'হ'লে সে' ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য অন্য একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ প্রয়োজন :

> ধুলিয়ানের কাছে এসে ভেঙে গেছে গঙ্গা
> ধীবর পরিবারের দুজন
> একজন ভাঙা পাড়ের ওপর বসে
> ডিঙিতে অন্যজন
> কথাবার্তা বলছিল
> মহাজনী নৌকা থেকে একটা কাঠ পড়ল জলে
>
> পড়ে ভাসতে লাগল
> কাঠকে কুমির ভেবে ডাঙার লোকটা
> দু'পা পিছিয়ে গেল
> বলল ডিঙির লোকটা
> কাঠটাই কুমির[৮]

বর্তমান নিবন্ধে ব্যবহৃত দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে এই কবিতাটি রচনাকাল অনুযায়ী, পয়লা নম্বর। পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তের সঙ্গে এই দৃষ্টান্তটির রচনাকালের ব্যবধান ঠিক

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দশবছর। আজ, দশবছর পরে, আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, 'কাঠটাই কুমির' লিখে কবি কি বুঝতে পেরেছিলেন বাংলা কাব্যভাষার একটি যুগাবসান হ'ল (আলোচ্য কবির ভাষাবোধের বিবর্তন সম্পর্কে কৌতূহলী হ'লে পাঠক এ'বছরের শারদীয় লাল নক্ষত্র দেখে নিতে পারেন), কোনো একদিন মেদিনীপুরের কোনো প্রত্যন্ত থেকে এক কবি দশবছর আগের সেই ঐতিহাসিক ভাষাপরীক্ষার প্রযুক্তি আবার প্রমাণ করবেন, হয়ত' বা আঞ্চলিকতার একটি নতুন মাত্রা যোগ ক'রে যা উদ্দিষ্ট প্রমাণকে দৃঢ়তর ভিত্তির প্রতিষ্ঠা দেবে। আমরা কেবল অনুমান করতে পারি, ১৯৭৪ সনে কবির ভষাসংস্থানে দৈনন্দিন কথ্যভাষার স্বাভাবিক প্রবাহ যুক্ত করাটাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য ; একটি বর্ণনা, উপমা—অনুপ্রাণহীন অতিচলিত গদ্যের স্পন্দন এবং অকস্মাৎ একটি অভিজ্ঞতার রূপায়ণ, এর মধ্যে দিয়ে দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি যে ভাষাবয়ব গঠন করেছে, প্রথম দৃষ্টান্তের ভাষাবয়ব তার সঙ্গে—ভাষার অভিঘাতে এবং অনিবার্য ফলশ্রুতিতে—তুলনীয়, এবং এই তুলনার মধ্যে দিয়ে উত্তর-আধুনিক কাব্যভাষার যে প্রামাণ্য শৈলী আমরা পেলাম এই নিবন্ধের অধিকতর বাগ্‌বিস্তারেও বোধহয় তাকে লাভ করিনি।

তবু আরো একটি দৃষ্টান্ত অনিবার্য হয়ে উঠেছে :

চিহ্নিত হবার ভয়ে
বন্ধুর ছেলের মুখ দেখা হয়নি আজো
ঘাসে, রৌদ্রে বই খুলতে গিয়ে থেমে গেছি
তাকাতে পারিনি চোখে, ফেরাতে পারিনি
শাদা চোখ
অন্যমানুষের হাঁটা নকল করেছি[৯]

১১.

অনিবার্য, কেননা পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তগুলি যে ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে তার অপর এক ফলশ্রুতি খুঁজে পাওয়া যায় এ'রকম কবিতায়। কথ্যভাষা, তা' কলকাতারই হোক্ কিংবা মেদিনীপুরের, আলাপচারিতার সামান্য ভঙ্গির আড়ালে প্রচ্ছন্ন রাখছে এই—যে গূঢ়ভাষা, যেখানে ভাষা হ'য়ে ওঠে ভাষাসংকেত, বাক্ যেখানে চিন্তার জন্মদান করে—এবং তারই ফলে একটি নির্দিষ্ট অবয়বের মধ্যে রূপায়িত হওয়ার পরেও ভাষা স্পন্দিত হতে থাকে, ভাষা ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'য়ে যায় অনুচ্চারিত অকথিত এবং অনিবার্য ভাষা ব্যবহারের দিকে : (৭৫ পৃ. দেখুন)

ভাষাগত অবস্থানের যে পর্যায়ে গত দশ বছরের বিভিন্ন, বহু বিচিত্র, বহু সংশ্লেষণের ঘাত ও প্রতিঘাতের রূপায়ণ রয়েছে তার সাম্প্রতিক একটি বিবরণের প্রয়াস করা হ'ল এই নিবন্ধে। এই বিবরণ ধারাবাহিক, ইতিহাসের সপ্রাণ চঞ্চলতার সঙ্গে নিজেকে অক্লান্তভাবে মিলিয়ে নেওয়ার বিবরণ হয়ে উঠবে একদিন। রূপ থেকে রূপান্তরের দিকে। অপূর্বতর কোনো রূপের দিকে মানুষের যে মহাযাত্রা—আমাদের উত্তর-আধুনিক কাব্যভাষা তারই তো একটি অভিজ্ঞান। এই হতশ্রী সমাজে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মানুষের সংস্কৃতি ও শিল্পচেতনা যখন প্রভুদের বিশাল ছায়ার নিচে ধ্বস্ত হ'য়ে

কাঠটাই কুমির ১৯৭৪

কেউ……বিদ্যুতের সাপ শিহরিত ১৯৮৪

উত্তর আধুনিক কাব্যভাষার সাম্প্রতিক অবস্থান

নদীতে জল নেই, আগুন ১৯৮১

হাড়ের বাজনাতে নেই মানুষের সংসার ১৯৮২

পড়ে আছে, তখনও যে সব অখ্যাত অপরিচিত তরুণ কবিরা বাংলাভাষার কাছে প্রণয়ে ও প্রতিজ্ঞায় নিজেদের আবদ্ধ ক'রে রেখেছেন, তাঁদের উদ্দেশে আমাদের এই নিবন্ধপ্রয়াস নিবেদিত হ'ল ॥

উৎস নির্দেশ :

কয়েকজন প্রধান উত্তর আধুনিক কবির কবিতা এই রচনায় ব্যবহৃত হ'ল। প্রতিটি কবিতাই সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হয়েছে। যাঁদের রচনার দৃষ্টান্ত বর্তমান নিবন্ধে দেওয়া গেল না, পরবর্তী কোনো প্রবন্ধে তাঁদের সম্পর্কে দায়িত্ব আমরা স্বীকার করছি। এ' কথাও স্বীকার করা ভালো, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে উত্তর-আধুনিক কবিতার যে বিপুল আন্দোলন চলেছে, মাত্র ন'টি কবিতা দিয়ে তার স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করা কিছুটা হঠকারিতা।

১। ষোড়শ কবিতা। গৌতম বসু। অন্নপূর্ণা ও শুভকাল। ১৯৮১
২। ডাক। নির্মল হালদার। পুরোনো এ জীবন আমাদের নয়। ১৯৮২

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৩। সৌভাগ্য। গৌতম সেনগুপ্ত। শেষ রাতের ছবি। ১৯৮০
৪। সন্ততি অপার্থিব। অশোক দত্ত। উপসংহার। ১৯৮৬
৫। রবীন্দ্রনাথকে। অপাবৃতা লাহিড়ী। হারানো মণি। ১৯৮৫
৬। দিনকাল বদ্‌লিছে হেই। দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। গাঁয়ের নাম পরব। ১৯৮৫
৭। ১৯৮৪ সাল। অনুরাধা মহাপাত্র। কলকাতা দু'হাজার। ১৯৮৫
৮। আলাপ। অঞ্জন সেন। কথাবার্তা। ১৯৭৪
৯। শাদা চোখ। অনির্বাণ লাহিড়ী। এবং আমরা। ১৯৮৪

৪, ৭ ও ৯ কবিতা তিনটি সাময়িক পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। অন্য কবিতাগুলির উল্লেখকালে কাব্যগ্রন্থের নাম দেওয়া হ'ল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উদয় নারায়ণ সিংহ

কবিতার ভাষাতত্ত্ব এবং আজকের বাংলা কবিতা

॥ ১ ॥ ভূমিকা

এ বিষয়ে বাংলা কবিতার পাঠকেরা সকলেই একমত যে আজকের অনেক বাংলা কবিতাই 'আরোপিত লালিত্যময়তা' (দ্র. অঞ্জন সেন, ১৯৮২ : ১১-১২)। একথা যে বাংলা কাব্যজগতেই অনুভূত হয়েছে (প্রমথ চৌধুরীর 'আধ আধ ভাষ' কিংবা 'গদগদ ভাষ' থেকে বাংলা সাহিত্যের মুক্তি প্রার্থনার সময় থেকেই), অন্যত্র হয়নি তা নয়। কাব্যভাষার সঙ্গে ললিত অনুভূতির ভাষাকে গুলিয়ে ফেলার বিপদ সম্পর্কে রোমান য়াকোবসন আমাদের কয়েক দশক আগেই সাবধান করে দিয়েছেন। এসব কথা থেকে এই একটা সিদ্ধান্ত পরবর্তী আলোচকদের কাছে স্বচ্ছ হয়ে যায় যে কাব্যশৈলী ও ললিতশৈলী ভাষার বহুশৈলিক রূপের দুটি দিক মাত্র এবং এই দুই শৈলীর মধ্যেকার সম্পর্ক আর যাই হোক, এরা অনোন্যসম্বন্ধের বাঁধনে আবদ্ধ নয়।

এসব কথার পিছনে দুটো বিশ্বাস আছে লুকিয়ে। প্রথম, ললিতশৈলী আদৌ নিছক ন্যাকামোর শৈলী নয় (এখানে অঞ্জন সেনের বক্তব্যের সঙ্গে ভাষা-'বৈজ্ঞানিক' রূপে আমার চিন্তাধারা মিলছে না)। ভাষার প্রতিটি শৈলীই নিজস্ব প্রয়োজনে উদ্ভুত। ভাষাকে ব্যবহার করে মানুষ যে নানান ধরনের সংপ্রেষণ করে বা ভাবপ্রকাশ করে, 'ন্যাকামো' তার মধ্যে একটা। কোনো কোনো পর্যায়ে ন্যাকা ললিতশৈলীর আশ্রয় নেয় বটে, কিন্তু তার তূণীরে তীর বলতে এই একটাই তা নয়। প্রতিটি সংপ্রেষণই (Communicative act) একাধিক ভাষিক শৈলীর স্ট্র্যাটেজি ব্যবহার করে। আবার প্রতিটি ভাষিক শৈলীই এক একটা স্কেলের মতো অবধারণ, কারণ শৈলীমাত্রেরই তীব্রতা, উপযোগ, ব্যবহার, উদ্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া —এই ব্যাপারগুলো কম বা বেশী হতে পারে। ছবিটাকে আরো জটিল বলে মনে করার কারণ আছে, কারণ আকরণবাদ বা স্ট্রাকচারালিজম বলবে যে ভাষার অন্যান্য উপাদানের মতো ভাষার শৈলীগুলির সংজ্ঞাও পারস্পরিক সম্বন্ধের ওপর নির্ভরশীল। শৈলীগুলিকে এইভাবে রিলেশনাল অবধারণের পর্যায়ে ফেললে তাদের আকরণের ভূগোলও হবে অন্যরকমের। অর্থাৎ, দুটি শৈলীর মধ্যেকার সীমারেখাঙ্কন করা নিশ্চিতরূপেই কঠিন কাজ কারণ নির্দিষ্ট কোনো রেখাই নেই। এমন কথা বলা যাবে না যে এইখানে এই শব্দগ্রন্থনে এই বাক্য ব্যবহারে বা ধ্বনিগ্রন্থনে বা চিত্রচয়নে অমুক শৈলী শেষ হলো ও এরপর থেকে তমুক শৈলী আরম্ভ হলো। ভাষাশৈলীর সংজ্ঞা ও ব্যবহারের এই সমস্যাবলীর কথা মাথায়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

থাকলে একথা বলা কঠিন যে ললিতশৈলীর চরিত্র 'সানুনাসিক' কিংবা তার ব্যবহার ন্যাকামোর দ্যোতক।

দ্বিতীয় বিশ্বাস হলো, কাব্যভাষার সঙ্গে যে রহস্যময়তা যে গুণ্ঠন জড়িয়ে আছে বলে মনে করা হয়ে থাকে, সেগুলিকে উপেক্ষা করে কবির সৃষ্টির সঙ্গে সৃষ্টির ও সৌন্দর্যের পূজারী পাঠক ঠাকুরের সরাসরি যোগাযোগ, গুণে-বুঝে নেয়া কিংবা রসে আপ্লাবন সম্ভব। কবি অবশ্য রহস্য করতে ভালোবাসেন, আলোচককে নিষ্ঠুর আঘাত করে আনন্দ পান এবং কবিতার বাইরের জীবনের ছন্দবদল করে নিয়ম-কানুন ভেঙে এই উপ্তগুপ্ত রহস্যকে জিইয়ে রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু বিভিন্ন আলোচকের ব্যাখ্যা আজ অবগুণ্ঠনের আড়াল থেকে বের করে এনেছে কবিতার শরীরমনকে। কবিতার হৃদয়বান ও বুদ্ধিমান পাঠক কবিতা উপভোগ যেভাবে যে কারণে যে সীমার মধ্যে করেন সে বিষয়ে তাঁরা আমাদের নতুন কথা তো বলেইছেন, কবির মানসিকতা এবং কবিতা-নামক পাঠের (কৃতি বা text) ধ্বনিরূপবাক্যার্থ ইত্যাদি উপাদানের পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। আলোচককে ছুঁলেই ঈশ্বরের জাত যাবে, কবিকে করতে হবে গুবরে প্রায়শ্চিত্তির এমন মধ্যযুগীয় ধারণা আজকের কবির বা কবিতার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয়। অর্থাৎ কিনা, কবিতার ভাষাতত্ত্ব সম্ভব ও জরুরী।

কবিতা ভোগের সাধন, মানুষের তৈরি মানুষেরই ভোজ্য সম্পত্তি, এমন একটা গুজব আছে। সোজা বাংলায়, কবিতা উপভোগের উপাদান। ভালো কথা, বলছেন হিল (দ্রঃ A.A. Hill, 1967), কিন্তু উপভোগই যদি কাব্যের উৎকর্ষের মানদণ্ড হয় তো কথা হলো, কার উপভোগের সাধন কবিতা? মানুষতো অদ্যজগতে শতধাপ্রায়। তদুপরি একই মানুষ একাদিক্রমে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সদস্য। এজন্য আজকের কবিরা ভিন্ন ভিন্ন পাঠকগোষ্ঠী পাঠকশ্রেণী পাঠকজাতি এমনকি পাঠক-ধর্মের উদ্দেশে কবিতায় সংপ্রেষণ করছেন। শুনতে খারাপ লাগলেও এটা সত্যি, আর সত্যি বলেই এপিক জাতীয় কবিতা বা কাব্যসৃষ্টির জন্ম এখন অসম্ভবপ্রায়। এরই মধ্যে কোনো কবি বা কিছু কবি যে পাঠকভেদের গোষ্ঠীশ্রেণী জাতিধর্ম বা ভাষাভেদের ওপরে উঠছেন না বা উঠতে পারছেন না তা নয়। তবু উপভোগের কথা উঠলেই 'কার উপভোগ'—এই ধরনের প্রশ্ন উঠতেই পারে। সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তনের ফলে দুটো ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

প্রথম, সেইসব কাব্য সমালোচক যাঁরা ভাষাতত্ত্বের নাম শুনলেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো জ্যামুক্ত ছিৎকার জুড়ে দেন, অর্থাৎ কিনা যাঁদের থলে মাত্র গুণবাচক বিশেষণে ভরা, তাঁদের পক্ষে কবিতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমালোচনা দিনকেদিন দুরূহ হয়ে উঠছে। অমুকের কবিতা শক্তিমান (বা-মতী-নির্ভর করছে পুরুষালী না মেয়েলী তার ওপর) কারণ তার আবেদন সর্বব্যাপী, এই ধরনের কথা বলতে পারাই হয়েছে কঠিন ব্যাপার। অথচ, পাঠক বুঝতে পারছে যে জনপ্রিয়তা বা সর্বাবেদনের বাইরেও বহু কবিতাই সার্থক কবিতা। অতএব, যে বা যারা সমালোচনা করতে বসে জাজিয়তি আরম্ভ করেন, তাঁরা কবি ও পাঠকের যোগাযোগের অন্তরায়, অতএব কবির নিষ্ঠুর মন্তব্যের যোগ্য, অতএব সর্বথা পরিত্যাজ্য।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দ্বিতীয়, গোষ্ঠী, শ্রেণী, জাতি ও ধর্মের বেড়া পার হয়ে কাব্যভাষায় কথা বলা কবির একার দায়িত্ব নয়। পাঠকবর্গকেও কবিতার খাতিরে বেড়া টপকে অন্য গোষ্ঠীর শ্রেণীর জাতের ধর্মের বা ভাষার কবিকে তার পরিবেশ, পরিস্থিতি, মানসিকতা ও ইডিয়মকে বোঝার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। ছন্দ, লালিত্য—এসবই কবিরা অনেক ক্ষেত্রেই চামচ হিসেবে ব্যবহার করে এসেছেন। কাব্যভোগের জন্য আজও যদি পাঠক নির্ভর করেন এসবের ওপর, কিংবা যদি মনে করেন সংপ্রেষণের দায়িত্ব, নিজেকে বোঝাবার দায়িত্ব শুধুই কবির তো আজকের কবিতা 'উপভোগ' করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কবিকে, কবিতাকে বোঝার জন্য চেষ্টা পাঠককে করতেই হবে। যদিও "true, we shall never reach complete understanding of anything in the world of nature and of man. If we should say it is therefore useless to strive for knowledge, we would then abdicate our heritage. Or should we say that poetry belongs in a world which transcends intelligence, and so is something which we can not know, we are confusing the world of man—since poets are men—with the world beyond the world of men, which indeed we can not know"(Hill, 1967).

কবিতার ভাষাতত্ত্বের সঙ্গে কবিতার উপভোগের কোনো বিরোধ নেই। বরং আমার বক্তব্য হলো, কবিকে ও কবিতাকে বুঝতে গেলে কবিতার ভাষাতাত্ত্বিক ও সমাজভাষাতাত্ত্বিক অধ্যয়ন একান্ত আবশ্যক।

ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ভাষার বিখ্যাত ছাত্রেরা আমাদের সামনে রেখেছেন, কবিতার সীরিয়াস অধ্যয়ন করতে গেলে তার কয়েকটার গুরুত্ব ও সীমা আমাদের বুঝে নেয়া দরকার। ভাষার তত্ত্বনির্মিতি নিয়ে এখানে কিছুই বলবো না, কারণ তাহলে কথা ফুরবেনা। উৎসুক পাঠক যে যেখানে আছেন প্রবাল দাশগুপ্ত, পবিত্র সরকার, হুমায়ুণ আজাদ কিংবা আমার নানান লেখা হয় পড়েছেন নয় পড়ে নেবেন। এর মধ্যে বেশ কিছু লেখা জিজ্ঞাসা, ভাষা, ভাষাবিজ্ঞান পত্রিকা, নিসর্গ, বারোমাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্য পত্রিকা, পাহাড়তলী এবং গাঙ্গেয় পত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথমেই ধরা যাক Stimulus-Response theoryর কথা। বাক্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে SR থিওরীর ভূমিকার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো—সৃষ্টির (কাব্য, বাক্য, শিল্প) ভিতে এমন ছবির যাথার্থ কতোটা। ১৮৪০ থেকেই গণিতজ্ঞরা sensation নিয়ে যেসব কাজ করেছেন, তার মূলে একটাই সাধারণ জ্ঞান কাজ করছিল—প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের senses যে কাজ করে তার পিছনে একটা না একটা stimulus আছে। এই stimulus হতে পারে নানান মাপের বা পরিমাণের এবং দর্শন, শ্রবণ, বহন প্রভৃতি sense এর মূলে যে আলো, ধ্বনি ও ভার বা ওজন প্রভৃতি stimuli রয়েছে তার তারতম্যে responseএরও পরিবর্তন হতে পারে।

জর্মন বৈজ্ঞানিকেরা বিশেষ করে ওয়েবর ও রাইখ্‌টার এই পরিবর্তনকে এক বা একাধিক সূত্রে ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। প্রথমেই তাঁরা দেখেন যে প্রতিক্রিয়া,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
তা যতো অল্প পরিমাণই হোক না কেন, যে কোনো ক্ষেত্রে তখনি হয়, যখন stimulusএর একটা নির্দিষ্ট ন্যূন পরিমাণ উপস্থিত আছে। এই প্রতিক্রিয়া ব্যাপারটা যেহেতু মানসিক, তা ভৌতিক বা পদার্থবৈজ্ঞানিক উত্তেজনার সঙ্গে এমনভাবে বাঁধা নয় যে সামান্যতম উত্তেজনাও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। না, প্রতিক্রিয়ায় ধরা পড়তে গেলে আলো, ধ্বনি বা ওজন প্রভৃতির একটা নির্দিষ্ট ন্যূন পরিমাণ, যেটাকে ওঁরা বলেছেন threshold level—তা থাকতেই হবে।

দ্বিতীয়ত, নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষণের (controlled experiments) সাহায্যে তাঁরা দেখিয়েছেন যে একটা নির্দিষ্ট মাপের stimulus থেকে যে পরিমাণ প্রতিক্রিয়া হবে, তার সামান্য হেরফের করলেই যে প্রতিক্রিয়ায় বিরাট পার্থক্য দেখা দেবে তা নয়। এই হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করে stimulus-এ কতোটা পরিমাণ পরিবর্তন ঘটেছে।

তৃতীয়ত, S ও R-এর মধ্যেকার সম্বন্ধ logarithmic, কারণ stimulus বাড়ে জ্যামিতিক প্রগতির নিয়ম অনুসারে (অর্থাৎ 'গুণ'-এ) এবং response বাড়ে তার চেয়ে অনেক কম হারে ('যোগ'-এ), পাটীগাণিতিক নিয়মে। এইসব কারণে উত্তেজনা ও প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধ খুবই জটিল।

বাক্য, শিল্প বা কবিতার সৃষ্টিতে এগুলির ভূমিকা কম নয়। তবে সৃষ্টির বৈচিত্র্য নির্ভর করবে, এই তত্ত্ব অনুসারে, মূল stimulusএর পরিমাণের পরিবর্তনের ওপর। অর্থাৎ কি না, কাব্যরচনার বেলায় এই তত্ত্ব আমাদের বিশ্বাস করতে বাধ্য করবে যে যতদিন/যতক্ষণ না ভাবনা বাসনা, ইচ্ছা, অভিজ্ঞতা ও চিন্তা-পথে পরিবর্তন বা বিচিত্রতা multiplicatively আসে ততদিন/ততক্ষণ শিল্প বা সৃষ্টিতে অভিনবত্ব আসবে না। অবশ্য, বাক্য বা তুলির আঁচড় বা সরগম এগুলো হলো কবিতা, ছবি ও গানের চেয়ে নিচের স্তরের উপাদান। তবু নিয়মটা এখানেও একই থাকবে, শুধু তার এই magnified রূপটা থাকবে অনুপস্থিত।

A. A. Hill এর কাব্যচিন্তা কতকটা এইরকম : কবিতার ভাষায় সাধারণ ভাষার চেয়েও কিছু বেশী কথা বলা যায়, সামান্য ভাষার অবোধ্য কিছু ভাবপ্রকাশ কাব্যভাষায় করা হয়। অতএব কবিতার ছাত্র যদি অর্থতত্ত্বের নাভিমূলে প্রবেশ না করে তো সে সময়ের অপচয়ই করছে। তাঁর ও G. L. Tragerএর মতে ভাষার ব্যাকরণের স্তরগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা সম্ভব—Prelinguistic, Microlinguistc ও Metalinguistic। ভাষার নিম্নতম স্তরে আছে ধ্বনি ও রেখা—যা এই prelinguistic স্তরের মূল উপাদান এবং কাব্যভাষার আলোচনার পক্ষে যার গুরুত্ব খুবই কম। দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে বাক্য থেকে শব্দ ও রূপ (অঙ্গ বা morphme) পর্যন্ত সব উপাদান। ব্যাকরণ-রচয়িতা সাধারণত এই microlinguistic স্তরেই ঘোরাফেরা করেন। সাধারণ ভাষী বা বক্তা / শ্রোতা / লেখক / পাঠক ভাষার এই microlinguistic পৃথিবীর সঙ্গেই পরিচিত হয় ঘনিষ্ঠভাবে, এরই নিয়ম করে রপ্ত, এর ভূগোল করে আয়ত্ত। এবং এই মানচিত্রের সাহায্যেই সে পরবর্তী ঊর্ধতন স্তরের বা metalinguistic world এর গঠনতন্ত্র বিষয়ে আঁচ করার চেষ্টা করে। কাব্যালোচনার ক্ষেত্রে microlinguistic স্তরই আমাদের আরম্ভিক স্তর হবে, ঠিক যেরকম ভাবে ভাষাবর্ণনার ক্ষেত্রে Prelinguistic স্তর হলো ভাষাবৈজ্ঞানিকের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আরম্ভিক স্তর। Metalinguistic স্তর হলো সেই স্তর যা বাক্যের ঊর্ধ্ব-অর্থ, তাৎপর্য ও ভাষীর মনসপৃথিবীর জগত। ভাষী, পাঠক, দর্শক ও শ্রোতামাত্রেই ব্যাকরণের জগতের সঙ্গে অর্থের এই জগতকে মিলিয়ে নিয়েই ভাষিক সংপ্রেষণে অংশগ্রহণ করে। কখনো কখনো মিল খায় না; যখন এমনটা হয়, তখন তার তাৎকালিক প্রতিক্রিয়া হবে—হয় ভাষায় কোথাও গোলকধাঁধার গোপন রহস্য আছে লুকিয়ে, নয় ভাষাব্যবহারে কোথাও হয়েছে ভুল (বোঝার ভুল বা বলা / লেখার ভুল)।

Hill আরো বলেছেন যে অর্থবোধ তিন ধরনের--(১) প্রতিমাপমূলক (Correspondence meaning), যেখানে অর্থবোধ হয় micro-ও metalinguistic স্তরের মধ্যে মিল খুঁজে, (২) আংশিক পূর্বাভাসমূলক (Partially predictable meaning), যেখানে বাগ্‌ব্যবহারের context থেকে অর্থের দ্যোতনা সম্ভব, এমন শব্দেরও বা বাক্যেরও যা আমরা আগে বলিনিপড়িনিশুনিনি, এবং (৩) পূর্বাভাসমূলক (predictable), যেখানে ভাষা-ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে context-নির্ভর।

Microlinguistics নামক স্তরের বৃহত্তম উপাদান হলো বাক্য। কিন্তু বাক্যের ঊর্ধ্বেও আছে কথাবলার নানান স্তর যেখানে বাক্যতত্ত্ব অচল, কারণ বাক্যতত্ত্বে বাক্যের মধ্যেকার অংশগুলির গঠন ও পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ে কথা হলেও তদূর্ধ স্তরেই বিভিন্ন বাক্যের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা নিয়ে কোনো আলোচনা করা সম্ভব। ভাষার এই স্তরকে হিল বলছেন style। ও'র ও ট্র্যাগরের মতে এই শৈলীর স্তর আসবে micro-ও metalinguisticsএর মধ্যে। সাহিত্যিক কৃতিসমূহ (literary texts) যেহেতু বাক্যের ঊর্ধ্বতন স্তরের সংগঠক, তাই সাহিত্যালোচনার পক্ষে এই শৈলীর স্তরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ সংপ্রেষণ ও সাহিত্যিক সংপ্রেষণের মধ্যে সম্বন্ধের স্বরূপ, হিলের মতে, এইভাবে দেখানো যেতে পারে :

১. Metalinguistic—Metaliterary
২. Style —Microliterary (Stylistics)
৩. Microlinguistic—Preliterary
৪. Prelinguistics

Greimas এর Sememe theory থেকে যে ধরনের structural semantics-এর সূত্রপাত হয়, তাতে উনি Seme-এর সাহায্যে সমস্ত প্রকারের বাগর্থ (Verbal meaning), ডিসকোর্সে (বাক্যের স্তরের উর্দ্ধের বাক্যসমষ্টির স্তরবিশেষ) গ্রথিত বাক্যসমূহ এবং কৃতির (text) অর্থদ্যোতনার সামগ্রিকতাকে (যাকে উনি totalité de signification বলেছেন) ব্যাখ্যা করতে চান। গ্রীমাস বলছেন একটা বিশেষ ধরনের বৈপরীত্যের কথা, immanence ও manifestation-এর বৈপরীত্য। প্রথমটা হলো আমাদের অভিজ্ঞতার পৃথিবীর সমস্ত বৈশিষ্ট্যের একটা মানসিক অবধারণ-চিত্র (conceptual map)। দ্বিতীয়টার দ্বারা উনি ভাষা-বিশেষে এই অবধারণ-চিত্রের semes বা তাদের বৈশিষ্ট্যের কোনগুলি কেমনভাবে কোন পরিবেশ / পরিস্থিতিতে কি বিন্যাসে ব্যবহৃত হয়, সে-বিষয়ে ইঙ্গিত করেন। শব্দ যেহেতু বাক্যবিশেষে পরিস্থিতিবিশেষে অর্থ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বদলাতে ওস্তাদ, তাই উনি মনে করেন প্রতিটি শব্দের একটা অপরিবর্তনীয় মূল (invariant core) আছে, যাতে আছে এক বা একাধিক seme, এবং পরিবেশ নির্ভর seme-এর একটা পর্যায়ক্রম (a series of contextual semes)। এইগুলির মধ্যে থেকে কোন semeটিকে বা কোনগুলিকে নেয়া হবে তা নির্ভর করবে বাক্যে ব্যবহৃত অন্যান্য রূপের seme-এর ওপর। এই অর্থে গ্রীমাসও পারস্পারিক সম্বন্ধতত্ত্ব (relational theory) ব্যবহার করছেন এখানে। ওঁর বক্তব্য এভাবেই dog barked at me এবং man barked at me—এই দুটি বাক্যের অর্থান্তর সম্ভব।

আমরা অনেকেই যদিও এটা বুঝতে পেরেছি যে গ্রীমাস সম্ভবত সঠিক পথেই এগুচ্ছিলেন, তবু তাঁকে নানান প্রশ্ন ও প্রতিবাদের সম্মুখীন হতে হয়েছে, কারণ শব্দযোজনার সঙ্গে অর্থদ্যোতনার সম্বন্ধের নির্দিষ্ট কোনো সূত্র (precise formulation) উনি দিতে পারেননি।

যদিও অধিকাংশ কবিতার চরিত্রই এইরকম যে সম্পূর্ণ 'পাঠ'-ই একটা সমজনিত অর্থবৈজ্ঞানিক স্তরে অবস্থিত, কবি কিন্তু চাইলেই এই সন্তুলন (coherence) বা সমজানিতি (homogeneity) ভেঙে ছত্রখান করতে পারেন। এইজন্য কবিতা বা সৃষ্টির বিশ্লেষণ গ্রীমাসের isotopy দিয়ে ধরে রাখা সম্ভব নয়। Isotopy বলতে ইঙ্গিত করছেন যেকোনো ভাষিক সৃষ্টির সন্তুলনের দিকে। বক্তব্য মোটামুটি এইরকম : কবিতা বা গদ্যের সঠিক পাঠানুধাবনের জন্য জরুরী হলো seme গুলির পুনরাবৃত্তি এবং বাক্যে পুনরাবৃত্ত seme গুলিকে উনি বলছেন classemes। এই classemes যখন বাক্যের উর্দ্ধতন স্তরে (কবিতায়, অনুচ্ছেদে) পুনরাবৃত্ত হয়, তখনই 'পাঠ' একটা সন্তুলন খুঁজে পায়।

এই সন্তুলন বা ভারসাম্যকেই গ্রীমাস বলছেন isotopy। আমরা এই নিবন্ধের দ্বিতীয় ভাগেই দেখবো বিভিন্ন কবি isotopy-কে মেনে বা ভেঙে-চুরে কিভাবে জাল বুনেছেন।

সত্যি কথা বলতে কি এই সমজানিতি বা সন্তুলন ভেঙে যে কবিতার জন্ম হয় বা হবে, তা চরিত্রে হবে নৈরাজ্যবাদী। ফলে, এও ঠিক, যে কবিতা হারাবে অনেক পাঠক-শ্রোতা যাঁরা সমিতি ও সমজানিতি ভালোবাসেন—কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো নৈরাজ্য বা anarchyও এক ধরনের কবিতা হতে পারে। হতে পারে, কিছু কিছু রসভোগী পাঠকের দৃষ্টিতে ছন্দ ভাঙার ধূয়োও নৈরাজ্যেরই সামিল। কিন্তু আমি এই ধরনের নৈরাজ্যের কথা বলছি না। Isotopy নির্ভর তত্ত্বের গুণসীমিততা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন ছান্দসিক কবি নানান আপাত নৈরাজ্য কবিতায় নিয়ে আসেন। উদাহরণ হিসেবে এই কবিতার দিকে দেখা যাক :

> দত্ত দুজন ঃ সুধীন্দ্রনাথ, শ্রীমধুসূদন—
> কারুর সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা সুদূর।
> না, কেউ তেমন আকাট নন আমাকে বন্ধুর
> আসন দেবেন। আষাঢ়ান্ত দুপুরে সেই কেমন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কাটাকুটি চলতো, বলুন। এখন দ্বিপ্রহরে
জম্বুকুঞ্জছায়ান্ধকার ; কুত্তা ল্যা ল্যা করে।

তৃষ্ণা, শোনো ; শিল্পসায়র ওর যে কোনো ঘাটে
বিম্বিত হও।— নিরম্বু হোক, একাদশীর বাবা
টের পাবে না ঃ ঝলসে ওঠেন যে বাল্যবিধবা—
হোন শ্রীমতী লুপ্তলেখন পটে পুঁথির পাতে—
ভারালস তাঁর শ্রোণী সে বেশ উদার সাক্ষ্যবহ ঃ
চিমসে পাছার নাচনে হও যক্ষিণী যে হও।

আঁটুল বাঁটুল শামলা সাঁটুল ওদের সঙ্গে মিশে
তুমি বেজায় ভুল করছো। শামলা যায় হাটে ;
শামলাদের ছেলেগুলো পথে বসে ঃ কাঁদে।
ছোলাভাজার লোভ, আছাড়ের ভয়ের থেকে হেসে
রেগে উঠুক সন্ততিরা ঃ বাছাই করা লেখাই
নির্বাচিত বন্ধু যেন, প্রত্যাহার কী শেখায়।

(বীতশোক ভট্টাচার্য ঃ 'কবিবন্ধুকে' ; কবিতা ঃ ষাট সত্তর,১৯৮২ ঃ ১৭৩)

বেশ কিছু কারণে বীতশোকের এই কবিতাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, যাকে অঞ্জন এই সংখ্যাতেই 'কবিতার ভাষা : কয়েকটি সূত্র'-এ বলছেন কথাবার্তার ভাষা, এটা শুধু যে এই ভাষাকে কবিতার পর্যায়ে উন্নীত করার উদাহরণ তা নয়। নিঃসন্দেহে এক তরতাজা জনভাষায় সার্থক কবিতা রচনার প্রয়াস হিসেবে এই কবিতাটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কয়েকটি উদাহরণ নেয়া যাক। শব্দচয়নে যেমন আছে 'আকাট, কাটাকুটি, কুত্তা, ল্যা ল্যা, চিমসে, পাছা' তেমনি আছে বাগ্‌ধারার উদাহরণও—'একাদশীর বাবা টের পাবে না' কিংবা 'আঁটুল বাঁটুল শামলা সাঁটুল' প্রভৃতি। দ্বিতীয়ত, এই কবিতা থেকে প্রথম বা প্রাথমিক পাঠে সহজে classemes খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। প্রথম সাড়ে তিন পংক্তিতেই এসে গেছে 'দত্ত দুজন', 'সুধীন্দ্রনাথ, শ্রীমধুসূদন' এবং এঁদের সর্বনামগত নির্দেশ। পরবর্তী পংক্তিগুলিতে শুধু আছে এঁদের প্রতি তির্যক নির্দেশ। যেমন, আষাঢ়-যাওয়া দ্বিপ্রহরে চয়নগ্রন্থনপর্বে স্রষ্টার শব্দশুদ্ধিবহুলতা ও এই বিষয়ক পৌনঃপুনিকতা। কিংবা সমাসবদ্ধ 'জম্বুকুঞ্জছায়ান্ধকারে বহমান সময়ের মধ্যে দিয়ে একটা ঐতিহ্যের বিলোপের বিষয়ে ইঙ্গিত। একদিকে যেমন নবকবিবাবুকে কিংবা অনাগত কবিষ্ণু প্রজন্মকে লোভ এবং ভয়কে দূরে রেখে সৃজনীশক্তির পক্ষে উত্তেজক হাসি হাসতে কিংবা রাগ রাগতে বলা হচ্ছে, অথবা শামলাদের পোঁ থেকে কবিতাকে দূরে সরিয়ে আনতে বলা হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি আদর্শ ও ঐতিহ্যের প্রতি ফিরে তাকাবার জন্য রয়েছে অনুরোধ, হাহাকার। বাছাই করা লেখা যেন নির্বাচিত বন্ধুদের সমতুল্য। কবি-লেখক যে আজ তেমন লেখা লিখছেন না, নিজেদের সংহত সংযত করছেন না, এ জন্যেও এই হায়-আফশোষ। তৃতীয় লক্ষণীয় বিষয় হলো কত সহজে ব্যাকরণের 'তিন' পুরুষকে এই কবিতার অল্প পরিসরে বীত-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শোক নিয়ে আসেন। তৃতীয় পুরুষে এর শুরু, দ্বিতীয় পুরুষে ('সেই কেমন কাটাকুটি চলতো বলুন') এসে তা পাঠক ও দুজনে দত্তকেই যেন আন্তরিকতার সঙ্গে ছোঁয়। আপনি ও তুমি অবধি এতে স্থান বিশেষ বিম্বিত হচ্ছে। কবির অনেক চেনা সৃজনের তৃষ্ণা ও কাব্যগর্ভ ভারালস শ্রোণী, অচেনা অদেখা শুধু দত্তকবিদ্বয়। বর্তমান ও পরের প্রজন্মের কবিরাও আসে 'তুমি'-বন্ধুর পর্যায়ে। চতুর্থত, কুঞ্জের থেকে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে ঘাট ও হাট। জলহীন শিল্পসায়রের ঘাটে কবির আপত্তি নেই। বিম্বসম্ভব প্রচলিত কবিতারচনাপঞ্জিকার বাঁধাধরা পদ্ধতির বাইরে গিয়ে কাব্যসম্ভব উপবাস ও কৃচ্ছ্রসাধনে যেন আবালবঞ্চনা ও তঞ্চকতা শারীরী তৃষ্ণার ওপর আবরণ না আনে। প্রয়োজনে ফিরিয়ে নিতে হবে সৃষ্টি, সন্তান ও কবিতা। প্রয়োজনে প্রত্যাহার শেখাবে কাটাকুটির কলাকৌশল।

বীতশোকের এই কবিতাটিকে বহুভাবে পড়া যায়; যেভাবে বা যে যে ভাবে কবি পড়ার নির্দেশ দিতে পারেন বা দেবেন, তার বাইরেও পাঠ সম্ভব। এমন ধরনের পাঠে কবিতার শৈলীর যে চেহারা ফুটে ওঠে, এই সৌন্দর্য কি রয়েছে বস্তুতেই, পাঠকের মনেও কি নয়? Louise Rosenblatt ১৯৩৮ সালেই প্রস্তাব রেখেছিলেন যে কাব্যপাঠের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করেন পাঠক ও কবির সৃষ্টি—দুইই। David Bleich (১৯৮৬) আমাদের একথাই মনে করিয়ে দেন যখন তিনি ঘোষণা করেন: "Studying the reader along with the text has achieved legitimacy as a critical project.... To practice criticism how often means to study how a text is or might be read, how these readings work with (and against formal features of the text.)" ইদানীং কিছুদিন আগে Rosenblatt (১৯৮৪: ১২৩—৮) এই তত্ত্বই আরো প্রমাণসহ জোরের সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন এই বলে যে সাহিত্যকর্ম হলো সেই বস্তু যা পাঠক কৃতিতে আবিষ্কার করেন এবং আমরা কবিতা বলতে সেই ঘটনাকে বুঝবো যা তখনই ঘটে যখন একজন পাঠক কবিতা পড়েন।

ব্যক্তিগতভাবে আমার অবশ্য আপত্তি আছে এতদূর বলার ব্যাপারে যে পাঠকের পঠন ও পাঠই কবিতা। মনে হয় পাঠকের ব্যাখ্যাকে কবি ও কবিতার গুরুত্বের সমান মূল্য দিলেই চলবে। উদাহরণ হিসেবে রত্নেশ্বর হাজরার "বর্ণপরিচয়" নেয়া যাক।

ঘুরে গেলেই একটা ফাঁকা। আমি ফাঁকার মধ্যে দাঁড়িয়ে
মুঠো থেকে প ছুঁড়ে দিই। প থেকে পৃথিবী এবং প্রশ্ন
প্রতিবাদ প্রতিশোধ এবং প্রেম ছড়িয়ে পড়ে—পড়তে পড়তে
প্রহর চলে যায়—

প্রেম শব্দে প্রভুর চেয়ে প্রেমিকা সহজ—যেহেতু প্রেম
সহজাত কবচকুণ্ডল সহজাত মৃত্যুবোধের সমান
যাকে চেনার ঢের আগে আমাকে ম নামক অক্ষর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

লিখতে হয়েছে

ম থেকে মধু   মধু বাতা ঋতায়তে

মধুক্ষরিত মৃত্যু—আমি মৃত্যুকে দেখি কিন্তু চিনতে পারি না—

ছেলেবেলায় চ অক্ষর শিখতে শিখতে কেউ চাঁদ হয় কেউ চন্দন

আমি চাতক হয়ে যেতাম চিহ্ন থেকে চিহ্নহীন একা—

জ-এর উপর জাহাজ ভাসতো নদী পেরিয়ে সমুদ্রে

আমি জল চিনতাম

জল চিনতে চিনতে জন্ম

জন্ম চিনতে চিনতে

আমি মৃত্যুর কাছে দাঁড়িয়ে থাকি—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

বিন্দুর মতো চিহ্ন থেকে চিহ্নহীন—

(রত্নেশ্বর হাজরা : 'বর্ণপরিচয়' ; আজকের কবিতা ; ১৯৮১ : ১৮—৯)

চিহ্ন (sign) ও চিহ্নিতের (signified) মধ্যে যে যোগ সাধনের নাম সম্প্রেষণ (communication) কিংবা মানব-ভাষা (যা এক ধরনের সম্প্রেষণ মাত্র) তার এই সংযোগের দিকটাই এই কবিতায় হয়েছে উন্মোচিত। মহাশূন্যে এই তুচ্ছ চিহ্ন (বাচন-চিহ্ন কিংবা লেখন-চিহ্ন) দিয়ে শব্দের যাদুকর মানুষ দিচ্ছে নানান ছবি ও প্রকল্প ছুঁড়ে, তারা ঠিক ঠিক সমস্ত পার্শ্বপরিমণ্ডলে গ্রহণ করছে নানান আকার। চিহ্ন থেকে চিহ্নান্তরে মানুষ ভেসে যাচ্ছে উদ্ধতভাবে প্রহরের মাত্রা পেরিয়ে—'ঋ'-এর মাত্রা থেকে 'র', সেখান থেকে 'রে'—এভাবে পৃথিবীতে হাজার রিপু, প্রকৃতিতে হাজার ঋতু যাচ্ছে চলে। একই শব্দের গা ঘেঁষে আসছে নানান অর্থ, প্রভুর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ প্রেম এবং প্রেমিকার প্রতি সমর্পিত হৃদয়ের প্রেমে লেগেছে দ্বন্দ্ব। কিন্তু প্রেমের যেখানে শেষ (-'ম'),-মৃত্যুর সেখানে শুরু ('ম—') তাই মৃত্যু এসেছে শিক্ষায় আগে, এসেছে (বেদ)-মন্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে এমন পোশাকে যাকে মানুষ চেনে না, চিনতেও চায় না। চাঁদ ও চন্দন তবু ধর্মে যায় চেনা ; চ-এ চিহ্ন, চ-এ চিহ্নহীন অসীমও বটে। চ-এর চাতক কবি ভাষার চিহ্নায়নের ঢাল পেরিয়ে যেতেন নিশ্চিহ্ন হয়ে সম্পূর্ণ অন্য চেনার, অন্য 'জানার জগতে। সেখানে চাতকের ধ্যেয় হল জল, জলের ওপরে পারাপারের জাহাজ, জলের মধ্যে জন্ম-মৃত্যুর চিরন্তন রহস্য। জন্ম ও জন্মান্তের মধ্যের অচিনদেশে দাঁড়িয়ে একটু ঘুরে গেলেই কবি পাবেন 'ফাঁকা'—শূন্যতা, আবার শুরু হবে ভাষা চেনার পালা—বর্ণপরিচয়।

ধৈর্য ও সময় এবং বোধ—এই তিনটির সমন্বয়ে 'বর্ণপরিচয়'-এর আরো বহু ব্যাখ্যা সম্ভব। আর প্রতিটি ব্যাখ্যাই হবে কবিতা, পাঠকের পরিচয়—কবিপ্রকৃতির সঙ্গে। এই যে বোধবিভিন্নতা, এর সবটাই কিছু কবির, স্রষ্টার মনে ছিল না রচনা-কালে। সৃষ্টির পরের এই পাঠভেদও তাই সৃষ্টির সমান গুরুত্বপূর্ণ, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, তবে পাঠকীয় বিশ্লেষণই কবিতা, এতদূর বলার খুব একটা প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে অর্থায়ন (meaning inter-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

pretation) ও চিহ্নায়নের (significance) মধ্যে একটা প্রভেদ আনা দরকার পাঠ-ব্যাখ্যার চরিত্র বুঝতে গেলে। পাঠের শব্দ বা বাক্যের অর্থ হলো নিশ্চিত ও অপরিবর্তনীয় কিন্তু চিহ্নায়নের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো পরিবর্তনশীলতা এবং পাঠব্যাখ্যায় ব্যবহার্যতা। এই দুইয়ের মধ্যে ফারাকের কথা বলতে গিয়ে E. D. Hirsch (১৯৬৭, ১৯৭৬, ১৯৮৪) কিন্তু Edmund Hussler-এর সেই সূত্র ব্যবহার করছেন যেখানে Hussler বলছেন যে ভাষিক অর্থায়ন-সমেত সমস্ত বাহ্যিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ই অভিপ্রেত বিষয়-মাত্র (intentional object), যেগুলিকে তিনি বলছেন object of the mind (দ্রঃ Hirsch, ১৯৮৪ঃ ২০৩)। মজার ব্যাপার হলো এই মানসিক বিষয় কিন্তু সম্পূর্ণরূপে মনেও থাকে না। যে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো বাহ্যিক বিষয় বা বস্তুর চরিত্র বিষয়ে অশেষ সংখ্যক নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব। কিন্তু ভাষিক চিহ্নায়নের ক্ষেত্রে চিহ্ন বা বাক্য বা পাঠের চরিত্রের অদেখা অজানা বহু দিক আছে যে বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট উত্তর দেয়া অসম্ভব। কোনো পরবর্তী বিশ্লেষণই সমস্ত অজানিত অথচ সম্ভব ব্যাখ্যাকে ধরতে পারে না। Cognitive Psychology-র ক্ষেত্রে যেসব কাজ হয়েছে তার থেকে Hussler-এর বাগর্থের এই সংজ্ঞায় সমর্থনই পাওয়া যায় : "Meaning, then, may be conceived as a self-identical schema whose boundaries are determined by an originating speech event, while significance may be conceived as a relationship drawn between that self-identical meaning and something, anything, else."

এ প্রসঙ্গে Nelson Goodman-এর (১৯৬৮) একটি বিখ্যাত মন্তব্য ('There is no innocent eye') লেখক ও পাঠক—দুজনেরই দ্রষ্টব্যের প্রতি নিজস্ব ভঙ্গির স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়ারই সামিল। একথা যদি মেনেও নিই যে "there is no magic land of meaning outside human consciousness" (Hirsch, 1967 : 4), একথা বলতে আপত্তি নেই যে মানবিক চেতনার মধ্যে যে শতসহস্র magic land আছে ও থাকবে, তার ফলস্বরূপ কাব্য-পাঠে প্রভেদ ঘটবেই। এই ব্যাখ্যাবিভেদের হট্টগোলে লেখকে-পাঠকে ঐকমত্য নাও হতে / থাকতে পারে। অতএব আমরা মোটেও একথা মেনে নেবো না যে "the birth of the reader must be at the cost of the death of the author" (Barthes, ১৯৬৮ঃ ১৪৮)। সত্যি কথা বলতে গেলে কবিকর্ম অথবা কৃতি অস্পর্শা অদৃষ্টা থাকতে পারে না। প্রকৃতির ওপর কিংবা তার সৌন্দর্যের ওপর যেমন প্রকারকের অধিকার আছে, তেমনি প্রাকৃত চক্ষুষ্মান মানুষেরও আছে। অতএব বোধবিভিন্নতা থাকবেই। এখানে এই প্রভেদের ওপর জোর না দিয়ে যে কথার তলায় দাগানো দরকার তা হলো এই যে এমন বোধ-বিভিন্নতার সম্ভাবনা সত্ত্বেও এমনটা কি করে হয় যে অনেক অনেক মানুষ পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা না করেই একটা কবিতাকে ভালোবেসে ফেলেন এবং তার একটি বিশেষ অর্থ ও ব্যাখ্যাকেই ধরেন ? এই পাঠসমিতির অনুসন্ধান আরো

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
বেশি লাভজনক হবে বলে মনে হয়। তার মানে এও যে তত্ত্বগতভাবে একথা নিয়ে ভাবিত হওয়ার প্রয়োজন নেই যে 'disinterested love' (Arnold-এর কথায়) নিয়ে কাব্যপাঠ বা ব্যাখ্যা কেন সম্ভব নয় কিংবা 'text in itself' আর সাহিত্যালোচনার গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য নয় কেন ? Howard Felperin (১৯৮৫ : ২৩৫) তো কিছুদিন আগে বলেইছেন যে Humanism থেকে Post-structuralism-এর paradigm-shift-এর সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম কোপ পড়েছে 'the text in itself' নামক পরিচিত তত্ত্বটির ওপরেই। একটা সময় ছিল, যখন Felperin-এর (১৯৮৫ : ২৩৫) কথায় "the meaning of literature··· needed the appearance of objectivity, of having been arrived at through something like disinterested enquiry।" আবার তাই বলে যে পরে reader-response criticism-এর ঢেউ উঠেছে যার চরমতম প্রভাবকে 'The reader liberation movement' (Terry Eagleton-এর কথায়) বলা যায়, সেটাও পূর্ব-তত্ত্বের সার্থক বিকল্প নয়।

তাহলে কি আমি কাব্যপাঠে নৈরাজ্যের হয়ে ওকালতি করছি ?

বোধহয়, হ্যাঁ ও না, দুটো জবাবই ঠিক। না এইজন্য যে ভাষার ভাঙন, ব্যবহারে শব্দের ঘর্ষণ কিংবা অর্থের গুণ্ঠনবাহুল্য—এর প্রতি ভাষার ইতিহাসকার থেকে অভিধানকার পর্যন্ত সবার ঔৎসুক্য থাকলেও বাক্‌প্রতীক এবং বাগার্থের মধ্যের যোগাযোগের ফলে যে সাহিত্যকার সাহিত্যকৃতির জন্ম দেন, তিনি এমন নৈরাজ্যকে সাধারণত হাতিয়ার করবেন না। করলেও সম্ভবত তিনি বেশিদূর এগোতে পারবেন না।

হ্যাঁ এইজন্য যে নৈরাজ্যেও কবিতা সম্ভব। Go´ngora-র ভাষার বিষয়ে বলতে গিয়ে Paul Julian Smith (১৯৮৬ : ৮২) লিখছেন : "Go´ngora's extreme linguistic disruption, his separation, say, of noun and adjective, of article and noun, is as radical as the disintegrative poetics championed by Barthes... In particular the formal characteristics of Barthes's and Go´ngora's jargons have much in common : a love for neologism and Latinism, a reliane on the figures of contrast and disruption : antithesis, asyndeton, anacoluthon।"

এ হলো এক মানুষের কৃতিতেই ঘটনাচক্রে বিভিন্ন নিয়মভঙ্গের সমাবেশ। তবে পৃথক পৃথক ভাবে এই নৈরাজ্যের বিভিন্ন দিকের উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে আধুনিক ও উত্তর-আধুনিক বাংলা কবিতার সর্বত্র। কয়েকটি কবিতা ধরে আলোচনা করলে এই দ্বন্দ্ব ও নৈরাজ্য, নবশব্দ সৃষ্টি ও শব্দপ্রয়োগে প্রাচীনতাবাদের উদাহরণ পাওয়া যাবে, যেমন পাবো নাস্তিকতা, বাক্যযোজনহীনতা ও পদবিন্যাসের অসঙ্গতি। প্রথমেই বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের এই কবিতাটিকে নেওয়া যায় :

"শব্দ নিয়ে খেলা না লুণ্ঠন
আমি কি জিঘাংসু না স্নাতক না বক্তা না

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আমি এলেবেলে কিংবা আদিবাসীদের মতো ক্ষিপ্র তীরন্দাজ
অহংকারী না মেধাবী না পৃষ্ঠপোষক
এ সাম্রাজ্যে শূদ্র না পামর
ছদ্মবেশে অধিকারী কি অনধিকারী
আজ আমার শব্দ ছুঁতে ভয়,
একি পাপ—শব্দ নিয়ে খেলা না লুণ্ঠন ?

(বিজয়া মুখোপাধ্যায় ঃ 'শব্দ নিয়ে' ; **কবিতা ষাট-সত্তর, ১৯৮২ : ২৮**)

সমগ্র কবিতায় বিযোজন-সূত্র এসেছে ন'বার—বা সাতবার চিহ্নিত হয়েছে 'না' দিয়ে, একবার 'কিংবা' এবং একবার 'কি' দিয়ে। এছাড়াও রয়েছে সম্পূর্ণ অচিহ্নিত উহ্য বাক্যসমূহের মধ্যস্ত বিযোজন—যা প্রথম ছটি পংক্তিতে ছবার দেখতে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রেও বাক্যগুলির যে আত্মপ্রবণতা তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে মাত্র একবারই দ্বিতীয় পংক্তিতে 'আমি কি'-এর 'কি'র মাধ্যমে, যদিও asyndeton ফুটিয়ে তুলতে প্রশ্ন চিহ্নটা রয়েছে দূরে—সমগ্র কবিতার শেষে। এভাবেই বিরামের স্তব্ধতা প্রথম এসেছে 'ভয়'-এর পরে, আসন্ন দুর্ভাগ্যের ছাপ নিয়ে বিলম্ব চিহ্ন এসেছে 'পাপ'-এর পরে এবং প্রশ্নচিহ্ন এসেছে 'লুণ্ঠন'-এর পর, সর্বশেষে। স্বভাবতই এসবই পূর্বপরিকল্পিত, নৈরাজ্য ফুটিয়ে তোলা 'এ সাম্রাজ্যে'-এর লক্ষ্য।

পদবিন্যাসগত ও অন্যান্য নানান অসঙ্গতি ও নিয়মভঙ্গ এভাবেই বহু আধুনিক কবির হাতিয়ার হয়ে দেখা দিয়েছে। তবে এই অসঙ্গতি হলো একটা সাজমাত্র। কবি বিন্যাসের নানান নিয়ম ভেঙে করেন ছত্রখান, একই সঙ্গে অর্থে ও জীবনেও ভাঙনের ছবি ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে তুলতে। একটা দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ দিয়ে এই বক্তব্যকে আরো জোরালো করা যায় :

"পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে, দেয়ালে দেয়াল, কার্ণিশে কার্ণিশ
ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাতে
বাড়ি ফেরার সময়ে বাড়ির ভিতর বাড়ি, পায়ের ভিতর পা,
বুকের ভিতরে বুক
আর কিছু নয় (আরো অনেক কিছু ?)—তারও আগে
পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে, দেয়ালে দেয়াল, কার্ণিশে কার্ণিশ,
ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাতে
বাড়ি ফেরার সময়, বাড়ির ভিতর বাড়ি, পায়ের ভিতর পা,
বুকের ভিতরে বুক
আর কিছু নয়"

(শক্তি চট্টোপাধ্যায় : 'সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়' ; **সোনার মাছি খুন করেছি, ১৯৬৭ : ১১**)

এই কবিতায় কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণের সংখ্যা স্বাভাবিকের গণ্ডী গেছে পেরিয়ে। এই কটি পংক্তিতেই এসেছে ১২ বার, গোটা কবিতায় ৩২ বার। এই অতিব্যবহারই কবিতার নামের যাথার্থ্য করে প্রমাণিত, যেখানেও 'সময়' আছে দুবার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
ও তার নির্দেশক সর্বনাম দুবার। এই ৩২টি কাল বাচী বাক্যাংশের মধ্যে পুনরাবৃত্ত শব্দগুচ্ছের মধ্যের কালবাচনচিহ্ন (যেমন, 'দেয়ালে দেয়াল') এসেছে ৬ বার, প্রত্যেকবারই হয় 'দেয়াল' নয় 'কার্ণিশ'-এর সঙ্গে। দ্বিতীয়ত শুধু 'ভিতর / ভিতরে' এসেছে ১৬ বার যার মধ্যে পুনরাবৃত্ত অন্ততঃ ৫টি শব্দগুচ্ছই এসেছে ১২ বার। বাড়ি, পা, বুক, কালো গাড়ি বা মৃত্যু—এই কটি শব্দ বা শব্দগুচ্ছ যেন দুঃসময়ের স্থান, বাহন, আবাস, কারণ ও কষ্টেরই পরিণতি। যৌবনের অপমৃত্যুর এই সামাজিক পটভূমিকার ছবি বাগার্থবিন্যাসের কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম, অলঙ্কার কিংবা বৃত্তিকে না মেনেই এখানে আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে হয়েছে আঁকা। সপ্তমীর '—এ' এবং অব্যয় 'ভিতর / ভিতরে' বাদ দিয়ে আছে আরো দশটি বাগ্‌বিন্যাস যেখানে '-র সময়' (৩ বার), 'যতক্ষণ...... না' (২), 'যেখানে' (১) ও 'যখন' (১) ছাড়াও আছে একটি দ্বন্দ্বময় ('গাড়ির বাইরে, কিন্তু অন্য গাড়ির ভিতর') ও একটি চক্রক ('কঙ্কালের ভিতরে শাদা ঘুণ, ঘুণের ভিতরে জীবন, জীবনের ভিতরে / মৃত্যু—সুতরাং / মৃত্যুর ভিতরে মৃত্যু) জটিল বাক্য যাদের চরিত্র হচ্ছে ক্রিয়াবিশেষণেরই এবং এ দিয়ে আমাদের অশান্ত যদুবংশী সমাজের চেহারা আরো নগ্নভাবে ধরা পড়ে।

আর এক ধরনের কবিতায় পরিকল্পিত বা প্রোথিত নৈরাজ্য (planned বা planted anarchy) আছে যেখানে শেষে এসে দেখা দেয় অবোধ্য ভগ্নবাক্যের বিস্রস্ত যোজন :

সমুদ্র
আমার ঘর
তোমার গান
স্বপ্নের উপকূল
গান গাও তুমি   তখনও গান গাও
তখনও তোমার গান
আমি
আমি ভেসে চলি   স্বপ্নে   উপকূলে ॥

(সজল বন্দ্যোপাধ্যায় : 'স্বপ্নে উপকূলে' ; **কবিতা : ষাট সত্তর ; ১৯৮২ : ৯১**)

এই কবিতায় তিনটির মধ্যে শেষ স্তবকটিতে রয়েছে আপাতদৃষ্টিতে সংযোগহীন ৮টি পংক্তি। একেবারে isotopy নেই তাও নয়। কারণ 'গান/গাওয়া' আসছে ৬ বার, 'আমি' ও 'তুমি' ৩ বার করে এবং 'স্বপ্ন' ও 'উপকূল' ২ বার করে, তবু সাজানোর চাতুর্যে এগুলিকে মনে হয় বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো—সমুদ্রে প্রকৃতির ঘর যেন। দৈর্ঘ্যে ও দূরত্বের অর্থ বাক্য দিয়ে নয়, কবিতায় লেখার মাঝে মাঝে দীর্ঘ বিরতি দিয়ে হয়েছে বোঝানো। একইভাবে 'তখনও' গেয়ে যাওয়ার আগের ক্ষণ এবং 'ভাসমান'তার থেকে 'স্বপ্ন'-এর দ্বীপ, 'স্বপ্ন' থেকে পারাপারের অসম্ভবনা প্রায় সম্ভাবনা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্থান ব্যবধান।

কবিতার মধ্যে ধ্রুপদী চিত্রশিল্পের গুণকে আরো অনেকে সুন্দরভাবে নিয়ে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এসেছেন সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, যেখানে এই যোগসূত্রটিকে প্রায় কবিতার সংক্ষেপক-রূপে ব্যবহার করেছেন বক্তব্যকে জোরালো করার জন্য, জয় গোস্বামী সেখানে এটিকে শুধু ভঙ্গি হিসেবে ব্যবহার না করে কবিতা ও ছবির space-কে সাজানো, ভাঙা, ছড়ানো, বাঁধা, গোছানো, ধরে রাখার মাধ্যমে এই দুটির সম-উদ্দেশ্যের সার্থক প্রয়োগ দেখিয়েছেন এই কবিতাটিতে :

"যতদূর মনে পড়ে একটি অশ্ব
তার মাটিতে ঠেকে যাওয়া পাকস্থলী
তার নাসার বিস্ফারিত ছিদ্র
তার আকাশের দিকে উঠে যাওয়া ঘাড়
যতদূর মনে পড়ে তার বাদুড় শরীর
তার ধারালো সুন্দর ওষ্ঠ
ও অবশেষে, মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসা
মাঝখান দিয়ে কাটা জিভ
যতদূর মনে পড়ে একটি কচ্ছপ
আর বিরাট বর্তুল
পিঠ
যার উপর থকে গড়িয়ে পড়তে গিয়ে অশ্বটিকে আঁকড়ে ধরছে
তীব্র আঙুলে সেই বাঙালী মেয়েটি……

(জয় গোস্বামী ঃ 'একটি প্রেমের দৃশ্য' ; আজকের কবিতা, ১৯৮১ : ১১৬)

মনের প্রেক্ষপটে পতিত হয় যে ছবি তা যেন দেখা দেয় কিছুক্ষণ পরে পরে। এভাবেই যেন তিনবার ব্যবহৃত 'যতদূর মনে পড়ে'র মধ্যের ব্যবধান আছে সাজানো। মনে পড়া ও স্মৃতি থেকে উত্থিত ছবি যেন মনের দুটি পৃথক বলয়ের মধ্যে দেয় দেখা ; সেভাবেই কবিতার বাঁ ও ডান দিকের অংশে রয়েছে দূরত্ব। স্মৃতির ফলকে মৃত অশ্ব, তার পাকস্থলী, নাসা ও ঘাড়, ঝুলন্ত শরীর—গতিমান অথচ নির্গত, সুন্দর ঠোঁট, দ্বিধায় সাজানো জিভ কিংবা বিশাল বর্তুল পিঠ—এসবই বাঙালী মেয়েটির জান্তব প্রেমের দেড় পংক্তির গদ্যময়তার ওপরে রয়েছে ছবির মতোই টাঙানো।

বহু শব্দগুচ্ছ শপথের মতো, সোচ্চার দাবি-দাওয়ার মতো, অপূর্ণ অভিলাষের মতো কবির রচনায় আসে বারে বারে—এই আসা-যাওয়ার মাঝে থাকে না কোনো যোজন-চিহ্ন, বিরাম, প্রসঙ্গভেদ। একেও পরিকল্পিত নৈরাজ্য বলা যায়, যেমন এই কবিতাটিতে দেখি :

প্রথম স্তবক :

ধীরে ধীরে / যেভাবেই হোক / বদলে নেবো / বদলে বদলে নেবো/
মানুষ মানুষে গাছে গাছ / সিংদরজা আনাচ-কানাচ / বদলে নেবো /
বদলে বদলে নেবো / ধীরে ধীরে / যেভাবেই হোক / বদলে নেবো

দ্বিতীয় স্তবক :

ছেঁড়া খোঁড়া ইজেরের ফুটো / কনুই পর্যন্ত ভাঙা মুঠো/বদলে নেবো/

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সহজ পোশাকে / আকর্ণবিস্তৃত মুখ ঢাকে / ঠায়সন্ধ্যা পিছল গলির/
চলি / চলি, দেখে আসি / বেজেছে আঘাটা-ছাড়া বাঁশি / কিনা /
কোন্ রাজ্যে রয়েছ নবীনা / বিপ্লব / যেভাবে হোক / বদলে নেবো/
বদলে বদলে নেবো।

(শক্তি চট্টোপাধ্যায় : 'ধীরে ধীরে', শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা ; ১৯৭৩–৮৩)

এখানে প্রথমেই যা চোখে পড়ে তা হলো পরিবর্তনের প্রতি কবির বিশ্বাস, বদলে নেয়ার শপথ যাতে ছেয়ে আছে কবিতার এক-তৃতীয়াংশ, ২৬টির মধ্যে ৮টি পংক্তি। অন্ততঃ তিনবার তা এসেছে শপথের মতো—'বদলে বদলে নেবো' আছে বাকি ক'বার মনস্থিরতার প্রতীক হিসেবে। কিন্তু কোন স্বভাব, বিষয়, অনিয়ম বা ঘটনার চাই পরিবর্তন ? পরিবর্তন চাই মানুষের সমাজ, প্রকৃতির অকরুণতার, শাসন-ব্যবস্থার গলদ, নিরন্নতা ও অর্থাভাবের। তবে এই রদবদল হবে ধীরে ধীরে এমনকি বিপ্লবের চেহারাও নিতে হবে বদল করে। তবে প্রক্রিয়ার বিষয়ে কবি নিশ্চিত নন, পথের বিষয়ে নন নিশ্চিন্ত। এই কবিতায় উল্লঙ্ঘিত বাক্যরচনার উদাহরণও খুবই স্পষ্ট :

(১) চলি (২) চলি, (৩) দেখে আসি (৪) বেজেছে (৫) আঘাটা-ছাড়া বাঁশি (৬) কিনা (৭) কোন রাজ্যে (৮) রয়েছে (৯) নবীনা (১০) বিপ্লব

এখানে এই দশটি বাক্যাংশের মধ্যের 'কথাবার্তার ভাষা'-য় পাবো একাধিক বিন্যাস :

(ক) ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০

(খ) ১, ৫, ৪, ৭, ৯, ১০, ৮, ৬, ২, ৩, প্রভৃতি।

এখানে যে অর্থবহুলতা দেখতে পাওয়া যায় তাতে শব্দবিন্যাসের চাতুর্য ও মাধুর্য দুইই পরিস্ফুট।

একই কবিতায় স্তবক-বিভেদে বিরতিহীন বাক্য থেকে শতভগ্ন বাক্যগুচ্ছ, অসম্ভব গদ্যময় কথাবার্তার ভঙ্গি থেকে পদবদ্ধ কাব্যময়তা, পশ্চাদপট থেকে ক্রমকথিত গল্প থেকে মনোবিশ্লেষণ—এমনটা পাওয়া সম্ভব। একই সঙ্গে আধুনিকতম ভাষাশৈলীর গ্রন্থনার ফাঁকে থাকে লুকোনো প্রাচীন ভারতীয় ভাষার ব্যাকরণ, আস্তরণের নিচে হাড়ের প্রলেপের মতো। জয় গোস্বামীর 'হাসি, হাসিগুলি, হাসিদের' এমনই এক উদাহরণ। প্রথম পংক্তিতেই আছে অর্থবহুলতা সৃষ্টির একটা চমৎকার উদাহরণ। 'গমগম' এখানে ধ্বন্যাত্মক শব্দও বটে এবং 'হস্' ধাতুর থেকে 'গম্' ধাতুর প্রাগ্রসরণ প্রক্রিয়াতে 'হা'য়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে' এসে ভেসে যাওয়ার অর্থদ্যোতকও বটে। আগে কবিতাটি পড়া যাক :

হস্ ধাতুর হা'য়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো গমগম
আর তুলোর মতন খণ্ড খণ্ড উড়তে থাকলো আকাশে
যেন সাদা সাদা শরৎকাল উড়ে যাচ্ছে মাথার উপর
তারপর কখন যে তার একটুখানি টুক ক'রে নেমে পড়লো
অংশুদের বাড়িতে, সেই বীরভূমে, কেউ জানতেই পারলো না

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

একদিন টানটান ক'রে আমি মেলে ধরলুম আমার চোখের পাতা
তখন তো ভোর, তাই পূর্বদিকে, মানে তোমার মুখে তখন
কী জটিলতাহীন অরুণাভা
কী যে অরুণা কী অরুণ !...আমি তো তোমার নাম জানতুম না
তাই 'অরুণ' বলে ডেকে উঠলুম আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার সাদা, অসম্ভব সাদা
শাড়ি খুলে গিয়ে আমার চোখের পাতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো আর
ঝাঁক ঝাঁক উড়ে গেল চোখের ভেতর—আকাশে ।......ইঁদুরের
পেটের মধ্যেকার অন্ধকার আর উল্টোনো ডেকচির অন্ধকার থেকে শুরু করে
সাইকেলের বাতাস ভর্তি টিউবের অন্ধকার পর্যন্ত ঝাঁপ দিয়ে পড়লো
তোমার অসম্ভব সাদা শাড়ি, যেমন একদিন 'হস্' ধাতুর মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে
একটা কাঠবেড়ালী একটুখানি কামড়ে দিয়েছিল তোমার ঠোঁটে আর তুমি
'আঃ লাগছে' বলতে গিয়ে হেসে ফেললে, সঙ্গে সঙ্গে মোরগের লাল ঝুঁটির উপর
নেমে এলো খুব ভারি কুয়াশা, তোমার বাড়ি ঘিরে ফেললো
কুয়াসারা, এসে দাঁড়ালো
তোমার জানলার সামনে, তারপর একসময় হাত বাড়িয়ে টেনে আনলো
তোমার মুখের কুচি কুচি তুষার, আর তুমি ঝাঁক ঝাঁক উড়তে থাকলে আকাশে
কোথা থেকে ভেসে এলো তোমার খুলে যাওয়া শাড়ি যেন টুকরো টুকরো
শরৎকাল উড়ে যাচ্ছো মাথার উপর দিয়ে সাদা সাদা, তারপর
কখন যে তার একটুখানি টুক করে নেমে পড়লো
অংশুদের বাড়ি, সেই কোন বীরভূমে, কেউ জানতেই পারলো না

আসলে, তোমাকে আমি মনে মনে মোমবাতি বলে ডাকতুম ।
সাদা মোমবাতি, তুমি জানতে না ।
আসলে একদিন আমি তোমার পিঠের
একটু উঁচু হয়ে থাকা খুব শান্ত হাড়ের উপর
দেখেছিলুম আরো শান্ত, সাদা একটি স্ট্র্যাপ ।
সেইদিনই 'হস্' ধাতুর মধ্যে থেকে জেগে উঠেছিলে
আর
তোমার পিটের ঐ সাদা হাড় থেকে
উড়ে এসেছিলো আরো সাদা সাপ, প্রিয়তম সাপ
খিল খিল, খল খল, খণ্ড খণ্ড, অসম্ভব শাড়ি ।

বলো হাসি, কী রকম চাপ চাপ হেসে উঠেছিল ঐ হাসিগুলি, হাহাকারগুলি
আমাদের সারসার হাসিদের দেখে !

না গো, আর কোনোদিন ভালবাসবো না

(জয় গোস্বামী : 'হাসি, হাসিগুলি, হাসিদের ; **প্রত্নজীব**, ১৯৭৮ : ১১)

হাস্যমুখের হাঁ হয়েছে হস্-ধাতুর হাঁ । কিন্তু একথা আমরা জানতে পারি না যে বেরোয় কে বা কী ? একই ভাবে দ্বিতীয় পংক্তিও উদ্দেশ্যপদহীন । 'তুলোর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
মত খণ্ড খণ্ড কে বা কী ওড়ে আকাশে ? মেঘ ? দুইয়ের উত্তরই বোধহয় একই-সঙ্গে 'হাসি, হাসিগুলি'। কবিতার নামে পাচ্ছি সংস্কৃত শব্দরূপের গন্ধ। একদিকে যেখানে শীর্ষস্থানেই পাই অতিব্যাকরণের গন্ধ, অন্যদিকে তেমনি প্রথম দুটি বাক্যেই বাক্যবিন্যাসসূত্রের প্রাথমিক নিয়মেরই উল্লঙ্ঘন। প্রাচীনেতিহাস জানা ও ইতিহাস-ভাঙার প্রক্রিয়া একইসঙ্গে পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। একইসঙ্গে লিঙ্গভেদের প্রাচীন সূত্রে আসে 'কী কী যে অরুণা যে অরুণ' আবার একই সঙ্গে প্রেমিকার নাম পড়ে 'অরুণ' কিংবা 'মোমবাতি'—পুংলিঙ্গ কিংবা ক্লীবলিঙ্গ, নামে কীবা আসে যায় ? উদ্দেশ্য-বিলোপের অচলিত সূত্রের ব্যবহার আরো একাধিক বার পাই, যেমন 'আর ঝাঁক ঝাঁক উড়ে গেল চোখের ভেতর—আকাশে'। তৃতীয় পুরুষের বর্ণনা থেকে দ্বিতীয় পুরুষে উত্তরণ ('যেন টুকরো টুকরো / শরৎকাল উড়ে যাচ্ছে। মাথার উপর দিয়ে সাদা সাদা') কিংবা দ্বিতীয় থেকে তৃতীয়তে অবতরণ ('বলে। হাসি, কী রকম চাপ চাপ হেসে উঠেছিল ঐ হাসিগুলি') ঘটছে ব্যাকরণ ভেঙে কতো সহজেই। সবচেয়ে অদ্ভুত গঠন অবশ্য অন্য একটি বাক্যের :

"সেইদিনই 'হস্' ধাতুর মধ্যে থেকে জেগে উঠেছিলে
আর
তোমার পিঠের ঐ সাদা হাড় থেকে
উড়ে এসেছিলো আরো সাদা সাপ, প্রিয়তম সাপ
খিল খিল, খল খল, খণ্ড খণ্ড, অসম্ভব শাড়ি।"

এখানে প্রথমত যুগ্ম বাক্যের প্রথমটিতে ক্রিয়ার রূপতত্ত্বের ওপর ভরসা করে উদ্দেশ্য 'তুমি' পড়েছে বাদ। দ্বিতীয়ত যোগচিহ্নের পরের বাক্যের মধ্যে বাদ কিছু না থাকলেও শেষ পংক্তিতে এসে মনে হয় এটি মূল বাক্যের সঙ্গে সংযুক্ত না হয়ে থাকছে শূন্যে ঝুলে। তৃতীয়ত, সাপ ও হাসির যুগ্ম বর্ণনায় 'খিল খিল, খল খল, খণ্ড খণ্ড' একটা করে ধ্বন্যাত্মক, প্রতীকী এবং ভগ্নাত্মক বিশেষণগুচ্ছ একটা অদ্ভুত পরিমণ্ডলের সৃষ্টি করে।

বার্তালাপ, নির্দেশ, পরিপার্শ্বের বর্ণনা এবং প্রাচীন অতিকথা—সবগুলি একটি ছোট কবিতার পরিসরে এনে একটি থেকে অন্যটিতে কতো অনায়াসে চলে যাওয়া যায়, ইদানীংকালের কিছু কিছু কবিদের কবিতায় তার সার্থক উদাহরণ পাওয়া যায়। অমিতাভর একটি কবিতার থেকে আমরা দেখতে পারি কিভাবে জ্ঞানের সমাজতত্ত্ব (Sociology of knowledge), বাগ্‌ব্যবহার তত্ত্ব (Speech act theory) এবং বার্তালাপ বিশ্লেষণতত্ত্ব (discourse analysis)—এই তিনটির সমন্বয়ের প্রয়োজন শৈলীবিজ্ঞানীর বিশ্লেষণী হাতিয়ার রূপে :

"গলির মোড়ে ডানদিকে যাও বাঁদিকে যাও ডাইনে ফেরো
বাঁয়ে পেছোও লাফিয়ে ওঠো ডিগবাজি খাও আস্তাকুঁড়ের
আড়াল থেকে পিছলে এসো সবুজ দেয়াল শ্যাওলা ধরা

চায়ের দোকান মাস্তানেরা জিহ্বা চাঁছে চায়ের কাপে
নোংরা ঠোঁটের ছোপ পড়েছে গড়িয়ে পড়ে পুঁজের মতো
নিয়ন আলো পেঁয়াজকুচি রাইসরিষা টুকরো শসা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ডান দিকে যাও এগিয়ে এসো বাঁদিক দিয়ে মুণ্ড ঘোরাও
বৃহন্নলার বয়েস বাড়ে তোমার কী সাধ বাড়ে তেমন
তেস্‌রা বাড়ি পেরিয়ে এলেই দেখতে পাবে মাথার উপর

জানলা খোলা বাঁদিকে যাও জানলা খোলা ডাইনে হাটো
বাড়ির সদর কুলুপ আঁটা কিন্তু লোহার শেকল জুড়ে
জ্বলছে আগুন জানলা দিয়ে দিচ্ছে উঁকি সাপের ছবি।"

(অমিতাভ গুপ্ত : 'ভাঙা রাস্তা' ; আজকের কবিতা ; ১৯৮১)

এখানে প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে তা হলো বাস্তবের বর্ণনাকে ছাপিয়ে কবির বর্ণন-শৈলীর আত্মপ্রকাশ—যেখানে কবি পাঠকের সঙ্গে একটা যাজকীয় শ্রোতা-নির্ভর নির্দেশাত্মক (Directive, persuasive or pragmatic function) বাক্‌-শৈলীর ব্যবহার করছেন। এই নির্দেশাত্মক বাক্যগুলি কিন্তু নির্দেশ যত না, তার চেয়ে বেশি আমাদের নিত্যকার অস্থিরতা, পতন ও নিরূপায়তার প্রতীক যার ব্যাখ্যা একমাত্র বাগ্‌ব্যবহার তত্ত্বের নানান সূত্রাবলীর সন্ধানের দ্বারাই সম্ভব। এই নিবন্ধে এর আগেও যে কটি কবিতার ব্যাখ্যা ও আলোচনা করেছি, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যে ধরনের সাহিত্যতত্ত্বের পরিধির মধ্যে থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তাকে শর্তসাপেক্ষ কিংবা পরিবেশ নির্ভর সমালোচনা (Conditional or contextual criticism) বলা যায়। সাহিত্যের বিশ্লেষণে যে দুটি মূল ধারা এখন কমোন তার একটি সোস্যুরীয় ঐতিহ্য মেনে সাহিত্যের মূল আকরণকে অনাবৃত করে যেজন্য তার নাম রাখা হয়েছে প্রতি-সংচরনা সমালোচনা deconstructive criticism)। অন্যটিকে বলা যায় পরিবেশনির্ভর সমালোচনা (ecological criticism)।

প্রতি-আকরণবাদীদের বক্তব্য হলো শব্দ এমনই ব্রহ্ম যে তা কাল ও স্থানের দ্বারা অস্পৃষ্টব্য এবং এইজন্যই পরিবেশ-অচেতন সর্বজনীন সত্য। পরিবেশবাদীরা নির্ভর করছেন এ্যারিস্টটলের সেই দার্শনিক উক্তির ওপর যেখানে উনি বলছেন : "Our own doctrine is that not all knowledge of the immediate premises is independent of demonstration" (Posterior analytics Works 1 ; 72b as in Harris, 1986)। প্রতি-আকরণবাদীরা বলবেন সাহিত্যের সব 'পাঠ'-ই (reading) ভুল পাঠ (misreading) কারণ পাঠভেদ অবশ্যম্ভাবী, কখনোই দুটি পাঠে একতা ও সমতা থাকবে না। এভাবেই কোনো সাহিত্যকৃতির এমন 'পাঠ' সম্ভব নয় যাতে তার রচয়িতাকে বৌদ্ধিক ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট করার মতো বিশ্লেষণী ক্ষমতা থাকবে। অতএব তত্ত্বকে পাঠ ও পরিবেশ-নির্ভর না করে চাকাটা অন্যদিক থেকে ঘোরানো দরকার। অর্থাৎ, সাহিত্য-বিশ্লেষণের একটা সর্বজনীন তত্ত্ব গড়ে তুলে সব পাঠকেই এই তত্ত্বের সঙ্গে সংযুক্ত করা উচিত। Derrida এই প্রতি-আকরণবাদীদের সবচেয়ে খ্যাতনামা মুখপাত্র। Derrida-র পরা-আকরণবাদী (post-structuralist) তত্ত্বের বিষয়ে বিস্তারে বলতে গেলে তা আরেকটি নিবন্ধের সৃষ্টি হবে। তার চেয়ে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
সাহিত্যালোচনের ক্ষেত্রে এই তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর সীমিতত্ত্বা নির্দেশ করেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

বিচিত্রতা ও বিভিন্নতাই যেখানে নিয়ম সেখানে একটি বিশ্লেষণী তত্ত্ব ও ব্যাখ্যার স্থিতিমাপের (parameter) বিষয়ে চিন্তা করা অযৌক্তিক। সোস্যুরের langue-কে parole থেকে পৃথক করার প্রয়োজন বা ভাষা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে synchrony নামক দেশকালেতর একটি কাল্পনিক গঠকের (hypothetical construct) প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ভাষাতত্ত্বের প্রগতির ঐ বিশেষ সময়ের নিরিখেই বুঝতে হবে। একইভাবে Chomsky-র competence-ও একটি অতিকথা (myth) আধুনিক ভাষাতত্ত্বের প্রগতির পক্ষে যার গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু এখন এই অভিমতই যথেষ্ট জোরের সঙ্গে ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্রদের বক্তব্যে ও রচনায় স্থান পাচ্ছে যে এর পর যদি তাত্ত্বিক বিপ্লব আসে তো তা বিচিত্র, বিভিন্ন ও বিশ্রস্তের তাত্ত্বিক অনুসন্ধান থেকেই আসবে, আসবে parole ও performance-এর ব্যাখ্যা থেকেই।

এই প্রসঙ্গে প্রতি-আকরণবাদী ও পরিবেশবাদীদের তুলনা করে Wendell Harris (১৯৮৬ : ১১৭) যা বলছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উনি বলছেন যে প্রথমোক্ত তাত্ত্বিকেরা "explore the theoretical ramifications of regarding all texts in the context of LANGUE ; the other [possibility] is to resist the temptation to erect an abstract superstructure and, instead, simply ask how signs function in use. Deconstruction chooses the first of these roads... Ecological approaches, on the other hand, while accepting the principle that language partly creates reality, investigate how the individual PAROLE can nevertheless be formulated by the speaker/author in such a way as to be adequately interpreted by the auditor/reader।" আমার সমর্থন স্বাভাবিকভাবেই পরিবেশবাদীদের দিকে।

যাঁরা ১৯৭৬ থেকে সাহিত্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে (দ্রঃ গাঙ্গেয় পত্র, ২) আমার বক্তব্যকে যাচিয়ে ঝালিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছেন, তাঁদের কাছে আমার এই সমর্থনকে ১৮০° ঘুরে যাওয়ার সামিল বলে মনে হতে পারে। কিন্তু 'সঞ্জনন' কথাটির ব্যাখ্যা যদি এভাবে করি যে আলোচক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে পাঠের এমন আকরণকে কলমের আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলবেন যা লেখকের মনে ছিল ঐ বিশেষ কৃতির রচনা-পর্বে কিংবা যার ছবি পাঠকদের মনোজগতে ভেসে ওঠে কৃতি-পাঠের পর পরই তো উদয় নারায়ণ সিংহ ও আশিসকুমার দে-র (১৯৭৬) সঞ্জননী শৈলীবিজ্ঞানের থেকে বর্তমান নিবন্ধে কবিতার পরিবেশবাদী শৈলীবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে উত্তরণকে স্ববিরোধী বলে মনে হবে না। তাছাড়া, ১৯৭৬ এবং তৎপরবর্তী গাঙ্গেয় পত্রে প্রকাশিত অন্যান্য নিবন্ধে আমি বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, সতীনাথ ভাদুড়ী ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্য-কৃতি থেকে এইসব গদ্য-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শিল্পীদের কৃতি বিশেষের জন্য দায়ী মনঃ-আকরণের চিত্রাঙ্কনের চেষ্টায় আত্ম-নিয়োজন করেছিলাম। এই নিবন্ধে তার সঙ্গে পাঠবিভিন্নতাকে ব্যাখ্যার ও বিশ্লেষণের আওতায় আনতে গিয়ে সাহিত্যপাঠে পাঠকের প্রতিক্রিয়ার থেকে পাঠক-মনের আকরণকেও শৈলীবিজ্ঞানীর আলোচ্য বিষয়রূপে গ্রহণ করেছি।

গ্রন্থনির্দেশ :

বাংলা

গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল ও সুব্রত রুদ্র, সম্পাদিত (১৯৮১) আজকের কবিতা। কলকাতা।
গোস্বামী, জয় (১৯৭৮) প্রত্নজীব। কলকাতা : পরমা।
চট্টোপাধ্যায়, শক্তি (১৯৬৭) সোনার মাছি খুন করেছি। কলিকাতা : ভারবি।
— শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা।
দাস, উত্তম, মৃত্যুঞ্জয় সেন ও পরেশ মণ্ডল, সম্পাদিত (১৯৮২) কবিতা : ষাট সত্তর। বারুইপুর : মহাদিগন্ত প্রকাশ সংস্থা।
সেন, অঞ্জন (১৯৮২) 'কবিতার ভাষা বিষয়ক বিশ্বাস / প্রসঙ্গ : হননের রাত'। জনপদ ১, ১১—১৩।
— (১৯৮৬) 'কবিতার ভাষা : কয়েকটি সূত্র'। গাঙ্গেয় পত্র, ১০।
সিংহ, উদয় নারায়ণ ও আশিসকুমার দে (১৯৭৬) 'বাংলা উপন্যাসের শরীর ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়'। গাঙ্গেয় পত্র, ২ : ১৯৭৬।

বিভাষা

Barthes, Rolland (1968) 'The death of the author'. In Rolland Barthes. Image-music-text (Essays tr by Stephen Heath). New York : Hill & Way.
Bleich, David (1986) 'Intersubjective reading'. New Literary History, 17.3 : 401-21. Spring no.
Culler, Jonathan (1975) Structuralist poetics. London : Routledge & Kegan Paul.
Felperin, Howard (1985) Canonical texts and non-canonical interpretations ; The neohistoricist rereading of Donne. Southern Review, 18.3 : 235—50, November No.
Gombrich, E. H. (1956) Art and illusion : A study in the psychology of pictorial representation. A. w. Mellon lectures in the fine arts, 1956. New York.
— (1982) The image and the eye, Ithaca, New York.
Goodman, Nelson (1968) Languages of art : an approach to a theory of style. Indianapolis, 1970.
Greimas, A. T. (1966) Semantique structurale. Larousse, Paris.
—, ed. (1971) Essais de semiotique poetiqueParis.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Harris, Wendell V. (1986) 'Toward an ecological criticism : contextual versus unconditional literary theory.' College English, 48-2 : 116—131. February no.

Hill, A A. 1967 : Poetry and Stylistics in Chatman. S. and S. R. Levin (eds.) Essays on the Language and Literature. Boston : New York.

Hirsch, E. D. 1967. Validity in interpretation. New Haven, Connecticut.

— 19 6. The aims of interpretation. Chicago.

— 1984. Meaning and significance reinterpreted, Critical inquiry, 11.2 : 202-25. December.

Jakobson, Roman (1960) 'Linguistics and poetics'. In Thomas A. Sebeok, ed. Style in language. Cambridge ; The Massachussettes Institute of Technology.

Krieger, Murray (1984) 'The ambiguities of representation and illusion : an E. H. Gombrich retrospective'. Critical Inquiry 11.2 : 181—201. December no.

Lewis, Clayton W. 1986. Identifications and divisions. Kenneth Burke and the Yale critics'. The Southern Review (The Louisiana State University), 22.1 : 93—102. January no

Rosenblatt, Louise (1938) Literature as explorations Reptd in 1968 New York.

— (1984) 'The poem as an event'. College English, 26.2 : 123—8. November no.

Smith, Paul Julian (1986) 'Barthes, Gongora and non-sense'. PMLA, 101.1 : 82—94. January no.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

য়ুরি লোৎমন

বহুমুখী শৈল্পিক সংকেত প্রণালী

বস্তুতঃ বহুক্ষেত্রেই গ্রাহক বা উদ্দিষ্টজন যে বার্তার মর্মোদ্ধারের প্রয়োজনে একটি বিশেষ সংকেত-প্রণালীর সাহায্য নিতে বাধ্য হয়—তাই নয়, যে ভাষায় কৃতিটি সংকেতাবদ্ধ তাও নির্দ্ধারণ করে নিতে হয় তাকে। এখানে লক্ষ্য করি ঘটনার নিম্নোক্ত ধরনগুলি ঃ

(১) ক. গ্রাহক ও প্রেরক বা ভাষী উভয়েরই জ্ঞাত একটি সাধারণ সংকেত প্রণালী ব্যবহার করে। শৈল্পিক ভাষার সাধারণ চরিত্রকে নিঃশর্তে ধরে নেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে বার্তাটিই শুধু অভিনব। স্বোপলব্ধির নন্দনতত্ত্বের অন্তর্গত সমস্ত শিল্পপ্রকরণগুলির এটাই চরিত্রবৈশিষ্ট্য। প্রতি ক্ষেত্রেই ঘটনাটির পরিস্থিতি, তত্ত্বজগত এবং কৃতি-অতিরিক্ত অন্যান্য প্রতিবেশগুলিই দর্শককে আলোচ্য বয়ানের সম্ভাব্য একমাত্র শিল্পভাষার সন্ধান দেয়।

খ. সমকালীন, জনপ্রিয়, গতানুগতিক কৃতিগুলির সমাদর 'ক'-এরই প্রকারভেদ। উপরন্তু প্রেরক ও গ্রাহকের ক্ষেত্রে সাধারণ একটি সংকেত এখানে সক্রিয়। কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে যদিও এটাই শৈল্পিকসংবাদ সংক্রমণের একটি শর্ত, এবং সম্ভাব্য সকল উপায়ে এরই উপর জোর দেওয়া হয়, তথাপি এক্ষেত্রে লেখক এই তথ্যটিকে গোপন রাখতে ইচ্ছুক, সুতরাং কৃতিটিতে অন্য এক গতানুগতিকের আঙ্গিক-বিভ্রম তিনি আরোপ করেন, অথবা একটি ক্লিশের পরিবর্তে ব্যবহার করেন অন্য এক ক্লিশে। বার্তাটিকে গ্রহণের পূর্বে পাঠক অবশ্যই তার আয়ত্তাধীন শিল্পভাষাগুলির মধ্যে সেটিকেই বেছে নেয়, যার দ্বারা কৃতিটি আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে সংকেতাবদ্ধ। পরিচিত সংকেত প্রণালীগুলির মধ্যে থেকে একটির এই নির্বাচনই তাথ্যিক সমৃদ্ধি সৃষ্টি করে। তথ্যের পরিমাণ অবশ্যই নগণ্য, কারণ পছন্দের পরিধি সর্বদাই তুলনামূলকভাবে পরিমিত।

(২) ব্যাপারটা বদলে যায় যখন শ্রোতা বা গ্রাহক স্রষ্টা ব্যবহৃত সংকেত প্রণালী থেকে পৃথক একটি সংকেত প্রণালীকে কৃতিটির মর্মোদ্ধারের প্রয়োজনে প্রয়োগ করে। এখানেও সম্পর্কের দুটি ধরন সম্ভবপর ঃ—

ক. গ্রাহক কৃতিটির উপর নিজস্ব শিল্পভাষা আরোপ করে, তাতে করে কৃতিটি যেন পুনরায় সংকেতাবদ্ধ হয়, যা (কখনো কখনো) প্রেরকসৃষ্ট গ্রন্থনটিকে পর্যন্ত বিপর্যস্ত করে ফেলে। যে তথ্যটি গ্রহণের জন্য গ্রাহক তৎপর তা তখনও একটি বার্তারূপেই তার পূর্বজ্ঞাত ভাষায় বিধৃত। এক্ষেত্রে একটি শৈল্পিককৃতিকে ব্যবহার করা হচ্ছে যেন তা অশৈল্পিক।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

খ. গ্রাহক পরিচিত সূত্রাবলীর সহায়তায় বয়ানটিতে মনোযোগ প্রয়াসী, কিন্তু নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত যে, একটি নূতন সংকেত সৃষ্টির প্রয়োজন যা অদ্যাপি তার অজ্ঞাত। কৌতূহলোদ্দীপক কতগুলো প্রক্রিয়া অতঃপর ঘটে ধারাবাহিকভাবে। গ্রাহক প্রেরকের ভাষার সঙ্গে এক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তাতে পরাভব হতে পারে তার। লেখক বাধ্য করে পাঠককে তার ভাষা গ্রহণ করতে, যাকে সে আশ্রয় করে জীবনায়ণের উপায় রূপে। কার্যতঃ কিন্তু লেখকের ভাষা অন্তরায়ণের প্রক্রিয়ায় পাঠক-চেতনায় পূর্ব-সংগৃহীত ভাষা সমূহের সংযোগে বিকৃত ও সঙ্কর হয়ে ওঠে। এই সূত্রে একটি কঠিন সমস্যার উদ্ভব হয়। সংকরায়নের নিজস্ব বাছাই পদ্ধতি আছে। সাধারণভাবে বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞানের পাঠে যা একান্ত আবশ্যক, পাঠকের সাধারণ পদ্ধতির পর্যালোচনায় এক প্রধান ভূমিকা নিতে বাধ্য।

ঔৎসুক্যজনক অন্য একটি ব্যাপারও আছে; শিল্পকৃতির আকস্মিক ও প্রথাবদ্ধর অন্তর্গত পারস্পরিক সম্পর্ক প্রেরক ও গ্রাহকের ক্ষেত্রে পৃথক অর্থবহন করে। শৈল্পিকবার্তা একটি কৃতির অন্তর্গত, যা এই বার্তার মর্মোদ্ধারের প্রয়োজনে গ্রাহককে একটি সূত্র খুঁজে নিতে বাধ্য করে—সে নির্মাণ করে নেয় একটি মডেল বা আদর্শ প্রতিরূপ। এইভাবে অনেক পদ্ধতির উদ্ভব হতে পারে, যেগুলি কৃতিটির অনভিপ্রেত অংশগুলিকে একত্রিত করে এবং অর্থবহ করে তোলে। এইরূপে প্রেরক থেকে গ্রাহকে সংক্রমণের পথে আকরণের অর্থময় অংশগুলির পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। শিল্পকৃতির তথ্য সমাহারের জটিল ও স্বল্পালোচিত দক্ষতার এই হ'ল একটি দিক।

অনুবাদ ঃ বীরেন্দ্র চক্রবর্তী

শিল্পিত কৃতিতে সৃজনের অনিশ্চয়তা

একটি শিল্পিত বয়ানের সৃজনের অনিশ্চয়তার (entropy) পরিমাপ করার চেষ্টা করতে গিয়ে ক) লেখক ও পাঠকের ভাষা কিংবা সংকেত প্রণালীর সৃজনের অনিশ্চয়তা এবং খ) ভাষ্য বা সংকেত প্রণালীর বিভিন্ন স্তরের সৃজনের অনিশ্চয়তার পার্থক্যকে এক করে ফেলা আমাদের উচিত হবে না।

সমস্যাটির প্রথম অবতারণা করেন এ. এন. কোলমোগোরভ নামক একজন গবেষক আজকের কাব্যতত্ত্বে যাঁর অবদান অপরিসীম। তাঁর ছাত্ররা তাঁর কিছু সংখ্যক তত্ত্বের বিকাশ ঘটিয়েছেন এবং মোটের উপর এই তত্ত্বগুলি সাম্প্রতিক সোভিয়েট কাব্যতত্ত্বে ভাষা-সংখ্যাতাত্ত্বিক চর্চার গতিপথ স্থির করে দিয়েছে।

প্রথমে কোলমোগোরভ-এর অনুগামীরা ছন্দশাস্ত্রের মূল ধারণাগুলির সম্পূর্ণ বিধিবদ্ধ সংজ্ঞা নির্ণয়ের কাজ শুরু করেন। এরপর অ-কাব্যিক (অ-শৈল্পিক) বয়ানে কয়েকটি ছন্দালঙ্কারের উপস্থিতির সম্ভাবনা এবং মূল রাশিয়ান মাত্রাগুলির মধ্যেকার তারতম্য অনুসন্ধান করার জন্য বিস্তৃত পরিধির পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
হ'ল। মাত্রা-সংক্রান্ত এই হিসেবগুলো থেকে মূল পশ্চাদপদ এবং তা থেকে বিচ্যুতির পাশাপাশি দুই প্রস্থ বৈশিষ্ট্য ব্যতিক্রমহীনভাবে পাওয়া গেল (পশ্চাদপট রূপে সাধারণ ভাষাতাত্ত্বিক রীতি এবং একক ঘটনারূপে কাব্যিক বচন রাশিয়ান Iamb গড় সংখ্যাতাত্ত্বিক অনুপাত এবং বিভিন্ন শ্রেণীর উপস্থিতির সম্ভাবনা ইত্যাদি)। ফলত রকমারী কাব্যিক বচনের তথ্য বহনের সম্ভাবনার মূল্যায়ন করা সম্ভব হোল। কুড়ির দশকের ছন্দচর্চার পরিবর্তে এবং এই ধরনের অনুসন্ধান থেকে ছন্দের বিভিন্ন রূপের আধেয় মূল্য নিয়ে প্রশ্ন উঠল এবং সেই সঙ্গে তথ্য-তত্ত্বের প্রণালী দিয়ে এই আধেয়মূল্য পরিমাপের উদ্যোগ নেওয়া হ'ল।

স্বভাবতই এর থেকে কাব্যিক বচনের সৃজনের অনিশ্চয়তা [entropy] নিয়ে চর্চার সূচনা হ'ল। কোলমোগোরভ সিদ্ধান্ত করলেন যে ভাষার সৃজনের অনিশ্চয়তা (H) দুটি অংশ নিয়ে গঠিত : বাগর্থের ক্ষমতা (b_1)—নির্দ্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের কৃতিতে বাগর্থিক তথ্য প্রেরণে ভাষার ক্ষমতা ; এবং ভাষার নমনীয়তা (b_2)—সমপর্য্যায়ের কয়েকটি উপায়ে একই বিষয়বস্তু পৌঁছে দেবার সম্ভাবনা। স্পষ্টত এখানে b_2 হচ্ছে কাব্যিক তথ্যের উৎস। যে সব ভাষায় $b_2=0$, সেই সব ভাষা কবিতার উপাদান হিসেবে কোন কাজে আসে না, যেমন বিজ্ঞানের কৃত্রিম (প্র) ভাষা, সঙ্গত যুক্তিতে যেখানে সমার্থের সম্ভাবনা পরিহার করা হয়েছে। কাব্যিক বচন কৃতিতে একাধিক বিধি-নিষেধ আরোপ করে, যেমন অনুমোদিত ছন্দ, মিল, অভিধায়ক এবং শৈলীর প্রচলিত রীতিনীতি। এই সব বিধি-নিষেধের জন্য তথ্য বহন ক্ষমতার যে অংশ ব্যয় হয় (β দিয়ে এই অংশ বোঝান হচ্ছে), তা নিরূপন করার পর কোলমোগোরভ একটি বিধি প্রণয়ন করলেন : ঐ বিধি অনুসারে কাব্য সৃষ্টি কেবলমাত্র তখনই সম্ভব হয় যখন সীমাবদ্ধতার জন্য ব্যয়িত তথ্যের / পরিমাণ কৃতির নমনীয়তাকে ছাড়িয়ে যায় না ($\beta < h_2$)। যে ভাষায় $\beta \geq b_2$, সেই ভাষায় কাব্য সৃষ্টি অসম্ভব।

কাব্যিক বয়ানে, কৃতিতে তথ্য-তত্ত্বের প্রণালীগুলি প্রয়োগ করে কোলমোগোরভ যথার্থ অঙ্কে শৈল্পিক তথ্যের পরিমাপ সম্ভব করে তুলেছেন। তবে এই প্রসঙ্গে এই গবেষকের বিশেষ সাবধানবাণী আমাদের মনে রাখতে হবে—পরিসংখ্যান, তথ্য-তত্ত্ব ও সবশেষে Cybernetics প্রণালীগুলির উপর ভিত্তি করে কাব্যতত্ত্ব চর্চার এটা কেবলমাত্র প্রারম্ভিক পর্যায় ; তাই এর ফলাফলগুলি নিয়ে অতি উৎসাহ সম্পর্কে তিনি বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন—

"Cybernetics বিষয়ক গবেষণা কৃতিগুলিতে তৈরি শিল্পসৃষ্টির প্রক্রিয়াগুলিকে নিয়ে কম্পিউটরজাত প্রতিরূপ [Computer modeling] সম্পর্কিত অধিকাংশ উদাহরণ লক্ষণীয়ভাবে প্রাথমিক মানের (কম্পিউটর পরিচিত বিশ-ত্রিশটি সঙ্গীত থেকে স্বরলিপির চার-পাঁচ টুকরো নিয়ে সঙ্গীতের সঙ্কলন ইত্যাদি)। Cybernetics বহির্ভূত সাহিত্যে শিল্পসৃষ্টির রূপগত বিশ্লেষণের মান বহুদিন ধরেই খুব উঁচু। তথ্য-তত্ত্ব এবং Cybernetics এই সব আলোচনায় অনেক কিছু সংযোজন করতে পারে। কিন্তু Cybernetics বিষয়ক বিশেষজ্ঞরা যদি শিল্পকলায় আরো আগ্রহী হন এবং এ বিষয়ে আরো জ্ঞানার্জন করেন তবেই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
এই পথে যথার্থ অগ্রগতি সম্ভব।" (A. N. Kolmogorov, Zizn' i myslenie kat osobye formy suscestvovanija materii", O suscnosti Zizni (Moscow, 1964 : 54.)

কোলমোগোরভ মৌখিক শিল্পিত বয়ানের সৃজনের অনিশ্চয়তা [entropy] তিনটি মূল উপাদানে চিহ্নিত করেছেন : বয়ানের প্রদত্ত পরিসরে সম্ভাব্য আধেয় বৈচিত্র্য (এই বৈচিত্র্য নিঃশেষিত হলে সাধারণ ভাষাতাত্ত্বিক তথ্যের সৃষ্টি হয়) ; বৈচিত্র্যময় প্রকাশভঙ্গীতে একই আধেয় (এই বৈচিত্র্য নিঃশেষিত হলে সৃষ্টি হয় শৈল্পিক তথ্যসার) ; কোন ভাষার নমনীয়তার ক্ষেত্রে নিয়মানুগ বাধাগুলি যেগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর সৃজনের অনিশ্চয়তা [entropy] হ্রাস করে। এই বৈশিষ্টগুলির মৌলিক গুরুত্ব আছে।

এ সত্ত্বেও আজকের আকরণিক কাব্যতত্ত্বের অবস্থা থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে এই তিনটি উপাদানের মধ্যকার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি জটিল। কিছু সীমাবদ্ধ প্রথাগত নিয়মের যথাযথ গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়ে আমাদের প্রথমে মনে রাখতে হবে যে নির্দ্দিষ্ট আধেয় [.Prescribed content] প্রকাশের একটি সম্ভাব্য রূপভেদের মনোনয়ন থেকে কবিতার সৃষ্টির যে ধারণা (এবং এই ধারণাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার Cybernetic প্রতিরূপের ভিত্তি) তা কিছু পরিমাণে অতি-সরলীকৃত। যদি আমরা ধরেও নিই যে একজন কবি এই প্রক্রিয়াতে সৃষ্টি করেন (যা কদাচিৎ ঘটে) তাহলে কৃতির রচয়িতার কাছে ভাষার নমনীয়তার সৃজন অনিশ্চয়তা (h_2) নিঃশেষ হয়ে গেলেও প্রাপকের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে পারে। তাঁর কাছে অভিব্যক্তি আধেয় হয়ে দাঁড়ায় ; তিনি কাব্যিক বয়ানটিকে কয়েকটি সম্ভাবনার একটি রূপে না দেখে একমাত্র, অদ্বিতীয় বয়ান রূপে দেখেন। কবি জানেন তিনি অন্যভাবে লিখতে পারতেন ; পাঠকের কাছে নিখুঁত শিল্পসম্মতরূপে গৃহীত কোন বয়ানে কোন কিছুই আকস্মিক নয়। পাঠক তাঁর প্রকৃতিগত কারণে ধরে নেন যা লেখা হয়েছে তা ভিন্ন অন্য কিছু লিখতে পারা যেত না। সৃজনের (h_2) অনিশ্চয়তাকে দেখা হয় সৃজনের (h_1) অনিশ্চয়তা হিসেবে, বয়ানের পরিসরের মধ্যে যা বলা সম্ভব তার পরিধির প্রসার হিসেবে কবিতার প্রয়োজন অনুভব করে। পাঠক, গদ্যে যা প্রকাশযোগ্য পদ্যে তা বলার উপায় হিসেবে কবিতাটিকে না দেখে বরং কাব্যিক বয়ান ভিন্ন মূর্ত হয় না এমন বিশেষ সত্য উপস্থাপনার উপায় হিসেবে দেখেন। ভাষার নমনীয়তার সৃজনঅনিশ্চয়তা [The entropy of a language's flexibility] পরিবর্তিত হয় কাব্যিক আধেয় বৈচিত্র্যের সৃজন অনিশ্চয়তায় [entropy of the variety of poetic content]। এবং $H=h_1+h_2$ সূত্রটি $H=h_1+h_1'$ (সাধারণ ভাষাতাত্ত্বিক আধেয়-বৈচিত্র্য এবং বিশিষ্টভাবে কাব্যিক আধেয়) রূপ গ্রহণ করে। এটা ব্যাখ্যার চেষ্টা করা যাক।

আমরা বুঝতে পারি যে কোলমোগোরভের প্রতিরূপ ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনর্গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয় নি ; নিঃসন্দেহে এই প্রক্রিয়া স্বজ্ঞাত-ভাবে যে সব পথ ধরে এগোতে থাকে সেগুলো সংখ্যাতীত এবং নির্ণয় করা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দুরূহ। বরং তাঁর প্রতিরূপ ভাষার সেই সব সঞ্চয়ের একটা সাধারণ পরিকল্পনা বাতলে দেয় যেগুলি কাব্যিক তথ্য সৃষ্টি সম্ভব করে তোলে। বয়ানের আকরণ সম্পর্কে প্রেরকের দৃষ্টিভঙ্গী, কোন শিল্পিত বার্তার প্রতি প্রাপকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভিন্ন জাতের এই তর্কাতীত বিষয়ের আলোকে ঐ প্রতিরূপের ব্যাখ্যার চেষ্টা করা যাক।

ধরে নেওয়া যাক একজন লেখক একটি ভাষার বাগর্থ-প্রকাশ ক্ষমতার শেষ দেখার জন্য পরিকল্পিতভাবে কিছু একটা চিন্তা করলেন এবং ভাষার নমনীয়তা নিঃশেষিত হওয়ায় চিন্তাপ্রকাশের জন্য কিছু সমার্থবোধক অভিব্যক্তি বেছে নিলেন। মূল রচনার শব্দ অথবা বয়ানের অংশবিশেষের পরিবর্তে বাগর্থিক সমার্থজ্ঞাপক শব্দাবলী ব্যবহারের স্বাধীনতা লেখকের অবশ্যই আছে। যে শব্দগুলির পরিবর্তে প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি দেখার জন্য আমাদের প্রয়োজন শুধু লেখকদের পাণ্ডুলিপির খসড়াগুলো পরীক্ষা করে দেখা। পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্য ছবিটা অন্যরকম ; পাঠক তাঁর সামনে উপস্থাপিত বয়ানকে (যদি আমরা একটি নিখুঁত শিল্পকর্মের কথা বলি) একমাত্র সম্ভাব্য বয়ান বলে গণ্য করেন ; "গানের একটি কথাও বাতিল করা সম্ভব না।" পাঠকের কাছে বয়ানের একটি শব্দের পরিবর্তন আধেয়র পাঠান্তর নয় বরং নতুন একটি আধেয়। এই প্রবণতাকে যুক্তির শেষ কোঠায় নিয়ে গিয়ে আমরা বলতে পারি যে পাঠকের কাছে প্রতিশব্দ বলে কিছু নেই। পরিবর্তে, কোন ভাষার বাগর্থ প্রকাশ ক্ষমতা তাঁর কাছে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। কাব্যে এমন সব জিনিষ বলা যায় যা প্রকাশের কোন উপায় অ-কাব্যে নেই। একটি শব্দের শুধুমাত্র পুনরুক্তি একটি শব্দের মধ্যে তারতম্য সৃষ্টি করে। একটি ভাষার নমনীয়তা (h_2) এইভাবে "কাব্যিক আধেয়"র বিশেষ সৃজনের অনিশ্চয়তা [special entropy] সৃষ্টি করে বাড়তি বাগর্থবাহী ক্ষমতায় রূপান্তরিত হয়। কিন্তু কবি তো নিজেরও শ্রোতা এবং কবিতা লেখার সময় শ্রোতার চেতনা থেকে নিয়ন্ত্রিত হতে পারেন। তাহলে এখানে কোন বয়ানের সম্ভাব্য পাঠান্তরগুলো আধেয় হিসেবে তাঁর কাছে আর অভিন্ন থাকছে না ; তিনি ধ্বনিতত্ত্বে এবং মিলের মধ্যে বাগর্থ আরোপ করেন শব্দের ধ্বনি সামঞ্জস্য তাঁকে বয়ানের পাঠান্তর বিশেষ বেছে নেবার ইঙ্গিত দেয় ; ঘটনার বিকাশ স্বাধীনভাবে হতে থাকে এবং লেখকের ইচ্ছানুরূপ বলে আর মনে হয় না। আধেয়র দৃষ্টিকোণ থেকে বয়ানের সমস্ত খুঁটিনাটি দেখলে দেখা যাবে যে পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গী বিজয়ী হয়েছে। অন্য দিকে, পাঠক 'আপাত-লেখকের ভূমিকায় [authorial prospective] উন্নীত হতে পারেন (যে সব সংস্কৃতিতে কবিতার প্রচার সাধারণ্যে প্রবেশ করেছে এবং পাঠক নিজেও একজন কবি সেখানে এটা প্রায়শ ঘটে থাকে)। তিনি শিল্প নৈপুণ্যের তারিফ করতে শুরু করেন এবং $h_1 - h^2$র (বয়ানের সাধারণ ভাষাতাত্ত্বিক আধেয়কে কাব্যিক প্রতিবন্ধকগুলি দূর করার নিছক ওজর হিসেবে দেখা হয়) দিকে চালিত হন।

চরম ক্ষেত্রে, কবিতার ভাষায় কোন শব্দ অন্য যে কোন একটির প্রতিশব্দ হয়ে উঠতে পারে। Gvetaeva-র লেখা এই লাইনটা নেওয়া যাক : Tam net

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
tebja—inet—tebja [তুমি সেখানে নেই—না, তুমি নেই (সেখানে)]। এখানে net tebja সমার্থক নয়, বরং নিজের পুনরুক্তির বিপরীতার্থক। কিন্তু Voznesenskij-র spasite [রক্ষা] এবং spasibo [ধন্যবাদ] সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। কবি (সকল শিল্পীর মত) কোন অণুকাহিনী [Episode] বর্ণনা করার অতিরিক্ত কিছু করেন ; এই ঘটনা বহু সম্ভাব্য কাহিনী বিন্যাসের (Plots) একটি এবং এগুলি মিলিতভাবে বিষয়বস্তু ও দৃশ্য জগতের অখণ্ড বিশ্বজনীন সঙ্কলন বা একটি বিশ্ব সৃষ্টি করে। এই অনুকাহিনী সমগ্র বিশ্বের প্রতিরূপ হয়ে ওঠে ; নিজের অতুলনীয়তা দিয়ে অনুকাহিনীটি এই বিশ্বকে পূর্ণ করে এবং লেখকের অমনোনীত বাকি কাহিনী বিন্যাসগুলি পৃথিবীর অন্য আগন্তুকদের কাহিনী নয়, বরং একই বিশ্বের বিভিন্ন প্রতিরূপ। অর্থাৎ সেগুলি বয়ানে রূপান্তরিত অণুকাহিনীর সমধর্মী ঘটনাপুঞ্জ। সূত্রটি হয়ে দাঁড়ায় এই রকম : $H=h_2+h_2$, কিন্তু মূলত ভিন্ন হলেও যেমন "বক্তার ব্যাকরণ" এবং "শ্রোতার ব্যাকরণ" প্রত্যেক বচন-বাহকের চেতনায় সহাবস্থান করে তেমনি কবির দৃষ্টিকোণ পাঠরত শ্রোতাকে বিদ্ধ করে এবং পাঠকের দৃষ্টিকোণ কবির চেতনাকে বিদ্ধ করে। এমনকি কবিতা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকারের মনোভাবের প্রায় যথাযথ পরিকল্পনার একটি ছক তৈরী করা সম্ভব হবে যেখানে প্রাথমিক সূত্রটির কিছু পরিবর্তন প্রাধান্য পাবে।

লেখকের দুটি অবস্থান রয়েছে : তাঁর নিজের এবং পাঠক বা দর্শকের। শ্রোতার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য ; তিনিও দুটির যে কোন একটি স্থান গ্রহণ করতে পারেন, নিজের অথবা লেখকের। অতএব সমস্ত সম্ভাব্য অবস্থা হ্রাস করে চারটি উপাদানের গাণিতিক ছাঁচে দাঁড় করানো যেতে পারে।

প্রথম অবস্থা। লেখকের অবস্থিতি $H=h_2+h'_2$; পাঠকের $H=h_1+h'_1$। গ্রাহক (পাঠক অথবা সমালোচক) একটি রচনাকে "আধেয়" এবং "শিল্প কৌশলে" ভাগ করেন, শিল্পিত বয়ানের অন্তর্গত অ-শিল্পিত তথ্যে তিনি সবচেয়ে গুরুত্ব দেন। লেখক নিজের কর্তব্যকে শিল্পীর কর্তব্য হিসেবে দেখেন ; পাঠক লেখককে প্রধানত সাংবাদিক হিসেবে দেখেন এবং তাঁর রচনার মূল্যায়ন করেন সেই রচনার গতি-প্রকৃতির প্রতি নজর দিয়ে, কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হলো তা দেখে (Russkij Vestnik-এ প্রকাশ সূত্রে Turgenev-এর Fathers & Sons যেভাবে গৃহীত হয়েছিল), অথবা আলোচ্য বয়ান ছাড়াও লেখকের সামাজিক প্রতিষ্ঠার ওপর নির্ভর করে (Fret-এর প্রতিক্রিয়াশীল প্রবন্ধাবলী প্রকাশের পর ১৮৬০-এর প্রগতিশীল যুবসমাজ যে ভাবে তাঁর কবিতা গ্রহণ করেছিল)। এই অবস্থার খুব প্রাঞ্জল উদাহরণ হচ্ছে Dobroljubov-এর "উপযোগবাদী সমালোচনা"। [Utilitarian criticism]

দ্বিতীয় অবস্থা। লেখকের অবস্থিতি $H=h_2+h_2'$; পাঠকের $H=h_2+h_2'$। যে যুগের সংস্কৃতি মার্জিত শিল্পমণ্ডিত সে যুগে এই অবস্থার উদ্ভব হয় (যেমন, রেনেশ'াস, এবং প্রাচ্য সংস্কৃতির কোন কোন যুগ)। কবিতা বহুল প্রচলিত, প্রায় সমস্ত পাঠকই কবি। কবিতা প্রতিযোগিতা, কবিতার লড়াই অনুষ্ঠিত হয় (যেমন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পুরাকালে এবং ইউরোপ ও প্রাচ্যের মধ্যযুগের সংস্কৃতিতে)। পাঠক একজন রসবেত্তা হয়ে ওঠেন।

তৃতীয় অবস্থা। লেখক $H=h_1+b_1'$ অবস্থায় থাকেন, পাঠকের স্থান $H=h_1+h_1'$। লেখক নিজেকে প্রকৃতিবাদী বলে মনে করেন; যথাযথ বর্ণনার দ্বারা তিনি পাঠককে তথ্য সরবরাহ করেন। এভাবে বাস্তব নির্ভর, তথ্যমূলক সাহিত্য গড়ে ওঠে। লেখক প্রবন্ধ রীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। শৈল্পিকতা ('Artistiness') কথাটি ব্যবহার করলে এখানে 'সংক্ষেপন' ('preciosity') এবং 'নান্দনিকতা'রই ('aestheticism') একটা নঞর্থক অর্থদ্যোতনা বলে মনে হবে।

চতুর্থ অবস্থা। লেখকের অবস্থান $H=h_1+h_1$; পাঠকের $H=h_2+b_2'$। আপাতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও কবি এবং পাঠকের মধ্যে স্থান বিনিময় ঘটেছে। লেখকরা নিজের রচনাকে একটি দলিল, একটি বাস্তবনির্ভর বিবরণ হিসাবে দেখেন, অথচ পাঠকের অনুরাগ থাকে শিল্পরসের প্রতি। চরম ক্ষেত্রে, শিল্পের রীতিনীতি জীবনের উপর আরোপ করা হয়ঃ রোমান ক্রীড়াঙ্গণে গ্লাডিয়েটরদের যুদ্ধ; নাটকীয় ট্রাজেডির নিয়ম দিয়ে নিরো রোম প্রজ্বলনের বিচার করেনঃ পুশকিনের মতে Derzavin, Pugacev-এর অনুগামীদের একজনকে 'কাব্যিক কৌতূহলে' ফাঁসী দেন (Leoncavallo-র অপেরা I Pugliacci-তে দর্শকরা একটি যথার্থ ট্র্যাজেডি অতিনাটকীয় উপস্থাপনা হিসাবে দেখতে পান)। পুশকিন লিখেছেনঃ

> অনুভূতিহীন এক জনতা তাকিয়ে আছে কবির দিকে যেন রাস্তার কোন ফিরিওয়ালা; যদি কোন মর্ম্মস্পর্শী এক গভীর আর্তনাদ তিনি ভাষায় মূর্ত করে তোলেন আর তাঁর নিরানন্দ, তীক্ষ্ণ বেদনালব্ধ কবিতা যদি রহস্যময় শক্তিতে হৃদয়কে আঘাত করে, জনতা হাততালি দেয় বা প্রশংসাগুঞ্জন তোলে, অথবা কখনো কখনো অসম্মতিতে মাথা নাড়ায়।

উপরের সবকটি অবস্থাই হচ্ছে চরম এবং দেখা যাচ্ছে সেগুলি সাহিত্যের প্রতি পাঠকের মনোভাব নিয়ন্ত্রক উপলব্ধিজাত নিয়মের বিকৃতি ঘটাচ্ছে। সাহিত্যিক বয়ান সম্পর্কে লেখক ও পাঠকের মতামত নিয়ন্ত্রক দ্বান্দ্বিক প্রথার গোড়ার কথা হিসাবে ঐ অবস্থাগুলি আমাদের কৌতূহলী করে তোলে এবং চরম অবস্থায় বয়ানের গ্রন্থনের প্রকৃতি স্পষ্ট করে তোলে। প্রচলিত রীতিনীতি একটি ভিন্ন জিনিসঃ লেখক ও পাঠকের পদ্ধতিগুলি পৃথক, কিন্তু একটি অবিভাজ্য সাংস্কৃতিক সংকেত-প্রণালীরূপে সাহিত্যে দক্ষতা অর্জন করার জন্য লেখক ও পাঠক প্রত্যেকেই তাঁদের চেতনায় দুটি দৃষ্টিভঙ্গী যুক্ত করেন, যেমন কেউ একটি স্বাভাবিক ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে গিয়ে তাঁর চেতনায় সেই ভাষাতাত্ত্বিক গ্রন্থনগুলো যুক্ত করেন যা সংশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণের কাজ করে।

কিন্তু একটি গ্রাহক এবং প্রেরকের কাছে শিল্পিত বয়ান হচ্ছে বিভিন্ন সৃজনের অনিশ্চয়তা [entropy] নিঃশেষের অন্তিম ফসল, এবং ফলত ঐ শিল্পিত বয়ান তাদের প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন তথ্য বহন করে। একটি স্বাভাবিক ভাষার সৃজনের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অনিশ্চয়তা [entropy] যে কৌতূহলোদ্দীপক পরিবর্তনগুলো β সংখ্যা দ্বারা নিরূপিত হয় তা যদি আমরা অগ্রাহ্য করি তাহলে আমরা একটি শিল্পিত বয়ানের সৃজনের অনিশ্চয়তা [entropy of an artistic text] সূত্রটি এইভাবে প্রকাশ করতে পারি: $H = H_1 + H_2$ যেখানে $H_1 = h_1 + h_1'$ এবং $H_2 = h_2 + h_2'$। কিন্তু স্থূল অর্থে, H_1 এবং H_2 শেষপর্যন্ত কোন একটি প্রদত্ত স্বাভাবিক ভাষার সমগ্র শব্দভাণ্ডারকে সূচিত করে যার মধ্যে নিহিত রয়েছে এই ঘটনাটির ব্যাখ্যা: একটি শিল্পিত বয়ান তুলনামূলকভাবে একটি অশিল্পিত বয়ানের চেয়ে যথেষ্ট বেশি তথ্য বহন করে।

—অনুবাদ : আশিস্ রায়চৌধুরী

(JURIJ LOTMAN এর The Structure of The Artistic Text গ্রন্থ থেকে)

পাদটীকা—

সৃজনের অনিশ্চয়তা (ENTROPY) : তথ্য-তত্ত্বে (Theory of Information) Entropy বলতে বোঝায় Uncertainty of knowledge, জ্ঞানের অনিশ্চয়তা বা সৃজনের অনিশ্চয়তা।

সাইবারনেটিকস (CYBERNETICS) : বিজ্ঞানের যে শাখা বিভিন্ন তথ্যাবলীকে রূপান্তরিত করার ও নিয়ন্ত্রণ প্রণালীর সাধারণ নিয়মগুলির চর্চা করে। (ভ. গ্লুশকোভ, সাইবারনেটিক্স বলতে কি বোঝায়, অনুবাদ : অভিজিৎ পোদ্দার, মস্কো ১৯৮৬)।

—সম্পাদক

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রোমান য়াকোবসন এবং ক্লোদ লেভি স্ট্রাউস

শার্ল্ বোদল্যেয়রের 'লে শা' ('Les Chats')*

Les amoureux fervents et les savants austères
Aiment également, dans leur mûre saison,
Les chats puissants et doux, orgueil de la maison,
Qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires.

Amis de la science et de la volupté,
Ils cherchent le silence et l'horreur des ténèbres ;
L'E'rèbe les eût pris pour ses coursiers funèbres,
S'ils pouvaient au servage incliner leur fierté,

Ils prennent en songeant les nobles attitudes,
Des grands sphinx allongés au fond des solitudes,
Qui semblent s'endormir dans un rêve sans fin ;

Leurs reins féconds sont pleins d'étincelles magiques,
Et des parcelles d'or, ainsi qu'un sable fin,
E'toilent vaguement leurs prunelles mystiques.

শাঁফ্লরির (Champfleury) সাহিত্যিক নিবন্ধ Le Chat Trott-কে যদি বিশ্বাস করা যায়, যেখানে বোদল্যেয়রের এই সনেটটি প্রথম প্রকাশিত হয় (Le Corsaire ১৮৪৭ সালের ১৪ নবেম্বারের সংখ্যায়) তাহলে এটা লেখা হয়েছিল ১৮৪০ সালের মার্চ মাসে, এবং বিপরীত ব্যাখ্যা থাকা সত্ত্বেও, Le Corsaire এবং Les Fleurs du Mal-এর পাঠে শব্দে শব্দে মিল দেখা যায়।

মিলের সংগঠনে কবি মেনে চলেছে ক খ খ ক গ ঘ ঘ গ ঙঙ চ ছ চ ছ ছক (পুরুষ মিলকে দেখানো হয়েছে সাধারণ হরফে, প্রমীলা মিল মোটা হরফে)। মিলের এই পর্যায়কে তিনটে ভাগে ভাগ করা হয়েছে যেমন, দুটো চতুষ্পদী এবং একটি ষট্‌পদী, তা আবার দুটো ত্রিপদীর সমাহার, কিন্তু তা একটি একক হিসেবে প্রতিভাত, সনেটে মিলের বিন্যাসের এই নিয়ন্ত্রণ, গ্রামোঁর (Grammont) মতে 'ছয় ছত্রের প্রতি স্তবকে একই সূত্রের দ্বারা' গ্রথিত।

* L'Homme, II (1962), পৃ. 5—21

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আলোচ্য সনেটের মিল বিভাগ তিনটি বি-সম সূত্রের অনুসিদ্ধান্ত :

১. দুটো মিলযুক্ত চরণ কখনো পরপর আসতে পারে না ;

২. যদি দুটো পরস্পর সন্নিহিত ছত্রের মিলের তফাৎ হয়, তাদের মধ্যে একটিকে প্রমীলা অপরটিকে পুরুষ মিল হতেই হবে ;

৩. সন্নিহিত স্তবকের শেষে প্রমীলা এবং পুরুষ মিল পরস্পর স্থান বদল করে : $_{4}$sédentaires - $_{8}$fierté $_{14}$mystiques। ধ্রুপদী অনুশাসন অনুসারে প্রমীলা মিল সবসময় শেষ হবে একটি অনুচ্চারিত অক্ষরে এবং পুরুষ মিল শেষ হবে একটি পূর্ণ (উচ্চারিত) স্বরে। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর মিলের তফাৎ সমানভাবে রয়েছে বর্তমান উচ্চারণে যেখানে শেষের সঞ্চলের দুর্বল e অনুচ্চারিত থেকে যায়, সনেটের সমস্ত প্রমীলা মিলে শেষের পূর্ণোচ্চারিত স্বরধ্বনির পরে একটি ব্যঞ্জন ধ্বনি রয়েছে (austères - sédentaires, ténébres - funèbres, attitudes - solitudes, magiques-mystiques[১]); সমস্ত পুরুষ মিল শেষ হচ্ছে স্বরধ্বনিতে (saison - maison, volupté - fierté, fin-fin)।

মিলের শ্রেণীবিভাগ এবং ব্যাকরণগত বর্গের চয়নের মধ্যেকার সম্পর্ক সনেটের সংগঠনে ব্যাকরণ এবং মিল যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে সে দিকে বিশেষ জোর দিচ্ছে।

সমস্ত ছত্রই শেষ হচ্ছে বিশেষ্য স্থানীয় পদে—সত্ত্বাপদ (৮) অথবা বিশেষণপদ (৬)। সমস্ত সত্ত্বাপদই স্ত্রীলিঙ্গবাচক। আটটি ছত্রে শেষ বিশেষ্যপদ বহুবচনে, মিল প্রমীলা—সমস্তই দীর্ঘীভূত হচ্ছে প্রথানুগতভাবে একটি সঞ্চলের সাহায্যে অথবা বর্তমান উচ্চারণের স্বর-পরবর্তী একটি ব্যঞ্জনের সাহায্যে, সেখানে পুরুষ মিলের সংক্ষিপ্ত ছত্রসমূহ ছয়টি ক্ষেত্রেই শেষ হচ্ছে একবচনাত্মক বিশেষ্যপদে।

দুটি চতুষ্পদীতে পুরুষ মিল গঠিত হচ্ছে সত্ত্বাপদ দিয়ে এবং প্রমীলা মিল বিশেষণ পদ দিয়ে, ব্যতিক্রম হচ্ছে বীজ-শব্দ (mot clé) ténèbres, মিল নিচ্ছে funèbres-র সঙ্গে। আমরা কিছু পরেই আলোচ্য দুই ছত্রের মধ্যে সাধারণ সমস্যার সম্পর্কে ফিরে আসছি। দুটো ত্রিপদীর ক্ষেত্রে-প্রথম ত্রিপদীটির তিনটি ছত্রের তিনটিই শেষ হচ্ছে সত্ত্বাপদে, এবং দ্বিতীয়টির বিশেষণপদে। এভাবে, দুটো ত্রিপদীকে যুক্ত-করা মিল—এ কবিতায় সমধ্বনিমূলক মিলের একমাত্র উদাহরণ $_{11}$sans fin - $_{13}$sable fin—একটি পুরুষ বিশেষণকে স্ত্রীলিঙ্গবাচক সত্ত্বাপদের বিপরীতে উপস্থাপিত করছে এবং সনেটের পুরুষ মিলের মধ্যে এটাই একমাত্র বিশেষণ, এবং পুংলিঙ্গের একমাত্র উদাহরণ।

সনেটটি তিনটি জটিল বাক্য দিয়ে গঠিত, উদাহরণ স্বরূপ দুটো চতুষ্পদীর প্রতিটি এবং দুটো ত্রিপদীর সমাহার শেষ হচ্ছে একটি পূর্ণচ্ছেদে। স্বাধীন অঙ্গবাক্য এবং সমাপিকা ক্রিয়াপদের সংখ্যা অনুসারে এই তিনটি বাক্য একটি গাণিতিক প্রগতির ধারা দেখাচ্ছে: একটি মাত্র ক্রিয়াপদ ক্রিয়ারূপ নিচ্ছে (aiment) ; ২. দুটো

১. M. Grammont, Petit traite de versification francaise (Paris 1908) পৃ. 8৬

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(cherchent, eût pris) ; ৩. তিনটি (prennent, sont, ètoilent)। অপর দিকে, এই তিনটি বাক্যের অস্বাধীন অঙ্গবাক্যে কেবলমাত্র একটি ক্রিয়াপদ ক্রিয়ারূপ নিচ্ছে : ১. qui···sont ; ২. s'ils pouvaient ; ৩. qui semblent।

সনেটটির তৃতীয় বিভাজন দুই-মিলের বাক্য এবং তিন-মিলের বাক্যের মধ্যে বৈপরীত্য সূচিত করছে। তা আবার সমীকৃত হচ্ছে একটি দ্বিভাজনের ফলে যা কবিতাটিকে দুটি জোড়া স্তবকে বিভক্ত করছে, তাহল, চতুষ্পদীর দুটি জোড় এবং ত্রিপদীর দুটি জোড়। কবিতার ব্যাকরণগত সংগঠনের থেকে সমর্থন পেয়ে এই দ্বিসম্ভাবী নিয়ম (principe binaire : binary principle) একটি বৈপরীত্য নির্দেশ করছে, এইবার তাহল, প্রথম ভাগের চার ছত্রের ও দ্বিতীয় ভাগের তিন ছত্রের মধ্যে, এবং দুটো প্রাথমিক উপবিভাগ অথবা চার ছত্রের স্তবক এবং তিন ছত্রের শেষের দুটো স্তবকের মধ্যে। এটা হচ্ছে দু ধরনের বিন্যাসের মধ্যে আতাতি (tension), এবং তাদের প্রতিসম এবং বি-প্রতিসম উপাদানের মধ্যে যে ভিত্তির ওপর সমস্ত কবিতাটি দাঁড়িয়ে আছে।

একদিকে চতুষ্পদী দুটো এবং অপরদিকে ত্রিপদী দুটোর মধ্যে একটি অন্বয়গত (বাক্যিক) সমান্তরবাদ লক্ষ করার মতো। প্রথম চতুষ্পদীটিতে এবং প্রথম ত্রিপদীটিতে দুটি অঙ্গবাক্য রয়েছে, যার মধ্যে দ্বিতীয়টি—সম্বন্ধবাচক, এবং দু ক্ষেত্রেই একই সর্বনাম qui দিয়ে তা শুরু হচ্ছে, অন্তর্ভুক্ত করছে স্তবকের শেষ পংক্তি, এবং বহুবচনাত্মক পুংলিঙ্গ সত্ত্বাপদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে, তা প্রধান অঙ্গবাক্যে পূরক হিসেবে কাজ করছে ($_3$Les chats, $_{10}$Des···sphinx)। দ্বিতীয় চতুষ্পদী (এবং সমভাবে দ্বিতীয় ত্রিপদীতে) দুটো সমানাধিকার (coordonnée : co-ordinate) অঙ্গবাক্য রয়েছে যার মধ্যে দ্বিতীয়টি, এইবার তা জটিল, স্তবকের শেষ দুটো ছত্রকে অন্তর্ভুক্ত করছে (৭-৮, এবং ১৩-১৪) এবং একটি সংযোজক দ্বারা যুক্ত অস্বাধীন অঙ্গবাক্যকে অন্তর্ভুক্ত করছে। চতুষ্পদীতে এই অঙ্গব্যাক্যটি ($_8$s'ils pouvaient : যদি তারা পারত) শর্তবাচক ; ত্রিপদীতে তুলনাত্মক ($_{12}$ainsi qu'un)। যেখানে প্রথমটি পরে বসছে, দ্বিতীয়টি সেখানে অপূর্ণ একটি অতিযুক্ত অঙ্গবাক্য।

Le Corsaire (১৮৪৭)-এর পাঠের সঙ্গে সনেটের বিরাম চিহ্নের ব্যবহার এই বিভাজনের সঙ্গে মিলছে। প্রথম ত্রিপদীটি শেষ হচ্ছে একটি পূর্ণচ্ছেদে, একইভাবে প্রথম চতুষ্পদীটিও। দ্বিতীয় ত্রিপদী এবং দ্বিতীয় চতুষ্পদীর শেষ দুটো ছত্রের আগে সেমিকোলোন বসছে।

ব্যাকরণগত কর্তার তাৎপর্যগত দিক এক দিকে দুই চতুষ্পদীর মধ্যে অপর-দিকে দুই ত্রিপদীর মধ্যে এই সমান্তরবাদকে সুদৃঢ় করছে।

I চতুষ্পদী সমূহ	II ত্রিপদীসমূহ
১. প্রথম	১. প্রথম
২. দ্বিতীয়	২. দ্বিতীয়

যেখানে প্রথম চতুষ্পদীটির এবং প্রথম ত্রিপদীটির কর্তা প্রাণীবাচক হিসেবে আখ্যাত হচ্ছে সেখানে দ্বিতীয় চতুষ্পদীটির দুটো কর্তার মধ্যে একটি এবং দ্বিতীয়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
ত্রিপদীটির সমস্ত ব্যাকরণগত কর্তাই হচ্ছে অপ্রাণীবাচক সত্ত্বাপদ :—$_7$L'E'rèbe (পাতালপুরী), $_{12}$Leurs reins (তাদের কটিদেশ), $_2$des parcelles (চোখের তারাসমূহ), $_{13}$un sable (একটি বালুকণা)। এই সমস্ত এভাবে-বলা অনুভূমিক সাযুজ্য থাকা সত্ত্বেও, আরেক রকমের সাযুজ্য রয়েছে যাকে বলা যায় উল্লম্ব তা দুটো চতুষ্পদীর সমাহারের সঙ্গে দুটো ত্রিপদীর সমাহারের বিপরীতে অবস্থান করছে, দুটো ত্রিপদীর সমস্ত মুখ্য কর্মই অপ্রাণীবাচক সত্ত্বাপদ $_9$les nobles attitudes (মহান্ ভঙ্গিমা) $_{11}$leurs prunelles (তাদের চোখের তারা), প্রথম চতুষ্পদীর একমাত্র মুখ্য কর্ম প্রাণীবাচক সত্ত্বাপদ ($_3$Les chats : বিড়ালেরা) এবং দ্বিতীয় চতুষ্পদীর কর্মসমূহ, অপ্রাণীবাচক সত্ত্বাপদের পাশাপাশি ($_6$le silence et l'horreur : নীরবতা এবং ভয়ালতা), সর্বনাম les-কে অন্তর্ভুক্ত করছে, এবং পূর্ববর্তী বাক্যের les chats (বিড়ালেরা)-কে বোঝাচ্ছে। কর্তা ও কর্মের সম্পর্কের দিক থেকে দেখতে গেলে, এই সনেটটি দুরকম সাযুজ্য (correspondance) নির্দেশ করছে যাকে বলা যেতে পারে কর্ণিক (diagonale : diagonal)। একটি অবরোহী কর্ণ দুটো বহির্বর্তী স্তবককে যুক্ত করছে (প্রথম চতুষ্পদীটি এবং শেষ ত্রিপদীটি) এবং অন্তর্বর্তী দুটো স্তবককে যুক্ত করা আরোহী কর্ণের বিপরীতে উপস্থাপন করছে। বহির্বর্তী স্তবকদুটোতে, কর্তা এবং কর্ম একই বাগর্থগত শ্রেণীর অংশ বিশেষ : প্রথম চতুষ্পদীতে প্রাণীবাচক (amoureux, savants - chats : প্রেমিকেরা, জ্ঞানীরা - বিড়ালেরা) এবং দ্বিতীয় ত্রিপদীটিতে অপ্রাণীবাচক (reins, parcelles, prunelles : কটিদেশ, খণ্ড, চোখের তারা)। বিপরীতপক্ষে, অন্তর্বর্তী স্তবকগুলোতে কর্ম কর্তার বিপরীত শ্রেণীতে রয়েছে; প্রথম ত্রিপদীটিতে অপ্রাণীবাচক কর্মের বিপরীতে রয়েছে প্রাণীবাচক কর্তা (ils [=chats]-attitudes), দ্বিতীয় চতুষ্পদীটিতে, সেই একই ভাবে (ils [=chats] - silence, horreur) প্রাণীবাচক কর্মের এবং অপ্রাণীবাচক কর্তার (E'rèbe - les [=chats]) সঙ্গে সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে।

এভাবে দেখা যাচ্ছে যে চারটে স্তবকের প্রতিটিই তার নিজস্বতা বজায় রাখছে : প্রাণীবাচক শ্রেণী যা প্রথম চতুষ্পদীতে কর্তা এবং কর্ম হিসেবে সাধারণভাবে উপস্থিত, প্রথম ত্রিপদীতে কেবলমাত্র কর্তা হিসেবে রয়েছে; দ্বিতীয় চতুষ্পদীটিতে এই শ্রেণী কর্তা অথবা কর্মকে সূচিত করছে, দ্বিতীয় চতুষ্পদীতে কোনোটাই নেই।

সনেটটির শুরু এবং শেষে ব্যাকরণগত সংরচনের অনেক বিশিষ্ট মিল রয়েছে। একদম শেষে, এবং শুরুতেও, অন্য কোথাও নয়, দেখা যাচ্ছে একটি বিধেয়ের সঙ্গে দুটি কর্তা এবং একটি মাত্র মুখ্য কর্ম। এই সমস্ত কর্তার এবং তাদের কর্মের প্রতিটিরই রয়েছে একটি নির্দেশক (Les amoureux fervents, les savants austères - Les chats puissants et doux ; des parcelles d'or, un sable fin - leurs prunelles mystiques), এবং সনেটের প্রথম এবং শেষ দুটো বিধেয়ই কেবলমাত্র ক্রিয়াবিশেষণের সঙ্গে রয়েছে, এই দুটোই বিশেষণ থেকে থেকে সাধিত এবং একে অপরের সঙ্গে স্বরধ্বনি সাম্যের দ্বারা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সম্পৃক্ত (: ₂*Aiment*, è*galement* - ₁₄*E'toilent*, *veguement* । সনেটের দ্বিতীয় এবং অন্ত্যপূর্ব বিধেয়দ্বয়ই কেবলমাত্র রয়েছে একটি সংযোজক ক্রিয়া এবং একটি বিশেষণ, এবং দুটি ক্ষেত্রে এই একটি অন্তর্গত মিল এই বিশেষণটিকে জোরাল করছে : ₄Qui comme *eux* sont fril*eux* ; ₁₂Leurs *reins* féconds sont pl*eins* । সাধারণভাবে বলতে গেলে, কেবলমাত্র দুটি বহির্বর্তী স্তবক বিশেষণে ঋদ্ধ : চতুষ্পদীটিতে নটি, এবং ত্রিপদীটিতে ৫টি, সেখানে অন্তর্বর্তী দুটি স্তবকে সাকুল্যে তিনটি মাত্র বিশেষণ (funèbres, nobles, grands) ।

আমরা আগেই লক্ষ করেছি, কেবলমাত্র কবিতার শুরুতে এবং শেষে কর্তা যে শ্রেণীর কর্মও সেই শ্রেণীর অন্তর্গত : প্রত্যেকটিই প্রথম চতুষ্পদীতে প্রাণীবাচক শ্রেণীতে রয়েছে, এবং দ্বিতীয় ত্রিপদীতে অপ্রাণীবাচক শ্রেণীতে । শুরুর স্তবকে প্রাণীবাচক সত্তা, তাদের কার্য, কর্মচাঞ্চল্য প্রাধান্য পেয়েছে । প্রথম ছত্রে বিশেষণ ছাড়া আর কিছুই নেই । এই বিশেষণের মধ্যে যে দুটি সত্ত্বাপদ কর্তা হিসেবে কাজ করছে—Les amoureux এবং les savants—তা দুটো ক্রিয়ামূলের অংশবিশেষ বলে প্রতিভাত হচ্ছে : পাঠ শুরু হচ্ছে এভাবে "তারা যারা ভালবাসে" এবং "তারা যারা জানে" । কবিতার শেষ ছত্রে, এর বিপরীতটাই ঘটছে ; বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত সকর্মক ক্রিয়া E'toilent, সত্ত্বাপদ থেকে সাধিত । পরেরটি অপ্রাণীবাচক এবং বস্তুবাচক বিশেষণাবলীর সঙ্গে সম্পৃক্ত যা এই ত্রিপদীতে প্রাধান্য পেয়েছে এবং একে আগের তিনটি অন্তর্বর্তী স্তবক থেকে আলাদা করে রাখছে । আলোচ্য অংশের এই ক্রিয়া এবং এই শ্রেণীর বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে পরিষ্কার সমধ্বনি লক্ষ্য করার মতো : / ᵋtes *l*ɔ / -ɛ/e de pars*ɛl*ɔ / - / etwa*l*ɔ / । পরিশেষে, এই দুই স্তবকের শেষের ছত্রে রয়েছে দুটি অস্বাধীন অঙ্গবাক্য, তার প্রতিটির মধ্যে রয়েছে একটি করে ক্রিয়া-বিশেষণ স্থানীয় তুমর্থ পদ, এই দুটো কর্ম-সম্প্রসারক সমস্ত কবিতার মধ্যে তুমর্থ পদের একমাত্র উদাহরণ : ₈S'ils pouvaient... incliner ; ₁₁Qui semblent s'endormir ।

আমরা আগেই দেখেছি, সনেটের দ্বিকল্প বিভাজন অথবা তিনটে স্তবকে বিভাজন, এর কোনোটাই সমমাত্রিক উপাদানের ভারসাম্যে পর্যবসিত হতে পারছে না । কিন্তু যদি এই চৌদ্দ পংক্তিকে দুটি সমানভাবে ভাগ করা হয়, কবিতার প্রথম অংশ শেষ হচ্ছে সপ্তম ছত্রে, এবং অষ্টম ছত্র সূচনা করছে দ্বিতীয় অংশের । অতএব এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে মধ্যবর্তী দুটি পংক্তি তাদের ব্যাকরণগত সংগঠনে বেশ স্পষ্টতই কবিতার বাকি অংশ থেকে বিশিষ্ট হয়ে থাকছে ।

বস্তুতঃ, অনেক বিষয়েই দেখা যাচ্ছে কবিতাটি তিনটে ভাগে বিভক্ত : এক্ষেত্রে মাঝের পংক্তিদ্বয় এবং দুটো সমমাত্রিক বিভাগ, অর্থাৎ কিনা এই পংক্তিদ্বয়ের পূর্ববর্তী ছয় পংক্তি এবং পরবর্তী ছয় পংক্তির দুটো ভাগ মনে হচ্ছে যেন দুটো ষট্পদীর মধ্যে দ্বিপদীর মতো দুটো ছত্রকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে ।

সমস্ত সনেটের মধ্যে ক্রিয়াপদের এবং সর্বনামের সমস্ত পুরুষবাচক রূপ, এবং ক্রিয়াবাচক অঙ্গবাক্যের কর্তা হচ্ছে বহুবচনে—ব্যতিক্রম সপ্তম পংক্তিটি—L'E'rèbe les eût pris pour ses coursiers funèbres (এরেবাস তাদের করতে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
পারত শবযাত্রার অশ্ব)—যেখানে একমাত্র নামবাচক বিশেষ্য রয়েছে, এবং তা একমাত্র উদাহরণ যেখানে সমাপিকা ক্রিয়া এবং তার কর্তা এই দুইই একবচনের রূপ নিচ্ছে। আরো লক্ষ করার বিষয়, এইটিই হচ্ছে একমাত্র পংক্তি যেখানে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম (ses) একবচন সূচিত করছে।

এই সনেটে একমাত্র প্রথম পুরুষই ব্যবহৃত হয়েছে : ক্রিয়ায় ব্যবহৃত একমাত্র কাল বর্তমান, ব্যতিক্রম সপ্তম এবং অষ্টম পংক্তি, যেখানে কবি একটি অবাস্তব উপাত্ত ($_8$S'ils pouvaient) থেকে উত্থিত একটি কল্পিত আচরণের ($_7$eût pris) সম্মুখীন হচ্ছেন।

প্রতিটি ক্রিয়াপদ এবং প্রতিটি সত্ত্বাপদের সঙ্গে একটি নির্দেশক (determinant) ব্যবহার করার একটি উচ্চাকিত প্রবণতা রয়েছে সনেটটিতে। প্রতিটি ক্রিয়াপদের সঙ্গেই রয়েছে একটি নিয়ন্ত্রিত পদ (terme régi) (সত্ত্বাপদ, সর্বনাম, তুমর্থ পদ) অথবা একটি বিশেষণ। সমস্ত ক্রিয়াপদই নিয়ন্ত্রণ করছে কেবলমাত্র সত্ত্বাপদকে ($_{2-3}$Aiment.. des chats : ভালবাসে···বেড়ালদের ; $_6$cherchent le silence et l'horreur : খুঁজে বেড়ায় নির্জনতা এবং ভয়ালতা, $_9$prennent..... les attitudes : নিচ্ছে······ভঙ্গিমা ; $_{14}$E'toilent...leurs prunelles : জলজ্বল করছে···তাদের চোখের তারা)। সপ্তম ছত্রে কর্ম হিসেবে ব্যবহৃত সর্বনামটিই একমাত্র ব্যতিক্রম : les eût pris।

নামবাচক সম্প্রসারণ ছাড়া যা এই সনেটে কখনো কোনো নির্দেশকের সঙ্গে ব্যবহৃত হয় নি, সত্ত্বাপদসমূহ (এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সত্ত্বাপদমূলক বিশেষণ) সর্বদাই বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হচ্ছে (উদাহরণ হিসেবে, $_2$chats puissants et doux) অথবা সম্প্রসারক দ্বারা (Amis de la science et de la volupté) বিশেষিত হচ্ছে। সপ্তম পংক্তি আবার একমাত্র ব্যতিক্রম হিসেবে হাজির : L'E'rèbe les eût pris।

প্রথম চতুষ্পদীর পাঁচটি বিশেষণের ($_1$fervents, $_1$austères, $_2$mûre, $_3$puissants, $_3$doux) এবং দুটো ত্রিপদীর ছটার ($_9$nobles, $_{10}$grands, $_{12}$féconds, $_{12}$magiques, $_{13}$fin, $_{14}$mystiques) মধ্যে সব কটাই গুণবাচক বিশেষণ, দ্বিতীয় চতুষ্পদীতে সপ্তম ছত্রের নির্দেশক বিশেষণ (coursiers funèbres) ছাড়া কোনো বিশেষণই নেই।

এখানেও এই পংক্তি প্রাণীবাচক-অপ্রাণীবাচক ক্রমকে পালটে দিচ্ছে, এই চতুষ্পদীর অন্য পংক্তিসমূহের কর্তা এবং কর্মের সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করে, এবং, বস্তুতঃ, সমস্ত সনেটটিতে অপ্রাণীবাচক-প্রাণীবাচক ক্রমকে গ্রহণ করার এটিই একমাত্র উদাহরণ।

দেখা যাচ্ছে অনেক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যই সপ্তম ছত্রটিকে অথবা দ্বিতীয় চতুষ্পদীটির শেষের দুটি ছত্রকে সনেটের বাকি অংশ থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। সে যাই হোক, এটা বলা প্রয়োজন যে সনেটের মধ্যবর্তী দ্বিপদীটিকে স্বতন্ত্র করে রাখার প্রবণতা বিকল্পীয় অপ্রতিসম সূত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ—যা একদিকে দ্বিতীয় চতুষ্পদীটির সমস্তটাই প্রথম চতুষ্পদীটির বিপরীতে রাখছে, অপরদিকে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অন্তিম ষট্পদীকে একইভাবে বিপরীতে রাখছে, এভাবে একটি মধ্যবর্তী স্তবক সৃষ্টি করছে, বহু বিষয়েই তা প্রান্তিক স্তবক থেকে আলাদা। আমরা আগেই মন্তব্য করেছি যে একমাত্র সপ্তম ছত্রেই উদ্দেশ্য এবং বিধেয় একবচনে, কিন্তু এই মন্তব্যকে বিস্তৃত করা যায়: একমাত্র দ্বিতীয় চতুষ্পদীর ছত্রসমূহ একবচনে রয়েছে—হোক না তা কর্তা অথবা কর্ম, এবং সেখানে সপ্তম ছত্রে কর্তার একবচনত্ব (L' E'rèbe)-কে বিরোধিতা করছে কর্মের বহুবচনত্ব (les), প্রতিবেশী ছত্রগুলো কর্তার জন্য বহুবচনকে এবং কর্মের জন্যে একবচনকে ($_{6}$Ils cherchent le silence et l'horreur ; $_{8}$S'ils pouvaient...incliner leur fierté) ব্যবহার করে এই সম্পর্ক পাল্টে দিচ্ছে। অন্য স্তবকে, কর্ম ও কর্তা এই দুই-ই হচ্ছে বহুবচনে ($_{1-3}$les amoureux . et les savants... Aiment...les chats ; $_{9}$Ils prennent . les attitudes ; $_{13-14}$Et des parcelles.. E'toilent . leurs prunelles)। এটা লক্ষ করতে হবে যে দ্বিতীয় চতুষ্পদীতে কর্তা ও কর্মের একবচনত্ব অপ্রাণীবাচকের সঙ্গে এবং বহুবচনত্ব প্রাণীবাচকের সঙ্গে সমাপাতিত হচ্ছে। বোদলেয়রের কাছে ব্যাকরণগত বচনের তাৎপর্য বিশেষ করে লক্ষণীয়, কারণ সনেটের মিলের ক্ষেত্রে তাদের বিপরীত সম্পর্ক একটি ভূমিকা পালন করছে।

আরো বলা যায় যে দ্বিতীয় চতুষ্পদীটি সংরচনের দিক থেকে কবিতার অন্য সমস্ত মিল থেকে আলাদা। দ্বিতীয় চতুষ্পদীটির প্রমীলা মিলগুলোর মধ্যে ténèbres - funèbres হচ্ছে একমাত্র উদাহরণ যা দুটো পৃথক পদকে একসঙ্গে নিয়ে আসছে। অধিকন্তু, সনেটের সমস্ত মিলই—আলোচ্য চতুষ্পদীটি ব্যতীত—এক বা একাধিক অভিন্ন স্বনিম (phoneme) দিয়ে গঠিত হচ্ছে, অব্যবহিত পূর্বে অথবা কিছু দূরে শ্বাসাঘাতমূলক সঞ্চলের (syllabe : syllable) পূর্বে অবস্থিত, সাধারণতঃ একটি অবলম্বী ব্যঞ্জন (consonne d'appui : supporting cansonant) দিয়ে তা জোরদার হচ্ছে : $_{1}$*savants* aus*t`eres* - $_{4}$sédent*a-ires*, $_{2}$*mû*re *saison* - $_{3}$*maison*, $_{9}$att*itudes* - sol*itudes*, $_{11}$*un* rêve *sans fin* - $_{13}$*un sa*ble *fin*, $_{12}$étinc*elles magiques* - $_{14}$prun*elles mystiques*। দ্বিতীয় চতুষ্পদীতে, $_{5}$volupté - $_{8}$fierté, অথবা $_{4}$té*n`ebres* - $_{7}$fu*n`ebres*, এই জোড় দুটির কোনোটাই প্রকৃত মিলের পূর্ববর্তী সঞ্চলের (syllabe : syllable) সঙ্গে কোনো সাযুজ্য দেখাচ্ছে না। অপরপক্ষে, সপ্তম এবং অষ্টম ছত্রের অন্তিম শব্দদ্বয় অনুপ্রাসমূলক : $_{7}$*f*unèbres - $_{8}$*f*ierté, এবং ষষ্ঠ ছত্র যুক্ত হচ্ছে পঞ্চম ছত্রের সঙ্গে : $_{6}$*té*nèbres $_{5}$volup*té*-র শেষ সঞ্চল, এবং $_{5}$*science* -$_{6}$- *silence*এর মধ্যেকার অন্তর্গত মিল পুনরাবৃত্ত করছে—দুটো ছত্রের মধ্যেকার যোগসূত্রকে দৃঢ় করছে। এ ভাবে মিলসমূহ নিজেরাই দ্বিতীয় চতুষ্পদীর দুই অর্ধের মধ্যের বন্ধনের এক রকমের শিথিলতাকে প্রত্যায়িত করছে।

সনেটটির ধ্বনিক কাঠামোয় নাসিক্য স্বরধ্বনি একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করছে। এই স্বরধ্বনিসমূহ যাদের সম্পর্কে গ্রামোঁ-র[১] মন্তব্য যথার্থ "যেন

১. M. Grammont, Traite' de phone'tique (Paris, 1930), পৃ. 384

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অনুনাসিকতা দ্বারা আচ্ছন্ন", প্রথম চতুষ্পদীতে বেশ বারংবারতা দেখিয়েছে (৯টি নাসিক্যধ্বনি, দুই থেকে তিনটি প্রতি চরণে) এবং বিশেষ করে শেষ ষট্পদীটিতে (২২টি নাসিক্যধ্বনি, প্রথম ত্রিপদীটি জুড়ে বারংবারতা আরোহীক্রমে—$_{9}$৩—$_{10}$৪—$_{11}$৬ : Qui *sem*blent s'*en*dormir d*an*s *un* réve s*an*s f*in*—এবং অবরোহীক্রম প্রবণতা দ্বিতীয়টি জুড়ে—$_{12}$৫, $_{13}$৩, $_{14}$১)। বিপরীতপক্ষে, দ্বিতীয় চতুষ্পদীটিতে কেবলমাত্র তিনটি রয়েছে, প্রতিটি চরণে একটি করে, সপ্তম চরণটি ব্যতিক্রম, সনেটের একমাত্র চরণ যেখানে কোনো অনুনাসিক স্বরধ্বনি নেই ; এবং এই চতুষ্পদীটি হল একমাত্র স্তবক যার পুরুষ মিলে কোনো অনুনাসিক স্বরধ্বনি নেই। দ্বিতীয় চতুষ্পদীতেই ধ্বনিক প্রাধান্যের ভূমিকা স্বরধ্বনি থেকে ব্যঞ্জন স্বনিমে চলে যাচ্ছে, বিশেষ করে তরল ধ্বনির ক্ষেত্রে। এই তরল ধ্বনি দ্বিতীয় চতুষ্পদীটিতেই বেশি সংখ্যায় দেখা যাচ্ছে, সাকুল্যে ২৩টি, তুলনীয় প্রথম চতুষ্পদীতে ১৫টি, প্রথম ত্রিপদীতে ১১, দ্বিতীয়ে ১৪। /r/ স্বনিমের সংখ্যা /l/ স্বনিমের তুলনায় কিছু বেশি চতুষ্পদীদ্বয়ে, কিছু কম ত্রিপদী দুটোয়। সপ্তম চরণে যেখানে দুটোমাত্র /l/ রয়েছে, সেখানে ৫টা /r/ ; বলতে গেলে, সনেটের যে কোনো চরণ থেকে বেশি : L' E'*r*èbe les eût p*r*is pour ses cou*r*siers funèb*r*es। গ্রামোঁ র[১] মতানুসারে এখানে স্মরণ করা যেতে পারে এটাই হচ্ছে /r/-এর সঙ্গে /l/-এর বৈপরীত্য "যা এমন একটি ধ্বনির ধারণা দেয় তা কর্কশ নয়, ঘৃষ্য নয়, পরুষও নয়, অধিকন্তু তা বহতা, চলন্ত, স্বচ্ছ।"[১]

সমস্ত /r/ স্বনিমের আপাতিক প্রকৃতি এবং নির্দিষ্ট করে ফরাসি /r/ স্বনিমের প্রকৃতি, /l/-স্বনিমের পর্দায় দ্রুত ওঠানামার (glissando) সঙ্গে তুলনা করে পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে শ্রীমতী দুরাঁ-র এই দুই তরল ধ্বনির সম্পর্ক ত সাম্প্রতিক শ্রুতি তরঙ্গগত সমীক্ষায়।[২] /l/-স্বনিমের কাছে /r/ স্বনিমের সমাহার উচ্চকিতভাবে অভিজ্ঞানী (empirique) বিড়ালদের তাদের অলৌকিক উত্তরণের পথ অনুসরণ করছে।

সনেটটির প্রথম ছটি চরণ একটি পৌনঃপুনিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা যুক্ত : সমশ্রেণীভুক্ত একজোড়া প্রতিসমপদ একই সংযোজক পদ *et* দ্বারা যুক্ত : $_{1}$*Les amoureux fervents et les savants austère s*; $_{3}$*Les chats puissants et doux* ; $_{4}$*Qui comme eux* so*nt* *frileux et comme eux* s*edentaires* ; $_{6}$*Amis de la science et de la volupté* নির্দেশক সমূহের দ্বিসম্ভাবিতা (binarisme : binarism) পরবর্তী ছত্রের নির্দিষ্টের সঙ্গে এভাবে একটি বিপ্রতীপ অলঙ্কার গঠন করেছে—*le silence et l'hoorreur des té'n'èbres*—যা এ সমস্ত দ্বি-সম্ভাবী সংবচনের অবসান ঘটাচ্ছে। এই 'ষটপদী'র সমস্ত চরণেই সামান্য এই সংরচন (construction) কবিতার বাকি অংশে আর ফিরে আসছে না। সংযোজক বিরহিত এই সন্নিহিতি একই নকশার

---

১. Traite' de phone'tique, পৃ. 388

২. M. Durand, "La specificite' du phon`eme. Application au cas de R/L", Journal de Psychologie, LXVII (1960), পৃ. 405-419.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রূপান্তরবিশেষ : $_2$*Aiment e'galement, dans leur mure saison* (সমান্তর ক্রিয়াবিশেষণমূলক সম্পূরক); $_3$*Les chats orgueil*··· (সমন্বিত সত্ত্বাপদ)।

সমশ্রেণীগত শব্দের জোড় এবং তাদের মিল (কেবলমাত্র সেগুলোই নয় যেগুলো বহির্ভূত এবং বাগর্থগত-সম্পর্ককে জোর দিচ্ছে, যেমন, $_1$*aust`ers-*$_4$*se'dentaires*, $_3$*saison* - $_4$*maison*, বিশেষ করে অন্তর্গত মিলও) সূচনার এই ছত্রসমূহকে দৃঢ়াপিনদ্ধ করতে সহায়তা করছে ($_4$*amoureux* - $_4$*comm-eux* - $_2$*frileux* - $_4$*comme eux*; $_4$*fervants* - $_1$*savants* - $_2$*e'gale-ments* - $_2$*dans* - $_3$*puissants* - $_5$*science* - $_6$*silence*। এভাবে, দেখা যাচ্ছে প্রথম চতুষ্পদীতে যেসব শব্দ পুরুষবাচক শব্দকে বৈশিষ্ট্য দিচ্ছে, তা হচ্ছে অন্ত্যানুপ্রাসমূলক শব্দ—ব্যতিক্রম মাত্র একটি $_3$*doux*। তিনটি চরণের আদিকে একটি বুৎপত্তিগত দ্বৈতরূপ যুক্ত করছে: *Les amoureux - Aiment - Amis*, ছয় পংক্তির এই ছদ্ম-স্তবকের ঐক্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা শুরু এবং শেষ হচ্ছে একটি দ্বিপদীতে, যাদের শ্লোকার্ধ মিল নিচ্ছে এভাবে: $_1$*fervents* - $_2$*`egal-ementes*; $_3$*science* - $_4$*silence*।

সনেটের শুরুর তিনটে চরণ নিয়ে গঠিত অঙ্গবাক্যের মুখ্য কর্ম—*Les chats* পরবর্তী তিন চরণের অঙ্গবাক্যসমূহের অন্তর্নিহিত কর্তা হচ্ছে ($_4$*Qui comme eux sont frileux*; $_6$*Ils cherchent le silence*), এই ষট্পদীকল্প বিভাগ দুটো ত্রিপদীকল্প বিভাগের খসড়া ব্যক্ত করছে। এই মধ্যবর্তী 'দ্বিচরণ'টি স্মরণ করছে বিড়ালদের রূপান্তরণ: সপ্তম পংক্তির (*L'E'r`ebe les eût pris*) কর্ম থেকে (এইবার অস্পষ্টভাবে) সমভাবেই অস্পষ্ট অষ্টম পংক্তির ব্যাকরণগত কর্তায় (*S'ils pouvaient*)। এই দিক থেকে অষ্টম পংক্তিটি বাক্যের সঙ্গে সমাপতিত হচ্ছে (*Ils prennent*)।

সাধারণভাবে, পশ্চাৎ-স্থিত অস্বাধীন অঙ্গবাক্যসমূহ, অস্বাধীন অঙ্গবাক্য এবং তারপরে আসা বাক্যের মধ্যে একরকমের উত্তরণ তৈরি করছে। এভাবে, নবম ও দশম পংক্তির নিহিত কর্তা "chats" একাদশ পংক্তির সম্বন্ধবাচক অঙ্গবাক্যে 'sphinx'-এর রূপকের উল্লেখে পরিবর্তিত হচ্ছে (*Qui semblent s'endor-mir dans un rêve sans fin*: যেমন এক অনন্ত স্বপ্নে বিলীন) এবং এর ফলে, এই পংক্তিকে সেই সমস্ত স্তবকের সঙ্গে যুক্ত করছে যা অন্তিম ত্রিপদীতে ব্যাকরণগত কর্তা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অনিশ্চয়তাবাচক প্রশব্দ, যা প্রথম দশটি পংক্তিতে একেবারেই নেই, সেইখানে ১৪টি নিশ্চয়তাবাচক প্রশব্দ রয়েছে। সনেটের শেষের চারটি পংক্তির মধ্যে মাত্র একবার রয়েছে।

এভাবে একাদশ এবং চতুর্দশ চরণের দুটি সম্বন্ধবাচক অঙ্গবাক্যের দ্ব্যর্থক উল্লেখের জন্যই শেষের চারটি পংক্তি আমাদের একটি কল্পিত চতুষ্পদীর উচ্চাবচতার আভাস দেয় যার সঙ্গে সনেটের প্রথম চতুষ্পদীটির একটি চমৎকার সাযুজ্য জাগিয়ে তোলে। অপরপক্ষে, অন্ত্য ত্রিপদীটির এমন একটি রূপগত সংরচন আছে যা সনেটের আদির তিনটি পংক্তিতে প্রতিফলিত হচ্ছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রাণীবাচক কর্তা কখনো সত্তাপদ দিয়ে প্রকাশ করা হয় নি বরং সনেটের প্রথম পংক্তিতে কখনো সত্তাবাচক বিশেষণ পদ দিয়ে (*Les ammoureux...les savants*) এবং পুরুষবাচক এবং সম্বন্ধবাচক সর্বনাম দিয়ে অন্যান্য অঙ্গবাক্য-গুলিতে। মানবিক সত্তা আবির্ভূত হচ্ছে কেবলমাত্র প্রথম অঙ্গবাক্যে, জোড়া কর্তা হিসেবে, সত্তাবাচক ক্রিয়ামূলক বিশেষণের সাহায্যে।

কবিতার শিরোনামে উল্লেখিত বিড়ালেরা (les chats) স্বনামে একবারই মাত্র আসছে—প্রথম অঙ্গবাক্যে মুখ্য কর্ম হিসেবে : ₁*Les amourenx···et les savants*··· ₂*Aiments*... ₃*Les chats* (প্রেমিকেরা···এবং পণ্ডিতেরা ভালবাসে ···বিড়ালদের)। কেবলমাত্র 'শা' (chats)-শব্দটি নয়, আদি শিসধ্বনি /S̃/ আসছে কেবলমাত্র একটি শব্দে : / il S̃erS̃ə /। এই (ধ্বনির দ্বিত্ব দিয়ে বিড়ালদের প্রাথমিক কাজ প্রকাশ করছে। কবিতার নায়কদের সঙ্গে জড়িত এই অঘোষ শিসধ্বনিটি সনেটের বাকি অংশে সযত্নে পরিহার করা হয়েছে।

তৃতীয় ছত্র থেকেই বিড়ালেরা নিহিত কর্তায় পরিণত হচ্ছে, এই হচ্ছে সনেটের অন্তিম প্রাণীবাচক কর্তা। কর্তা, কর্ম, বিশেষ্যবাচক সম্প্রসারকের ভূমিকায় ব্যবহৃত *chats*-এর বদলে পরিবর্ত সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে 6, ৪, 9*ils* 7*les*, ৪.12,14,*leur*(s), এবং সত্তাবাচক সর্বনাম *ils* এবং *les* কেবলমাত্র *les chats*-কেই নির্দেশ করছে। এই-সমস্ত অপ্রধান (ক্রিয়া বিশেষণবাচক) রূপ একমাত্র দুটো অন্তর্বর্তী স্তবকে (অর্থাৎ) দ্বিতীয় চতুষ্পদীতে এবং প্রথম ত্রিপদীতে আসছে। এর সমানুরূপ স্বাধীন পদ ₄*eux* (দুইবার) প্রথম চতুষ্পদীতে রয়েছে, এবং সনেটের কেবলমাত্র মনুষ্য চরিত্রকেই নির্দেশ করছে, অন্ত্য ত্রিপদীতে কোনো সত্তাবাচক সর্বনাম নেই।

সনেটের শুরুর অঙ্গবাক্যের দুটো কর্তার একটি মাত্র বিধেয় এবং একটি মাত্র কর্ম রয়েছে ; এভাবে *Les amourenx fervents et les savants austères* (ব্যগ্র প্রামকেরা এবং কঠিন পণ্ডিতেরা) শেষ হচ্ছে *dans leur mûre saison* (তাদের প্রৌঢ় ঋতুতে), একটি অন্তর্বর্তী সত্তায় তাঁদের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়ে, একটি প্রাণী যার মধ্যে রয়েছে দুটো মানবিক অথচ পরস্পর বিরোধী অবস্থার বিপরীত বৈশিষ্ট্য। দুই শ্রেণীর মানুষ এভাবে অপরের বিপরীত বর্গের ইন্দ্রিয়প্রবণ/বুদ্ধিপ্রবণ এবং বিড়ালদের মাধ্যমে মধ্যস্থতা সম্পাদন করছে যেহেতু, কর্তার ভূমিকা বিড়ালেরা ক্ষীণভাবে নিয়ে নিচ্ছে যারা একই সময়ে জ্ঞানী এবং প্রেমিক।

দুটো চতুষ্পদী বিষয়গতভাবে বিড়ালের চরিত্র উপস্থাপিত করছে, দুটো ত্রিপদী দেখাচ্ছে তার রূপান্তরণ। সে যাই হোক, দ্বিতীয় চতুষ্পদীটি প্রথমটি থেকে মৌলিকভাবেই এবং সাধারণভাবে আর সমস্ত স্তবক থেকে আলাদা। *ils cherchent le silence et l'horreur des ténebres* (তারা খোঁজে নির্জনতা এবং ভায়াল অন্ধকার)-এর দ্ব্যর্থক সূত্রায়ণ সনেটের সপ্তম চরণে একটি ভুল বোঝার সুযোগ দিচ্ছে, এবং পরবর্তী চরণে তা পরিত্যক্ত হচ্ছে। এই চতুষ্পদীর বিচ্যুত চরিত্র, বিশেষ করে শেষার্ধের, এবং আরো নির্দিষ্টকরে, সপ্তম ছত্রের ধন্দ সর্বতো-ভাবেই ব্যাকরণগত এবং ধ্বনিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত।

L'E'r`ebe-এর (পাতাল সন্নিহিত তমসাচ্ছন্ন প্রদেশ' 'অন্ধকারের ক্ষমতা'র

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

লাক্ষণিক পরিবর্ত, নির্দিষ্ট করে *Erebus*-এর, 'রাত্রির ভ্রাতা') এবং বিড়ালদের *l'horreur des ténèbres* (ভয়াল অন্ধকার)-এর প্রতি পক্ষপাতের বাগর্থগত সম্পর্ক, / *tenεbrə* / এবং / *erεbə* /-র মধ্যে ধ্বনিক সদৃশতা দ্বারা সমর্থিত কবিতার নায়ক বিড়ালদের *coursiers funèbres* (শবযাত্রায় অশ্বদের)-এর ভয়ঙ্কর কাজের সঙ্গে যুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে। *L'Érèbe les eut pris pour ses coursiers* (এরেবাস তাদের নিয়েছিল তাদের অশ্বদের জন্য)-এর মতো স্বচ্ছন্দছত্রে, এটা কী একটা ব্যর্থ প্রত্যাশা অথবা মিথ্যা স্বীকৃতি ? এই অংশটির তাৎপর্য যার সম্পর্কে সমালোচকেরা প্রশ্ন তুলেছেন[১] ইচ্ছাকৃতভাবেই দ্ব্যর্থক রয়ে গেছে।

প্রতিটি চতুষ্পদী এবং ত্রিপদী বিড়ালদের জন্য নূতন সত্তা খুঁজে বেড়াচ্ছে। যেখানে প্রথম চতুষ্পদীটি দু ধরনের মানবিক অবস্থার সঙ্গে বেড়ালদের জড়িত করছে, তাদের অহংবোধকে ধন্যবাদ, দ্বিতীয় চতুষ্পদীতে যে নূতন সত্তার প্রচেষ্টা রয়েছে, তা পরিত্যাগ করতে সফল হয়েছে, যা তাদের একটি প্রাণীবাচক অবস্থার সঙ্গে বিজড়িত করছে : পৌরাণিক কাঠামোয় অশ্ব যেমনভাবে উপস্থাপিত। সমস্ত কবিতার মধ্যে এটাই হচ্ছে একমাত্র একাত্মন যা পরিত্যক্ত হয়েছে। এই অংশের ব্যাকরণগত সংরচন পরিষ্কারভাবেই অন্যান্য স্তবকের সঙ্গে বৈপরীত্য দেখাচ্ছে, তার নিজস্ব চরিত্র প্রকট করছে : অবাস্তব অবস্থা, গুণবাচক অভিধার অভাব, নির্দেশকবিহীন অপ্রাণীবাচক একবচনের কর্তা প্রাণীবাচক বহুবচন কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

পরোক্ষে উল্লিখিত বিরোধাভাস (oxymores : oxymoron) স্তবকসমূহ যুক্ত করছে। ₈*S'ils pouvaient au servage incliner leur fierté*—কিন্তু তারা তা করতে 'পারছে' না (*ils ne 'peuvent' pas*), কারণ তারা বাস্তবিকই শক্তিধর। তারা নিষ্ক্রিয়ভাবেও একটি সক্রিয় ভূমিকা নিতে (*pris*) পারছে না, তাই তারা সক্রিয়ভাবেই একটি নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে (₉*prennent*), কারণ তারা ভীষণভাবেই অচঞ্চল (*sédentaire*)।

বিশাল স্ফিংক্সের জমকালো ভঙ্গিমা (₉noble attitudes Des grands sphinx)-র জন্য তাদের পূর্বনির্দিষ্ট করে রেখেছে। প্রসারিত স্ফিংক্স্ (sphinx allongés) এবং বিড়ালেরা যারা তাদের অনুধ্যানে (en songeant) অনুকরণ করছে, দুটো কৃদন্ত ক্রিয়ার মধ্যে যমকালংকার (paromomastique) দিয়ে যুক্ত হচ্ছে সনেটের ব্যবহৃত দুটো মাত্র কৃদন্ত ক্রিয়া : / ã s o<ã / এবং / alõ <e /। এটা মনে হচ্ছে যে বিড়ালেরা নিজেদের স্ফিংক্সের সঙ্গে একাত্ম করে ফেলেছে, যারা এর বদলে মনে হচ্ছে নিদ্রাচ্ছন্ন (₁₁semblent s'endormir), কিন্তু এই অলীক তুলনা, নিরুদ্যোগী বিড়ালদের এবং ব্যঞ্জনার্থে সকলে যারা তাদের মতো (₄comme eux) অতিপ্রাকৃত সত্তার অচলতার স্বীকরণ করে, এক রূপান্তরণের মর্যাদা লাভ করছে। বিড়ালেরা এবং

১. তুলনীয় L'Intermédiaire des chercheurs et des curieux, LXVII col. 338 et 509

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
মানুষেরা যারা তাদের সঙ্গে একাত্ম হচ্ছে, মানুষের মাথা এবং জন্তুর শরীর নিয়ে এক অলীক দানবে পুনর্মিলিত হচ্ছে। এভাবে এক পরিত্যক্ত পরিচয়, জায়গা করে দিচ্ছে এক সমভাবেই নোতুন পৌরাণিক পরিচয়কে।

বিড়ালেরা আবেশে ($_{9}$En songeant) বিশাল স্ফিংক্‌স্‌ grands sphinx-এর সঙ্গে একাত্ম হতে সফল হচ্ছে। যমকের একটি মালা, বীজ শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এবং অনুনাসিক স্বরধ্বনির সঙ্গে দন্ত্য এবং ওষ্ঠ্য স্পর্শধ্বনিকে সংযুক্ত করে, এই রূপান্তরণকে সুদৃঢ় করছে : $_{9}$en songeant / ã s õ …/- $_{10}$grands sphinx /… ãsfɛ̃ …/- $_{10}$fond / fõ /- $_{11}$semblent / sã … / s'endormir / sã … /- $_{11}$dã ns un. /…azœ / - $_{11}$sans fin / sã fɛ̃ /। উদাত্ত অনুনাসিক স্বরধ্বনি / ɛ̃ / এবং $_{10}$sphinx শব্দের অন্যান্য ধ্বনিগুলো অন্ত্যত্রিপদীতে বারবার ধ্বনিত হচ্ছে : $_{12}$reins /ɛ̃/- $_{12}$pleins/… /ɛ̃/ - $_{13}$étincelles /…ɛ̃ s…/- $_{13}$ainsi/ɛ̃s/ - qu'un sable/kœ̃ …/।

প্রথম চতুষ্পদীতে আমরা পড়ছি : Les chats puissants et doux, orgueil de la maison (শক্তিময় ও মধুর বিড়ালেরা গৃহের গর্ব)। এতে কী এটা বোঝানো হচ্ছে যে বিড়ালেরা যারা গৃহের গর্ব, তারাই কী সেই মূর্তিমান গর্ব অথবা এটা কি গৃহ যা মার্জারীয় আবাসিকের জন্যে গর্ব বোধ করছে এবং Erebus-এর মতো, তাদের পোষ মানাতে চাইছে ? সে যাই হোক না কেন, গৃহ ($_{3}$maison) প্রথম চতুষ্পদীতে বিড়ালেরদের সীমায়িত করে ফেলে একটি বিশাল মরুভূমিতে রূপান্তরিত হচ্ছে, fond des solitudes (নির্জনতার গভীরে), এবং শীতের ভয়, কাছে নিয়ে আসছে শীতল ($_{4}$frileux) বিড়ালদের এবং fervents (ব্যগ্র) প্রেমিক-দের (/ *fɛrvã* / এবং / *fril* /-র যমক লক্ষ্য করুন), স্ফিংক্সের চারপাশের উত্তপ্ত মরুভূমির (ব্যগ্র প্রেমিকদের মতো উত্তপ্ত) কঠোর নির্জনতার (পণ্ডিতদের মতো কঠোর) যথার্থ পরিবেশ পাচ্ছে। কালিক স্তরে $_{2}$mûre saison (পারিণত ঋতু),মিল নিচ্ছে $_{3}$la maison-র (গৃহ) সঙ্গে প্রথম চতুষ্পদীতে, এবং তাৎপর্যগতভাবে এর কাছে আসছে, প্রথম চতুষ্পদীতে একটি স্পষ্ট প্রতিরূপ খুঁজে পাচ্ছে : এই দুটো শ্রেণী স্পষ্টতই সমান্তরাল ($_{2}$dans leur mûre sai-son : তাদের পরিণত ঋতুতে এবং $_{T1}$dans un rêve sans fin : এক অনন্ত স্বপ্নে), একে অপরের বিপরীতে রয়েছে, একটিতে গোনাগুণতি দিনের হিসেব অপরটি শাশ্বতের কথা বলছে। সনেটের অন্যত্র কোথাও এমন সংরচন নেই যেখানে dans অথবা অন্য কোনো ক্রিয়াবিশেষণীয় উপসর্গ রয়েছে।

দুটো ত্রিপদীতে বিড়ালদের অলৌকিকত্ব প্রাধান্য পেয়েছে। সনেটের একে-বারে শেষে রূপান্তরণ উন্মোচিত। প্রথম ত্রিপদীতে মরুভূমিতে প্রসারিত স্ফিংক্সের প্রতিমূর্তি জান্তব এবং তার অশরীরী রূপের মধ্যে দোলাচল হচ্ছে, এবং পরবর্তী ত্রিপদীতে প্রাণীসত্তা বস্তুকণার পেছনে উধাও হয়ে যাচ্ছে। লক্ষণা অলঙ্কার বিড়াল-স্ফিঙ্কসকে তাদের শরীরের বিভিন্ন অংশ দিয়ে প্রতিস্থাপন করছে। $_{T2}$leur reins (তাদের কটিদেশ), $_{T4}$leurs prunelles (তাদের চোখের তারাসমূহ)। অন্ত্য ত্রিপদীতে অন্তর্বর্তী স্তবকদ্বয়ের নিহিত কর্তা আবার সম্পূরক

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হচ্ছে : বিড়ালেরা প্রথমে কর্তার নিহিত সম্পূরক হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে Luers féconds sont pleins—কিন্তু কবিতার শেষ অঙ্গবাক্যে, তাঁরা কর্মের একমাত্র নিহিত সম্পূরক হিসেবে রয়েছে : 14E´toilent vaguement leurs - prunelles (তাদের চোখের তারা - ক্ষীণভাবে জ্বলজ্বল করছে)। এভাবে দেখা গেছে বিড়ালেরা সনেটের অন্ত্য অঙ্গবাক্যের সকর্মক ক্রিয়ার কর্ম, অন্ত্যপূর্ব (অঙ্গবাক্যে) কর্তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, যা একটি বিশেষণমূলক অঙ্গবাক্য। এভাবে একদিকে যুগ্ম প্রতিবঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, একক্ষেত্রে বিড়ালদের সঙ্গে—সনেটের প্রথম অঙ্গবাক্যের মুখ্য কর্ম হিসেবে এবং অপরক্ষেত্রে, বিড়ালদের সঙ্গে,—দ্বিতীয় অঙ্গবাক্যের কর্তা হিসেবে, এটাও বিশেষণমূলক।

যেখানে সনেটের শুরুতে কর্তা ও কর্ম উভয়ই প্রাণীবাচক শ্রেণীর ছিল, অন্ত্য অঙ্গবাক্যের দুই পদের উভয়ই অপ্রাণীবাচক শ্রেণীতে রয়েছে। সাধারণভাবে, অন্ত্য ত্রিপদীর সমস্ত সত্ত্বাপদই একই শ্রেণীর বস্তুবাচক বিশেষ্য : T2reins (কটি), I2étincelles (ফুলকি), 13parcelles (কণা), I3or (সোনা), T3sable (বালু) T4prunelles (চোখের তারা) পূর্ববর্তী স্তবক সমূহে সমস্ত অপ্রাণীবাচক সংজ্ঞাই (appellatifs : appellatives) বিশেষ্যবাচক, সবকটিই বিমূর্ত বিশেষ্য 2saison (ঋতু), 3orgueil (গর্ব), 6silence (নির্জনতা), 6horreur (ভয়ালতা), 8servage (দাসত্ব), 8fierté (মর্যাদা), 9attitudes (ভঙ্গিমা) 1rêve (স্বপ্ন)। অন্ত্য অঙ্গবাক্যের কর্তা ও কর্মে উভয়তই দৃষ্ট অপ্রাণীবাচক স্ত্রীলিঙ্গ—13-14des parcelles d'or···E´toilent···leurs prunelles (সোনার কণা···জ্বলে ওঠে···চোখের তারায়)—আদ্য অঙ্গবাক্যের কর্তা ও কর্মের সাম্য ফিরিয়ে আনছে, উভয়ই প্রাণীবাচক পুংলিঙ্গ—1-2Les amoureux···et les savants···Aiment···Les chats (প্রেমিকেরা···এবং পণ্ডিতেরা···ভালোবাসে···বিড়ালদের)। সমস্ত সনেটে 13parcelles-ই (কণা) হচ্ছে একমাত্র স্ত্রীলিঙ্গ কর্তা—এটা একই পংক্তির শেষে পুংলিঙ্গের 13sable fin (সূক্ষ্ম বালু)-র সঙ্গে বিপরীত সম্পর্ক দেখাচ্ছে যা সনেটের পুরুষমিলের ক্ষেত্রে পুংলিঙ্গের একমাত্র-উদাহরণ।

শেষ ত্রিপদীতে, বস্তুর চরম কণা কালক্রমে কর্ম ও কর্তা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। একটি নূতন একাত্মন, সনেটের মধ্যে এটিই শেষতম, এ সমস্ত উজ্জ্বল কণাকে 13sable fin (কোমল বালুকণা)-র সঙ্গে সম্পৃক্ত করছে এবং তাদের নক্ষত্রে রূপান্তরণ করছে।

দুটো ত্রিপদীকে যুক্ত করেছে যে উল্লেখযোগ্য মিল তা হল সমস্ত সনেটের মধ্যে একমাত্র সমধ্বনিমূলক মিল, পুরুষ মিলের মধ্যে একমাত্র মিল যা বাক্যস্থ বিভিন্ন প্রকারের পদকে পাশাপাশি রেখেছে। দুটো মিল শব্দের মধ্যে কিছুটা অন্বয়গত সাম্য তৈরি করেছে, যেহেতু উভয়ই শেষ হচ্ছে অস্বাধীন অঙ্গবাক্যে, তাদের মধ্যে একটি পূর্ণ আর অন্যটি খণ্ডিত। পংক্তির শেষ সঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকা দূরের কথা, প্রতিবঙ্গ সমভাবে দুটো পংক্তির সমস্তটাকেই দৃঢ়ভাবে কাছে নিয়ে আসছে : TT/sã blə sã dərmir danz œ̃ rEvə sã fẼ / - 13/parsElə der

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Ẽsi kœ̃ sablə fẼ /। এটা কোনো দৈব ঘটনা নয় যে যথাযথভাবে এই মিল দুটো ত্রিপদীকে যুক্ত করে, আহ্বান করছে un sable fin (একটি কোমল বালুকে), এভাবে গ্রহণ করেছে মরুভূমির মোটিফকে যেখানে প্রথম ত্রিপদীটি বিশাল স্ফিংক্সের un rêve sans fin (একটি অনন্ত স্বপ্ন) উপস্থাপিত করছে।

$_{3}$La maison (গৃহ), বিড়ালদের আবদ্ধ করছে প্রথম চতুষ্পদীতে, অবলুপ্ত হচ্ছে প্রথম ত্রিপদীতে যেখানে মরু নির্জনতা বিরাজমান, বিড়াল-স্ফিংক্স্দের বাস্তব আবাস বিপর্যস্ত। এর বদলে, এই 'অন্-আবাস' বিড়ালদের মহাজাগতিক সমগ্রতায় স্থান করে দিচ্ছে (এরা, সনেটের সমস্ত চরিত্রের মতো সদাই বহুবচনাত্মক।) বলতে গেলে, তারা অন্-আবাসের আবাস হচ্ছে যেহেতু তারা তাদের চোখের তারায় অন্তর্গত করেছে মরুর বালি এবং তারার আলো।

কবিতার অন্তিম পর্ব প্রেমিকদের এবং পণ্ডিতদের আদ্য বিষয়বস্তু আবার গ্রহণ করেছে, সম্মিলিত হচ্ছে Les chats puissants et doux (দৃঢ় এবং কোমল বিড়ালদের) মধ্যে। মনে হচ্ছে দ্বিতীয় ত্রিপদীর প্রথম ছত্র দ্বিতীয় চতুষ্পদীর প্রথম ছত্রের উত্তর দিচ্ছে, বিড়ালেরা $_{5}$Amis···de la volupté (কামাসক্তের মিত্র), $_{12}$Leurs reins féconds sont pleins (তাদের উর্বর কটিদেশ পূর্ণ)। আমরা বিশ্বাস করতে প্রলুব্ধ হচ্ছি এর সঙ্গে প্রজনন ক্ষমতার যোগাযোগ আছে, কিন্তু বোদলেয়রের রচনা দ্ব্যর্থক সমাধানকে সানন্দে অভ্যর্থনা জানায়। এটা কী কোনো ক্ষমতা যা কটিদেশে নিবদ্ধ অথবা জন্তুর পশমের বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ ? সে যাই হোক না কেন, একটা 'মায়াবী' শক্তি তাদের মধ্যে আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় পংক্তিটি আরম্ভ হচ্ছে দুটো সমপার্শ্বস্থ সম্প্রসারক দিয়ে : $_{5}$Amis de la science et de la volupté (জ্ঞানের এবং কামের বন্ধু), এবং অন্ত্য ত্রিপদীটি কেবলমাত্র $_{1}$amoureux fervents (ব্যগ্র প্রেমিক) কেই নয়, সমানভাবে $_{1}$savants austères (কঠোর পণ্ডিত)-কে ও পরোক্ষে উল্লেখ করছে।

শেষের ত্রিপদীটি নিকট বাগর্থগত সম্পর্ক জোর দিতে মিল নিচ্ছে $_{12}$étincelles, $_{13}$parcelles d'or এবং বিড়াল - স্ফিংকসের $_{14}$prunelles-এর প্রত্যয়গুলোর সঙ্গে একদিকে, অন্যদিকে জন্তু থেকে উৎসারিত $_{12}$magiques (মায়াবী) স্ফুলিঙ্গ এবং তার $_{14}$mystiques (রহস্যময়) আন্তর আলোয় আলোকিত চোখের তারার মধ্যে, গূঢ় তাৎপর্যের জন্যে যা উন্মুক্ত। যেন রূপিম সমূহের সমার্থনকে উন্মোচন করতে, এই মিল, সনেটে একবার মাত্র অবলম্বী ব্যঞ্জন ব্যতীতই লব্ধ, এবং আদি / m / ধ্বনিমের অনুপ্রাস দুটো বিশেষণকে আরো কাছে টেনে আনছে। $_{6}$l'horreur des ténèbres (ভয়াল অন্ধকার) দ্বিগুণ ঔজ্জ্বল্যের কাছে অন্তর্হিত হচ্ছে। অন্ত্য স্তবকে এই ঔজ্জ্বল্য প্রতিফলিত হচ্ছে ধ্বনিক স্তরে নাসিক্য ধ্বনিতে উদাত্ত স্বরের ধ্বনিমের প্রাধান্যের ফলে। (৭টি তালব্য [সম্মুখ] বনাম ৬টি কণ্ঠ্য [পশ্চাৎ, স্বরধ্বনি] পূর্ববর্তী স্তবকে কণ্ঠ্য স্বরধ্বনি বিশাল সংখ্যাধিক্যে উচ্চস্থান অধিকার করে বসেছে (প্রথম চতুষ্পদীতে ১৬ বনাম ০, দ্বিতীয়ে ২ বনাম ১ এবং প্রথম ত্রিপদীতে ১০ বনাম ৫)।

সনেটের শেষে লক্ষণার প্রাধান্যের ফলে জন্তুর অংশবিশেষের পরিবর্তে সমগ্রটা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বোঝাচ্ছে, অন্যদিকে জন্তুটিই বিশ্বের পরিবর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে যার অঙ্গবিশেষ জন্তুটি, প্রতীকেরা যেন স্বেচ্ছাকৃতভাবেই অসম্পূর্ণতাকে হারিয়ে যেতে চাওয়াকে খুঁজে নিচ্ছে। নিশ্চয়ার্থক প্রশব্দ (article) পথ করে দিচ্ছে অনিশ্চয়ার্থক প্রশব্দকে, এবং ক্রিয়া বিশেষণ যা কবিকে দিচ্ছে ক্রিয়ার্থক রূপক—$_{14}$E'toilent vaguement (ক্ষীণভাবে জ্বলজ্বল করছে) বিস্ময়জনকভাবেই অন্ত্যপর্বের কাব্যসুষমা প্রতিফলিত করছে। ত্রিপদীসমূহ এবং অনুরূপ চতুষ্পদীসমূহের (অনুভূমিক সমান্তরালবাদ) সংহতি উল্লেখনীয়। প্রথম চতুষ্পদীর দ্বারা আরোপিত সংকীর্ণ স্থান ($_{8}$maison) ও কালের ($_{2}$mûre saison) প্রথম ত্রিপদীটি জবাব দিচ্ছে সীমার অপসারণ বা অপনয়ন দিয়ে ($_{10}$fond des solitudes, $_{11}$rêve sans fin) ; একইভাবে, বিড়ালদের দ্বারা বিচ্ছুরিত আলোর যাদু জয় করছে $_{6}$l'horreur des ténèbres (ভয়াল অন্ধকার), যা দ্বিতীয় চতুষ্পদীতে বিভ্রান্তিকর পরিণতি টানতে ব্যর্থ হয়েছে।

এখন, আমাদের বিশ্লেষণের কবিতাটির বিভিন্ন অংশ জুড়ে জুড়ে আমরা দেখাতে চেষ্টা করব কিভাবে কবিতাটির বিভিন্ন সুর যা আমরা আলোচনা করেছি মিশ্রিত হচ্ছে, একে অপরের পূরক হচ্ছে, অথবা সম্মিলিত হচ্ছে কবিতাটিকে একটি চূড়ান্ত বস্তুর চরিত্র দিতে।

শুরুতেই কবিতাটির বিভিন্ন অংশ অনেকভাবেই ভাগ করা যেতে পারে যা পারস্পরিকভাবেই নিখুঁত, যেমন ব্যাকরণগত দিক থেকে, তেমনি কবিতার মধ্যেকার বিভিন্ন অংশের ভেতরের বার্গথগত দিক থেকেও।

আমরা আগেই দেখিয়েছি কবিতাটির তিনটে অংশের সমানুরূপ তিনটে প্রাথমিক ভাগ রয়েছে, প্রতিটিই একটি পূর্ণচ্ছেদে শেষ হচ্ছে, যেমন দুটো চতুষ্পদী এবং দুটো ত্রিপদীর সমাহার। প্রথম চতুষ্পদীটি বিষয়গত এবং স্থিতিশীল চিত্রের মাধ্যমে, একটি বাস্তব অবস্থা বা এরকমের কিছু উন্মোচন করছে। দ্বিতীয় চতুষ্পদীটি বিড়ালদের ওপর একটি উদ্দেশ্য আরোপ করছে যা E'rèbe-এর শক্তিমত্তার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়, এবং E'rèbe-এর শক্তিমত্তার কাছে, বিড়াল সম্বন্ধীয় একটি উদ্দেশ্য যা তারা (বিড়ালেরা) প্রত্যাখ্যান করছে। এভাবে এই দুই অংশে বিড়ালদের দেখা হচ্ছে বাইরে থেকে, প্রথমে নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে থেকে, যার প্রতি প্রেমিক এবং পণ্ডিতজনেরা বিশেষ করে সংবেদনশীল, অন্যত্র, E'rèbe-এর কর্মতৎপরতা শক্তিমত্তার দ্বারা উপলব্ধ। বিপরীতভাবে সনেটের শেষ অংশে বিড়ালদের দ্বারা সক্রিয়ভাবে ধৃত নিষ্ক্রিয়তাকে স্বীকার করে, এই বৈপরীত্য অতিক্রম করা হচ্ছে, তা আর বাইরে থেকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে না, হচ্ছে ভেতর থেকে।

একটি দ্বিতীয় বিভাগ দুটো ত্রিপদীর সমাহারের সঙ্গে দুটো চতুষ্পদীর সমাহারকে বিপরীতে উপস্থাপন করতে আমাদের সমর্থ করছে, একই সঙ্গে প্রথম ত্রিপদীটির এবং দ্বিতীয় চতুষ্পদীটির সঙ্গে দ্বিতীয় ত্রিপদীটির একটি নিকট সম্পর্ক উন্মোচন করছে। বস্তুতঃ,

১. দুটো চতুষ্পদীর সমষ্টি দুটো ত্রিপদীর সমষ্টির বিরোধী এই অর্থে যে শেষেরগুলো পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিকোণ খারিজ করে দিচ্ছে (amou-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

reux, savants, l'E'rèbe-এর শক্তিমত্তা), এবং সমস্ত স্থান-কালের গণ্ডির বাইরে বিড়ালদের সত্তাকে উপস্থাপিত করছে।

২. প্রথম চতুষ্পদীটি স্থান-কালের সীমা সূচনা করছে (maison, saison) এবং প্রথম ত্রিপদীটি তাদের অবলুপ্ত করে দিচ্ছে (au fond des solitudes, rêve sans fin)।

৩. দ্বিতীয় চতুষ্পদীটি বিড়ালদের নিরূপিত করছে অন্ধকার অনুসারে যার মধ্যে তারা নিজেদের উপস্থাপিত করছে, দ্বিতীয় ত্রিপদীটি আলো অনুসারে, যা তারা বিচ্ছুরিত করছে (étincelles, étoiles)।

পরিশেষে একদিকে পূর্ববর্তীটির ওপর একটি তৃতীয় বিভাগ অতিযোজনা করা হয়েছে। এইবার আদ্য চতুষ্পদীটি ও অন্ত্য ত্রিপদীটিকে, এইবার বিপ্রতীপ অলংকারের সাহায্যে অন্যদিকে অন্তর্বর্তী স্তবকগুলোকে (অর্থাৎ) দ্বিতীয় চতুষ্পদী এবং প্রথম ত্রিপদীটিকে পুনর্বিভাগ করে: প্রথম বিভাগে, স্বাধীন অঙ্গবাক্য-সমূহ বিড়ালদের সম্পূরকের ভূমিকা দিয়েছে সেখানে অন্য দুটি স্তবক, শুরু থেকেই, বিড়ালদের কর্তার ভূমিকায় বসিয়েছে।

এখন এইসব রূপমূলক অবস্থান সম্বন্ধী ঘটনার স্পষ্টতই একটি বাগর্থগত ভিত্তি আছে। প্রথম চতুষ্পদীটির আরম্ভ বিড়াল এবং পণ্ডিত বা প্রেমিকদের একই ঘরে নৈকট্যের দ্বারা উপস্থাপিত করা হয়েছে। এই সন্নিহিতি থেকে একটি যুগ্ম সাদৃশ্য বেরিয়ে আসছে (comme eux, comme eux)। একইভাবে, অন্ত্য ত্রিপদীতেও একটি সন্নিহিতির সম্পর্ক সাদৃশ্য বেরিয়ে আসছে, কিন্তু প্রথম চতুষ্পদীতে যেখানে গৃহের ভিতরের মার্জারীয় এবং মানবীয় আবাসিকের লক্ষণাগত সম্পর্ক তাদের রূপকাত্মক সম্পর্ককে জোর দিচ্ছে সেখানে অন্ত্য ত্রিপদীতে এই অবস্থা যেন অন্তর্বর্তী রূপ পাচ্ছে: সন্নিহিতির সম্পর্ক যথার্থ metonymy-এর চেয়ে বরং লক্ষণার (synechdoche) ওপর নির্ভর করছে। বিড়ালের দেহের অংশ সমূহ (reins, prunelles) নাক্ষত্রিক এবং মহাজাগতিক বিড়ালের একটি রূপকাত্মক আহ্বান প্রস্তুত করছে, সংযুক্ত করছে স্পষ্টতা থেকে অস্পষ্টতায় (également - vaguement) উত্তরণ। অন্তর্বর্তী স্তবকসমূহের মধ্যেকার সাদৃশ্য সমার্থনের সম্পর্কের ভিত্তিতে রচিত, দ্বিতীয় চতুষ্পদীতে এটি পরিত্যক্ত হয়েছে (বিড়ালেরা এবং coursiers funèbres শবযাত্রার অশ্বেরা) অপরটি গৃহীত হয়েছে প্রথম ত্রিপদীতে (বিড়ালেরা এবং grands sphinx বিশাল স্ফিংক্স্। প্রথম ক্ষেত্রে (বিড়ালদের এবং, E'rèbe-এর মধ্যে), সন্নিহিতির অস্বীকৃতিতে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, au fond des solitudes (নির্জনতার গভীরে) বিড়ালদের প্রতিষ্ঠার মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আগেরটির বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও, সমার্থনের সম্পর্ক যা সাদৃশ্যের একটি দৃঢ়ীকৃতরূপ (এভাবে একটি রূপকাত্মক পদক্ষেপ), সন্নিহিতির সম্পর্কে (এভাবে লক্ষণাত্মক), উত্তরণ ঘটছে, হোক না তা ঋণাত্মক বা ধনাত্মক।

এ পর্যন্ত কবিতাটি আমাদের সমার্থনের তন্ত্র হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে যা একে অপরের মধ্যে খাপ খেয়ে যাচ্ছে, এবং যা সামগ্রিকভাবে একটি বদ্ধ তন্ত্রের চরিত্র নিয়ে হাজির হচ্ছে। কবিতাটিকে বিচার করার শেষ আরেকটি দিক

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
আছে যার দ্বারা মনে হবে কবিতাটি চেহারা নিচ্ছে একটি মুক্ত তন্ত্রের প্রথম থেকে শেষ অবধি একটি চলমান প্রগতির ধারায়।

আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে এই আলোচনার প্রথম অংশে আমরা একটি বিষয়ে আলোকপাত করেছিলুম যে কবিতাটি মধ্যবর্তী একটি দ্বিচরণ দ্বারা দু'টি ষট্‌পদীতে বিভক্ত যার গঠন বাকি অংশের সঙ্গে ভীষণভাবেই বৈপরীত্যমূলক। এভাবে আমাদের আলোচনার সময়ে আমরা সাময়িকভাবে একে পাশে সরিয়ে রেখেছিলুম। অন্যদের মতো নয়, কারণ আমরা বুঝেছি যে এটাই প্রগতির ধারাকে চিহ্নিত করছে বাস্তবের ক্রম (প্রথম ষট্‌পদী) থেকে অধিবাস্তবের স্তরে (দ্বিতীয় ষট্‌পদী) এই উত্তরণ ঘটছে দ্বিচরণটির মাধ্যমে যা বাগর্থগত এবং রূপগত পুঞ্জায়নের সাহায্যে পাঠককে ক্ষণকালের জন্য দ্বিগুণ অবাস্তব বিশ্বে প্রলুব্ধ করে নিয়ে যাচ্ছে যেহেতু, প্রথম ষট্‌পদীর সঙ্গে বহির্গত চরিত্রের অংশভাগী হচ্ছে, এটি দ্বিতীয় ষট্‌পদীর পৌরাণিক চরিত্র প্রত্যাশা করছে :

১ থেকে ৬ পংক্তি	৭ এবং ৮ পংক্তি	৯ থেকে ১৪ পংক্তি
বহিঃস্থ		অন্তঃস্থ
অবেক্ষণগত	পৌরাণিক	
বাস্তব	অবাস্তব	অধিবাস্তব

চরিত্র এবং বিষয়-বস্তুর আকস্মিক দোলায়মানতা দ্বারা এই দ্বিচরণটি এমন একটি ভূমিকা পালন করছে সাঙ্গীতিক রচনায় যাকে modulation (স্বর-সংক্রম) বলা হয় তাকে মনে না করিয়ে দিয়েই পারে না।

এই modulation (স্বরসংক্রম)-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কবিতা শুরু থেকে রূপাত্মক এবং লক্ষণাত্মক প্রণালীর মধ্যে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট যে বৈপরীত্য রয়েছে তার সমাধান করা। অন্ত্য ষট্‌পদী প্রদত্ত সমাধান লক্ষণার অন্তঃস্থলে বৈপরীত্যকে স্থানান্তর করে অর্জিত হচ্ছে, সমস্তটাই রূপকাত্মক উপায়ে প্রকাশ করে। বস্তুতঃ দুটো ত্রিপদীর প্রতিটিই বিড়ালদের একটি বিপরীত ভাবমমূর্তি উপহার দিচ্ছে। প্রথম ত্রিপদীতে, প্রধানতঃ বিড়ালেরা গৃহে আবদ্ধ রয়েছে বলতে গেলে স্থানগত এবং কালগতভাবে যথাক্রমে সীমাহীন মরুতে এবং অন্তহীন নিদ্রায় উন্মুক্ত হবার জন্য। এই গতি হচ্ছে ভেতর থেকে বাইরে, একান্তবাসী বেড়াল, (তারা) মুক্ত। দ্বিতীয় ত্রিপদীতে দেখা যাচ্ছে বিড়ালদের দ্বারা সীমার বাধা ভাঙ্গা অন্তর্যায়িত হচ্ছে, এক মহাজাগতিক আয়তন লাভ করেছে, যেহেতু তাদের শরীরের কোনো কোনো অংশে (reins এবং prunelles) রয়েছে মরুভূমির বালি এবং আকাশের নক্ষত্র। দুটি ক্ষেত্রে, রূপান্তরণ ঘটেছে রূপকাত্মক প্রণালীর সাহায্যে। কিন্তু এই দুই রূপান্তরণের মধ্যে কোনো যথাযথ ভারসাম্য নেই : প্রথমটি আবার সদৃশভাবের কাছে (prennent...les.. attitudes...qui semblent sendormir) এবং স্বপ্নের কাছে (en songeant...dans un rêve...)' আবার ঋণী,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দ্বিতীয়টি যথাযথভাবেই শেষ করছে এই ধাপটি ধনাত্মক—, চরিত্রের দ্বারা (sont pleins... E'toilent), প্রথমটিতে বিড়ালেরা চোখ বুজছে স্বপ্ন দেখার জন্য, দ্বিতীয়টিতে তারা তা খুলে রেখেছে।

তাসত্ত্বেও, অন্ত্য ষট্‌পদীর এইসব রূপকের প্রাচুর্য বিশ্বের মাপে একটি বৈপরীত্যকে স্থান বিপর্যয় করাচ্ছে যা ইতিপূর্বে নিহিতভাবে কবিতার প্রথম চরণে সূত্রায়িত হয়েছে। "প্রেমিকেরা" এবং "জ্ঞানীরা" যথাক্রমে শব্দগুলোকে সম্মিলিত করছে যা তাদের মধ্যে আনছে একটি সংকুচিত অথবা প্রসারিত সম্পর্ক : প্রেমিক পুরুষ মিলিত হচ্ছে মানবীর সঙ্গে ; পণ্ডিত তেমনি বিশ্বের সঙ্গে ; দু রকমের সংযোগ, একটি অদূরের অন্যটি সুদূরের।[১] এটা হচ্ছে সেই সম্পর্ক যা অন্তিম রূপান্তরণ জাগিয়ে তুলেছে : স্থান ও কালে বিড়ালদের বিস্তারণ—বিড়ালদের সত্তার মধ্যে স্থান এবং কালের সংকোচন এবং আমরা আগেও লক্ষ করেছি। কিন্তু এখানে আবার এই দুটো সূত্রের মধ্যে সাম্য সম্পূর্ণ নয় ; শেষেরটি তার নিজের মধ্যে সমস্ত বৈপরীত্য নিয়ে আসছে ; উর্বর কটিদেশ স্মরণ করাচ্ছে প্রেমিকদের কামনা ("volupté"), যেমন চোখের তারা ("prunelles") পণ্ডিতদের জ্ঞান ("science"), "যাদু" ("magiques", একের সক্রিয় উত্তাপ বোঝাচ্ছে, "mystiques" (অলৌকিকত্ব) অপরের মগ্ন ভঙ্গিমা।

শেষ করার আগে দুটো কথা।

সনেটের সমস্ত ব্যাকরণগত কর্তার (নামবাচক বিশেষ্য) L'E'rébe ছাড়া) বহুবচনে, সমস্ত প্রমীলা মিলই বহুবচন দ্বারা গঠিত (সত্তাপদ solitudes-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত) এই ঘটনা বোদল্যেয়রের Foules এর কিছু অংশ দ্বারা কৌতূহলকরভাবে আলোকিত (যেন অন্যত্র সনেটের পুরোটাই) : "সমষ্টি, নির্জনতা : সক্রিয় এবং সৃজনশীল কবির কাছে কথাগুলো সমার্থক এবং পরিবর্তনযোগ্য...কবি এমন অতুলনীয় অধিকার ভোগ করেন যে ইচ্ছানুসারে দুটোই হতে পারেন, নিজে বা

---

১. ই. বাঁভেনিস্ত এই আলোচনার পাণ্ডুলিপি দেখতে ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন. তিনি আমাদের কাছে কিছু মন্তব্য করেছেন যে "ব্যগ্র প্রেমিকদের" ("les amoureux fervents") এবং "কঠোর পণ্ডিতদের" ("les savants austères") মধ্যে পরিণত ঋতু ("mure saison") একটি মধ্যবর্তী সম্পর্কের ভূমিকাও পালন করছে : বস্তুতঃ তা হল, তাদের "পরিণত ঋতু" যা বিড়ালদের সঙ্গে তাদের নিজেদের সমভাবে একাত্ম করার জন্য পুনর্মিলিত করছে। বঁভনিস্তের মতে, ' পরিণত ঋতু"তে "ব্যগ্র প্রেমিক" থাকার অর্থ সাধারণ জীবনের বাইরে জীবনযাপন করা. প্রবণতার দিক থেকে, সকলেই "কঠোর পণ্ডিতদের" মতো : সনেটের প্রারম্ভিক অবস্থা হচ্ছে পৃথিবীর বাইরের জীবন (তা সত্ত্বেও, পাতালপুরীর জীবন অস্বীকৃত), এবং তা বিকশিত, রূপান্তরিত হচ্ছে বিড়ালদের মধ্যে শীতল নিঃসঙ্গতা থেকে বিশাল নাক্ষত্রিক নির্জনতার দিকে যেখানে জ্ঞান এবং কামনা অসীম স্বপ্ন।

এই মন্তব্যের জন্যে আমরা লেখককে ধন্যবাদ জানাই, সমর্থনে Les Fleurs du Mal-এর অন্য একটি কবিতা থেকে উদ্ধৃত করতে পারি : "Le savant amour... fruit d'automne aux saveurs souveraines" (L'Amour du Mensonge) ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অপরে···সেই অবর্ণনীয় বৈচিত্র্য সেই সবকিছু দিয়ে দেওয়া আত্মার পবিত্র সমর্পণ, তার কবিত্ব দাক্ষিণ্য, সেই অপ্রত্যাশিতকে যা নিজেকে দেখায়, সেই অজ্ঞাতকে যা চলে যায় তার তুলনায় মানুষ যাকে প্রেম বলে তা খুবই ক্ষুদ্র, খুবই সংকীর্ণ, খুবই দুর্বল।"[১]

বোদলেয়রের সনেটে বিড়ালদের শুরুতে বিশেষিত করা হয়েছে "শক্তিমান এবং কোমল" (puissants et doux) হিসেবে, এবং অন্য পংক্তিতে তাদের চোখের তারাকে নক্ষত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। Crepet এবং Blin[২]— Sainte - Beuve-এর একটি পংক্তির সঙ্গে তুলনা করেছেন : "l'astre puissant et doux" (শক্তিমান এবং মধুর নক্ষত্র) (১৮২৯, এবং এই একই বিশেষণ Brizeux-র (১৮৩২) একটি কবিতায় আবার পাওয়া যায়, যেখানে নারীদের উদ্দেশ করে বলা হচ্ছে এভাবে : "Etres deux fois doués ! Etres puissants et doux !"(দ্বিগুণ কোমলসত্তা ! শক্তিময় এবং মধুর সত্তা !)

বোদলেয়রের ক্ষেত্রে এটা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছে—যদি তার কোনো প্রয়োজন থেকে থাকে—বিড়ালের ভাবমূর্তি নারীদের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে বিজড়িত, যা স্পষ্টভাবেই এই একই সংগ্রহের "Le chat" নামক অন্য দুটি কবিতায় দেখা যায়, উল্লেখ করা যেতে পারে "Viens mon beau chat, sur mon cœur amoureux" : "আমার সুন্দর বেড়াল আমার প্রেমিক হৃদয়ে এসো" (সনেটটি যার মধ্যে রয়েছে উন্মোচক এই পংক্তিটি "Je vois ma femme en espirit : আমি আমার প্রেয়সীর আত্মাকে দেখছি) এবং "Dans ma cervelle se promène...un beau chat, fort deux" (আমার হৃদয়ে ঘুরে বেড়ায় একটি সুন্দর বেড়াল শক্তিময় মধুর) কবিতাটিতে (যা দৃঢ়ভাবে প্রশ্ন করছে "est-il fée, est-il dieu ?" (তা কোনো পরী ? তা কী কোনো দেবতা ?) নারী এবং পুরুষের মধ্যে এরকম একটি দোলায়মান মোটিফ নিহিত রয়েছে 'Les Chats' কবিতায় যেখানে পুরোপুরি ইচ্ছাকৃত দ্ব্যর্থকতা দেখাচ্ছে (Les amoureux...Aiment . Les chats puissants et doux... ; Leurs reins féconds...)। Michel Butor যুক্তির সঙ্গেই বলেন, বোদলেয়রের কাছে : "এই দুই দিক : নারীত্ব এবং অতিমানবত্ব, একে অপরের থেকে দূরে থাকা দূরের কথা, এরা পরস্পর যুক্ত"।[৩] সনেটের সমস্ত চরিত্রই পুংলিঙ্গে, কিন্তু Les chats (বিড়ালেরা) এবং তাদের দ্বিতীয় সত্তা (alter ego), les grands sphinx (স্ফিংক্স্) অর্ধনারীশ্বর প্রকৃতির অংশীদার, সনেটের সমস্তটা জুড়ে তথাকথিত পুরুষ মিলের জন্যে আপাত বিরোধী স্ত্রীবাচক সত্তাপদ চয়ন করে এই দ্ব্যর্থকতাকে জোর দেওয়া

---

১. শা. বোদলেয়র, Oevres, খণ্ড II, Bibliliotheque de la Pleiade (পারি, ১৯৩৬), পৃ. 243 পরবর্তী

২, শা বোদলেয়র, Les Fleurs du Mal সম্পাদিত সংস্করণ J. Crepet এবং G. Blin কর্তৃক (পারি ১৯৪২) পৃ. 413.

৩. M. Butor, Histoire extraordinaire, essai sur un reve de Baudelaire (Paris, 1961), পৃ. 85।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হয়েছে।[১] বিড়ালেরা তাদের মধ্যস্থতার মাধ্যমে নারীত্বকে দূরে সরিয়ে রাখতে সাহায্য করছে প্রেমিক এবং পণ্ডিতদের দ্বারা গঠিত কবিতার প্রারম্ভিক সন্নিবেশ থেকে "বিড়ালদের কবি" (le poète des Chats) "bien restreint" (অতি সংযত) প্রেম থেকে মুক্ত, এবং জ্ঞানীদের কাঠিন্য থেকে বিমোচিত বিশ্বের মুখোমুখি হচ্ছে, হতচকিত না হয়ে।

[ফরাসি থেকে ভাষান্তর : মৃণাল নাথ]

---

১. L. Rudrauf-এর Rime et Saxe (Tartu, 1936) পুস্তিকায় ফরাসি সাহিত্যে প্রমীলা এবং পুরুষ মিলের বদলের তত্ত্ব" Maurice Grammont-র সঙ্গে "এক বিতর্কের পর অনুসৃত হয়ে এসেছে"। (পৃ. 47 পরবর্তী)। পরবর্তী জনের মতে, ষোড়শ শতকে প্রতিষ্ঠিত এই পরিবর্তনের জন্য এবং শব্দের শেষে একটি শ্বাসাঘাতহীন e-র উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিকে ভিত্তি করে, প্রমীলা মিল এবং পুরুষ মিল শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়েছে, কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শব্দের শেষে এই শ্বাসাঘাতহীন e স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন : "un petit chat / une petite chatte"। বরং আমরা একথা বলতে পারি যে স্ত্রীলিঙ্গের নির্দিষ্ট প্রত্যয় পুংলিঙ্গের বিপরীতে সর্বদাই "শ্বাসাঘাতহীন e"। কিন্তু Rudrauf কিছু সন্দেহের নিরসন করেছেন : "কিন্তু এটা কী একমাত্র ব্যাকরণগত বিবেচনা যা ষোড়শ শতকের কবিদের পরিবর্তনের নিয়ম প্রতিষ্ঠায় দু রকমের মিল নির্দেশ করতে, 'পুরুষ' এবং 'প্রমীলা' অভিধা চয়নে, পরিচালিত করেছে ? এটা ভুললে চলবে না যে Ple´iade-এর কবিরা গানের কথা মনে রেখেই তাদের কবিতা লিখতেন, কথিত ভাষার চেয়ে গান দৃঢ় সঞ্চল (পুরুষ) এবং দুর্বল সঞ্চল (প্রমীলা)-এর পরিবর্তনকে বেশি জোর দিতে পারে। ব্যাকরণগত সাদৃশ্যের পাশাপাশি কম বেশি সচেতনভাবে সাঙ্গীতিক এবং যৌন দৃষ্টিকোণ একটি ভূমিকা পালন করেছে (পৃ. 49)।

মিলের এই পরিবর্তন চরণের শেষে শ্বাসাঘাতহীন e-র উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা বাস্তবে আর নেই। Grammont একে দেখেছেন এভাবে যে এর জায়গা করে নিচ্ছে এমন একটি মিল যা ব্যঞ্জনধ্বনিতে বা শ্বাসাঘাতমূলক অন্ত্য স্বরধ্বনিতে শেষ হচ্ছে। "অন্ত্য স্বরধ্বনিসমূহ সমস্তই পুরুষ" (পৃ. 46)। এটা গ্রহণ করে Rudrauf একই সময়ে ২৭ ক্রমের একটি পর্দা প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছেন পুরুষ মিলের জন্য, যা "খুবই আকস্মিক এবং পুরুষভাবে কোমলভাবে সুন্দরের দিকে শেষে অগ্রসর হচ্ছে" (পৃ. ১২ পরবর্তী) ; মিলসমূহের অঘোষ স্পর্শ ধ্বনি গঠন করছে পুরুষ মিলের চরম প্রান্ত (১·), আলোচ্য পর্দার ঘোষ উষ্মধ্বনির মিলসমূহের আছে একটি প্রমীলা প্রান্ত (২৪·)। আমরা যদি পরীক্ষামূলকভাবে "chats"-এর ব্যঞ্জনধ্বনিমূলক মিলকে শ্রেণী বিভাগ করি, আমরা দেখব পুরুষ প্রান্তের দিকে একটি ক্রম অগ্রগতি যা লিঙ্গের বৈপরীত্য মিলের হ্রাসের দিকে শেষ হচ্ছে : 2 aust`eres - 4 se´dentaires ( তরলধ্বনি : ১৯· ), 6 te´n`ebres - 2 fun`ebres (রণিত স্পর্শধ্বনি এবং তরলধ্বনি : ১৫·) ; 4 attitudes - 10 solitudes (রণিত স্পর্শধ্বনি : ১৩·) ; 12 magiques - 14 mystiques (ঘোষ স্পর্শধ্বনি : ১·)।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এই নিবন্ধ অনুবাদে অনুবাদক **মৃণাল নাথ** কৃত ব্যবহৃত পরিভাষা তাঁর নির্দেশে বজায় রাখা হয়েছে। এই সংকলনে ব্যবহৃত অনেকগুলি পরিভাষার সঙ্গে অনুবাদকের পরিভাষার পার্থক্য রয়েছে, যেমন Phoneme অর্থে স্বনিম, Structure অর্থে সংগঠন। Clause অর্থে অনুবাদক' অঙ্গবাক্য' পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, 'খণ্ডবাক্য' ব্যবহার ও প্রচলিত।

বিশ্ববিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী ও সাহিত্যতত্ত্ববিদ **য়াকোবসন** এবং নৃতত্ত্ববিদ লেভি স্ট্রাউসের প্রবন্ধটি বহু আলোচিত এবং সমালোচিত। এ প্রসঙ্গে MICHAEL RIFFATERRE-র কিছু মন্তব্য উদ্ধৃত করা হ'ল—

In Structuralism : A Reader (p.p.—201-21, 447-48) "There is a reveling instance, where Jakobson and Lévi-Strauss take literally the technical meaning of feminine as used in metrics and grammer and endow the formal feminine categories with esthetic and even ethical values···only technicians would think of it [a sexual ambiguity in the poem, evidence for which is found in the 'paradoxical choice of feminine substantives for so-called, masculine rhymes.'] এ ছাড়া Anthony L. Johnson/Jakobsonion Theory and Literary Semiotics : Toward a Generative Typology of the Text' p.p. 32-61, **New Literary History,** Virginia. Vol. XIV, No. 1, 1982. প্রবন্ধটিও দ্রষ্টব্য।

—সম্পাদক

FORWARDED FREE OF COST, AND WITH THE COMPLEMENTS OF THE DEPARTMENT OF EDUCATION, GOVT. OF INDIA, NEW DELHI

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পবিত্র সরকার

শৈলীবিজ্ঞান : স্ট্রাকচারালিস্ট প্রাগ্‌ভূমিকা

এই নিবন্ধে স্ট্রাকচারালিজম নামক তত্ত্বটির ইতিহাস রচনা করা আমাদের লক্ষ্য নয়, যেমন লক্ষ্য নয় সাহিত্য ছাড়া নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, মীথ, বিজ্ঞান বা অন্যান্য শিল্পকলার ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের যৌক্তিকতা, সম্ভাবনা ও সাফল্য সম্বন্ধে আলোচনা করা। মূলত সাহিত্য সমালোচনার একটি বিশেষ তত্ত্ব বা অস্ত্র হিসাবে স্ট্রাকচারালিজমের নানা সূত্রগুলির প্রয়োগ কতটা সংগত বা অসংগত, তা সাহিত্যের বাইরেকার বা ভিতরকার লক্ষণগুলিকে কতটা স্পষ্ট বা আলোকিত করতে পারে তার অনুসন্ধানই আমাদের উদ্দেশ্য। এখানে অন্যান্য ধরনের সাহিত্য-সমালোচনার সঙ্গে স্ট্রাকচারালিস্ট সমালোচনার একটি বড়ো তফাতের কথা মনে রাখতে হবে। Tzvetan Todorov (১৯৭২) Structuralist Criticisim কথাটাকে বলেছেন স্ববিরোধী—a contradiction in terms,[১] সমালোচনা যেখানে কোনো রচনার ভাষ্য বা ব্যাখ্যা মাত্র, স্ট্রাকচারাল পদ্ধতি সেখানে ঐ রচনাটির অন্তর্লীন সংগঠন ও নিয়মবদ্ধ রূপারোপের প্রক্রিয়াটিকেই দেখিয়ে দেয়; দেখায় যে কতকগুলি নীতি, সংগঠন, শৃঙ্খলার পারস্পরিক যোগাযোগ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সুনির্দিষ্ট একটি বাঙ্‌নির্মিতির জন্ম দেয়। অর্থাৎ সাহিত্য-সৃষ্টির প্রকাশিত প্রকট রূপ এবং তার এই রূপের সামগ্রিক সংগঠনে কী করে পৌঁছোনো গেছে তার প্রচ্ছন্ন সূত্রগুলিকে আবিষ্কারই স্ট্রাকচারাল সমালোচনার মূল লক্ষ্য। সে অর্থে স্ট্রাকচারাল তত্ত্ব সমালোচনা নয়, সন্ধান ও আবিষ্কার। এতে ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনার স্থান নেই, ভালো-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, উপভোগ্য-বিরক্তিকর ইত্যাদি কোনো সিদ্ধান্তেরও সুযোগ তাতে নেই। স্ট্রাকচারালিস্ট সমীক্ষক যে-রচনাটিকে নির্বাচন করেন, তার সৌন্দর্য বা সাহিত্যিক মূল্য সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ, তা তিনি ধরেই নিয়েছেন। তা নিয়ে কোনো বিতর্কে যাবার ইচ্ছে তাঁর নেই। বরং ঐ যে সৌন্দর্য বা মূল্য—রচনাটির নানা উপাদানের নির্বাচন, বিন্যাস, সংস্থাপন ও সমন্বয়ের মধ্যে তার কোনো ভিত্তি আছে কি না, সেটাই তিনি লক্ষ করেন। স্ট্রাকচারালিজম তোদোরভের মতে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক তত্ত্ব, তা ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনা নয়। আবার ইয়োসেফ হ্রাবাক (Hrabák)-এর মতে স্ট্রাকচারালিজম কোনো তত্ত্ব বা থিয়োরি যেমন নয়, পদ্ধতি বা method-ও নয়। এটি একটি জ্ঞানাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি বা epistemological point of view।[২]

সে যাই হোক, যখন সাহিত্য-বিচারে স্ট্রাকচারালিজমের সূত্র গ্রহণ করা হয় তখন সাহিত্যকে স্ট্রাকচারালিস্টরা কীভাবে দেখেন, সে কথাটা বিবেচনা করা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
দরকার। সাহিত্য বলতে কী বোঝেন এঁরা ? সাহিত্য ভাষার একটি বিশেষ ধরনের নির্মিতি। সুতরাং ভাষা যাঁর বিচারের বিষয় সাহিত্যও ব্যাপক ভাবে তার বিচার্য—একথা প্রাগের ভাষাতাত্ত্বিকেরা, বিশেষত ট্রুবেট্‌সকয় বা ইয়াকবসন প্রমুখেরা, খুব স্পষ্টভাবেই দাবি করেন। কিন্তু তার আগে সকলেই দৈনন্দিন কথ্য ভাষা (spoken language) এবং সাহিত্যের ভাষা (Poetic বা Literary language)-র মধ্যে পার্থক্যটি নির্দেশ করেন। রোজকার যে কথ্যভাষা আমরা নানা প্রয়োজনে ব্যবহার করি, তার লক্ষ্য Communication বা জ্ঞাপন, আর কাব্য-সাহিত্যের ভাষার লক্ষ্য হল expression বা প্রকাশ। সুতরাং কাজের (function-এর) দিক থেকে দু-ভাষার জায়গা আলাদা। ঐ প্রকাশকর্ম বা expression বা esthetic function সম্ভব হয় কোন্ উপায়ে ? সম্ভব হয় এইজন্য যে, কাব্য সাহিত্যের ভাষা highly organized, প্রতিদিনকার ভাষা তো তা নয়। স্ট্রাকচারপন্থী আলোচক সাহিত্যের ভাষায় এই organization বা নির্মিতির সূত্রগুলিকে আবিষ্কার করতে সচেষ্ট হবেন। একটি রচনাকে একটি শিল্পগতভাবে অখণ্ড এবং সমগ্র রূপ ধরে নেবেন তিনি ; তারপর লক্ষ করবেন কীভাবে তার উপাদানগুলি (ধ্বনিগত, পদগঠনগত, বাক্যগত) নির্বাচিত (selected) হয়েছে, পরস্পরের পাশে বিন্যস্ত (concatenated হয়েছে)। তাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ (contrast) বা দূরত্ব কোথায় কতটা, ঐক্য কোথায় কতটা ; অংশগুলি কীভাবে সমগ্রকে গড়ে তুলছে।

রোজকার কথার ভাষা হয়তো কম সংগঠিত এবং কম সুবিন্যস্ত, কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বা আইনের নিবন্ধের ভাষা তো তা নয়। এখানে তো ভাষা মোটামুটি সুশৃঙ্খল এবং যুক্তি ও চিন্তার পরম্পরা অনুযায়ী সুবিন্যস্ত। তবে বিজ্ঞান বা আইন-বিষয়ক রচনার ভাষাকে কেন esthetic ভাষা বলা হবে না ? এ প্রশ্নের উত্তরে স্ট্রাকচারালিস্টরা বলেন যে, বিজ্ঞান, আইন ইত্যাদির ভাষার কাজ communication মাত্র, expression নয়। কবিতা বা সাহিত্যের কাজ expression। সুতরাং এখানে ভাষা বক্তব্যকে অতিক্রম করে নিজেই সামনে এসে দাঁড়ায়—বলে, 'আমাকেও লক্ষ করো, এখানে আমি অর্থের চেয়ে কম লক্ষণীয় নই, কখনো কখনো অর্থের চেয়ে আমিই বেশি করে চোখে পড়তে চাই।' এই যে বাক্যের অর্থের তুলনায় বাক্যের শরীরের সমান বা বেশি লক্ষণীয় হয়ে ওঠা, প্রাগের ভাষাতাত্ত্বিক ইয়ান মুকারোভ্‌স্কি তার নাম দিয়েছেন aktualisce বা foregrounding[৩]—যার বাংলা করা হয়েছে 'প্রমুখন'[৪]। Foregrounding বা প্রমুখনের বিপরীত হল ভাষার automatization—যাতে ভাষা বিষয়ের বাহন মাত্র, বিষয়টাই প্রধানভাবে লক্ষণীয়। দৈনন্দিন কথার ভাষা—কিংবা বিজ্ঞান, আইন বা ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাষা মূলত জ্ঞাপনধর্মী, ফলে সে-ভাষায় প্রমুখন নেই, আছে 'প্রবহণ' বা automatization।

এই যে প্রমুখিত ভাষা—বিষয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বা কখনো-কখনো বিষয়কে ছাড়িয়ে ভাষার দীপ্ত হয়ে ওঠা—তাই শৈলীবিজ্ঞানী বা স্টাইলিস্টিশিয়ানদের আলোচনার মূল আশ্রয়। এতে এমন যেন মনে না করা হয় যে, কেবল সাহিত্যের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
ভাষারই স্টাইল বা শৈলী আছে। ভাষা মাত্রেরই একটা বিশেষ ভঙ্গি থাকে, তা কথার ভঙ্গি হোক, পাণ্ডিত্যপ্রকাশের ভঙ্গি হোক, রসিকতার ভঙ্গি হোক—সেই ভঙ্গিটাই তার স্টাইল। এংকৃভিস্ট যে-জন্য বলেছেন, "There is no styleless language :"[৫] কিন্তু সাহিত্যের ভাষার লক্ষণ বা style marker-গুলি যে একটু অন্যরকম, একটু বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত এবং পুনরাবৃত্ত তাও তিনি লক্ষ করেছেন। কাব্য সাহিত্যের ভাষার style marker-গুলি কথা বা যুক্তিনির্ভর আলোচনার ভাষার style marker-গুলির চেয়ে চরিত্রে, ব্যবহারের নিয়মে, ব্যবহারের বাহুল্যে ও বারংবারতায় নানাভাবে আলাদা বলেই সাহিত্যের ভাষার style আলাদাভাবে বিচার করতে হয়।

কবিতা বা সাহিত্যের ভাষার এই প্রমুখনের (foregrounding-এর) মূল নীতিটি কী ? প্রাগের ভাষাতাত্ত্বিকেরা বলেন, তা হল ভাষার 'মূল সংগঠন থেকে কিঞ্চিৎ সরে আসা—deviation from the norm. এ'দের মূল বক্তব্য হল, ভাষার একটি unmarked বা স্বাভাবিক ব্যবহারের নিয়মশৃঙ্খলা আছে। সেটিই norm বা মৌলিক আদর্শ। কিন্তু ব্যাকরণের ঐ স্বাভাবিক, সর্বজনীন নিয়ম-শৃঙ্খলা ভেঙে কেউ যদি বেরিয়ে আসেন, যদি তাঁর ভাষাকে অন্যভাবে সাজান, তাহলে তাঁর ভাষা আর স্বাভাবিক বা unmarked থাকে না, হয়ে যায় কেন্দ্রাতিগ, মূল ভরকেন্দ্র থেকে বিচ্যুত, deviant। স্টানকিয়েভিচ-এর কথায় "a certain rearrangement and modification of the elements of everyday spoken language"[৬] ঘটছে কাব্য-সাহিত্যের ভাষায়। মুকারোভ্‌স্কি, হাব্রানেক প্রভৃতিরাও এই একই কথা বলেছেন। ফলে শৈলী-আলোচকের মূল কর্তব্য দাঁড়াল ঐ যে ভাষা দৈনন্দিন কথ্য ভাষার রীতি নিয়মগুলি থেকে সরে আসছে তার সেই সরে আসার লক্ষণগুলি আবিষ্কার ও নির্ধারণ করা। দ্বিতীয়ত, সাহিত্যের ভাষা যদি সরে নাও আসে স্বাভাবিক ব্যবহারের ভাষা থেকে, অর্থাৎ norm থেকে যদি সে ভাষা তেমন deviate নাও করে—তবু কাব্য-সাহিত্য সাহিত্য যে organized message তা তো বলাই যায়। স্টানকিয়েভিচ ঐ সরে-আসার উপরে তত গুরুত্ব দেন নি, বলেছেন, "Poetic language need not vialate any rules of language and still remain what it is."[৭] অর্থাৎ norm থেকে deviation-এর পরিমাণ কতটা হবে, কিংবা আদৌ হবে কি না তা নিয়ে তর্কটির পুরো মীমাংসা হয়নি। রোলাঁ বার্ত "zero degree of writing" বলে যে একটি কথা তৈরি করেছেন তা ঠিক প্রাগ্‌ ভাষাতাত্ত্বিকদের কথিত norm-এর সমগোত্রীয় নয়, কিন্তু ধারণার দিক থেকে কাছাকাছি। এ হল প্রথাগত ও বহুব্যবহৃত রচনারীতি, যা একসময় হয় তো deviant ছিল, কিন্তু এখন বহুপ্রচলনের ফলে স্বাভাবিক হয়ে গেছে। যার মধ্যে আগেকার esthetic function অস্পষ্ট হয়ে গিয়ে আবার জ্ঞাপন বা communicative function ই বড়ো হয়ে উঠেছে।[৮]

২.

কবিতা বা সাহিত্যকে না হয় দৈনন্দিন ভাষা, ব্যবহারিক, বৈষয়িক বৈজ্ঞানিক

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
ভাষা বা বহু-প্রচলিত শৈলী থেকে আলাদা করা গেল, কিন্তু তার বিচার হবে কী উপায়ে? এখানেই আসে স্ট্রাকচার বা অবয়বের প্রসঙ্গ। সাহিত্য মূলত organized message। সুতরাং কবিতাই হোক, গল্পই হোক, উপন্যাসই হোক—তার organization বা সংস্থান সংগঠনের মূল উপাদান ও নীতিগুলিকে আবিষ্কার করা শৈলীবিজ্ঞানের একটা বড়ো কর্তব্য। Structure বা অবয়ব বলা হয় তাকেই যার অনেকগুলি অঙ্গ আছে, সে অঙ্গগুলি পরস্পরের সঙ্গে সার্থক ভাবে সমন্বিত ও সংযুক্ত। এই কবিতা বা সাহিত্যের এই structure যদি সন্ধান, আবিষ্কার বা আরোপ করতে হয়, তাহলে কোন্ বিজ্ঞানের মডেলটি সবচেয়ে কাজে লাগে? যাঁরা স্ট্রাকচারালিজমের মূল দর্শনটিকে গড়ে তুলেছেন সেই ফরাসি মনীষীদের মতে ভাষাবিজ্ঞানের। লেভি স্ত্রোস বিশেষ করে কাউন্ট ট্রুবেট্সকয়, রোমান ইয়াকবসন প্রমুখ প্রাগের ভাষাবিজ্ঞানীদের ধ্বনিতত্ত্বের আদলটিকে তাঁদের স্ট্রাকচারাল ভাবনাসূত্র গড়ে তোলার জন্য ব্যবহার করেছেন। অনেকেই নিশ্চয়ই তাঁর Structural Anthropology বইটি পড়েছেন। তাতে প্রথম প্রবন্ধে ট্রুবেট্সকয়কে তিনি বিশেষভাবে স্মরণ করেছেন পরমাণু-দর্শন বা atomism-কে অস্বীকার করে তিনি ভাষাবিজ্ঞানে systematic structuralism এবং universalism কে স্বীকার করেছিলেন বলে।[৯] অসংখ্য স্থলে রোমান ইয়াকবসন প্রভৃতির "phonological revolution"-এর সাক্ষ্য মেনেছেন—আত্মীয়স্বজন বা kinship-এর সংগঠন আলোচনায় যেমন, আবার মীথের আলোচনায় ভাষাতাত্ত্বিক দ সোস্যুরের langue ও parole—ভাষার এই দ্বিস্তর রূপের আদল মনে রেখেছেন[১০]। তোদোরভ সাহিত্যকে ভাষারই বিশেষ রূপ বলতে গিয়ে পোল ভালেরির কথা উদ্ধার করেছেন—Literature is, and can be nothing other than, a kind of extension and application of certain properties of language."[১১] বস্তুত পক্ষে ফের্দিনান্দ দ সোশ্যুর, এমিল বঁভনিস্ত, ট্রুবেট্স্কয়, ইয়াকবসন প্রভৃতি নানা পুরোধাস্থানীয় ভাষাতাত্ত্বিক স্ট্রাকচার পন্থীদের মূল ভাবনার আদর্শটি গড়ে দিয়েছেন বলা চলে।

মনে রাখতে হবে এই চিন্তার দুটি দিক আছে। এক সাহিত্যকে ভাষারই সুনির্দিষ্ট রূপ এবং সম্প্রসারণ হিসেবে দেখা এবং ভাষাবিচারের নানা নীতি ও সূত্রকে সাহিত্য বিচারেও প্রয়োগ করা; আর দুই শুধু সাহিত্য নয়, নৃতত্ত্ব, মীথ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র সমস্ত কিছুকেই ভাষাতত্ত্বের বিশ্লেষণ প্রণালীর আদলে বিশ্লেষণ করা। প্রথম ক্ষেত্রে ভাষাতত্ত্বকে গ্রহণ করার যুক্তি এক, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যুক্তি অন্য।

সাহিত্যের ব্যাপারটাই যেহেতু আমাদের আলোচ্য সেহেতু তোদোরভ প্রভৃতির কথাই প্রথমে স্মরণ করি—সাহিত্য ভাষারই বিশেষ রূপ, কাজেই ভাষাবিচারের আদলেই সাহিত্যেরও বিচার করা সম্ভব এবং উচিত। একথা পরেও অনেকে বলেছেন, যার মধ্যে ব্রিটিশ ভাষাতাত্ত্বিক হ্যালিডের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হ্যালিডে বলেছেন যে, সমস্ত ভাষানির্ভর রচনাই এমন-কী 'সাহিত্য'-ও "are accessible to analysis by the existing methods of linguistics.[১২]'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এখন ভাষাবিচারের কোন্ কোন্ বিশেষ method ও পদ্ধতি, কোন্ কোন্ বিশেষ ধারণাকে স্ট্রাকচারপন্থীরা বিশেষ করে কাজে লাগিয়েছে ? জন লায়ন্সের অনুসরণে ভাষাবিশ্লেষণের সামগ্রিক প্রকরণটির কথা সংক্ষেপে বলে নিলে এই ধারণা ও পদ্ধতিগুলির আভাস পাওয়া যাবে। লায়ন্স জানিয়েছেন যে, প্রত্যেকটি ভাষা একটি অনন্য রূপ, একটি সুনির্দিষ্ট ও বিশিষ্ট তন্ত্র (system)। তা অনেকগুলি একক বা unit দিয়ে তৈরী। এই এককগুলিকে চিনি কী করে ? প্রত্যেকটার আলাদা নাম বা বর্ণনা দিলে এই unit-গুলিকে সম্পূর্ণ জানা হয় না। বিচ্ছিন্নভাবে তাদের পরিচয় পূর্ণাঙ্গ নয়। তাদের পরিচয় পূর্ণাঙ্গ তখনই হয় যখন ভাষার অন্যান্য unit-গুলির সঙ্গে তার সম্পর্ক জানতে পারি আমরা, যখন তাকে অন্যদের সঙ্গে মিলিয়ে তার আলাদা বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝে নিই। ভাষা একটা নানা সম্পর্কের জটিল গ্রন্থি। লায়ন্সের ভাষায়, "Every distinct language is a unique relational structure; and of the units which we identify in describing a particular language—sounds, words, meanings etc. –are but points in the structure, or network of relations."

নানা উপাদানগুলিই বা কী, আর তাদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্কগুলিই বা কী—এই সব প্রশ্নের উত্তরই খোঁজা হয় স্ট্রাকচারের আলোচনায়। কাব্য-সাহিত্যের উপাদানগুলি মূলত ভাষারই উপাদান—ধ্বনি, শব্দ (word), বাক্য—কিন্তু সেখানেও একটু পার্থক্য আছে। কাব্য-সাহিত্যে সেগুলির বিন্যাস একটু আলাদা, ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যও আলাদা—সে কথা আগেই বলা হয়েছে। সেগুলির identity যে আসলে relational identity—একথা স্ট্রাকচারপন্থীরা বারবার উচ্চারণ করেন। এমিল বঁভনিস্ত-এর কথা উদ্ধার করে কালার দেখিয়েছেন যে উপাদানগুলির পরস্পরের মধ্যে এই সম্পর্ক প্রধানত দুধরনের। এক গোত্রের বা এক স্তরের উপাদানগুলির পরস্পরের সম্পর্ক হল বিযোজক distributional; আর বিভিন্ন গোত্রের উপাদানের মধ্যে সম্পর্ক হল সংযোজক বা integrative। বিযোজক সম্পর্ক আবার দুধরনের—পার্শ্বিক বা অন্বয়গত—syntagmatic এবং বৈকল্পিক বা নির্বাচনগত—paradigmatic।[১৪] উপাদানগুলির পরস্পরের মধ্যে ঐক্য, বিরোধ ও সমন্বয় সূত্র আবিষ্কার—তাদের সম্পর্কের অন্তর্লীন নিয়মগুলিকে উদ্ধার ও প্রদর্শন—স্ট্রাকচারপন্থীর কর্তব্যের অন্তর্গত। পল গারভিন অত্যন্ত আশ্বাসের সঙ্গেই বলেছেন যে "Structuralist analysis can...be applied to any object cognition which may legitimately viwed as a structure..." কাজেই স্ট্রাকচারের ধারণার মধ্যে দুটি আলাদা বস্তুসংজ্ঞাকে পাই—সমগ্র এবং তার নানা অংশ, আর দুধরনের সম্পর্কের ধারণাকে নিহিত দেখি—সমগ্রের সঙ্গে বৃহত্তর পটভূমিকার বা অন্য সমগ্রের সম্পর্ক, এবং অংশগুলির পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক।[১৫] যাঁরা রোমান ইয়াকবসনের কবিতার অবয়ব বিশ্লেষণ,[১৬] তোদোরভে হেনরি জেমসের ছোটো গল্পের সামগ্রিক আলোচনা[১৭] পড়েছেন তাঁরা জানেন কত সূক্ষ্ম ও বিচিত্রভাবে এই পদ্ধতিগুলির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করা হয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করার ফলে তাদের নিরীক্ষাতে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ রুচি-বিতৃষ্ণা অপনীত হয়ে এসেছে নৈর্ব্যক্তিক ও নিরাসক্ত বিশ্লেষণ এবং উচ্ছ্বাসের জায়গায় এসেছে শৃঙ্খলা। এঁদের সকলের মত ও পথ ঠিক এক নয়, স্ট্রাকচারালিজম বলতে সকলে যে একই বস্তু বোঝেন তাও নয়—তবু সাহিত্য সমালোচনায় ভাষাতত্ত্বচর্চার পরিশ্রম ও সতর্কতা, নিছক বস্তুকে গ্রহণ করে বস্তুর অন্তর্লীন বিন্যাসকে আবিষ্কারের চেষ্টা, মূলত আরোহী পদ্ধতিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রবণতা—impressionistic সমালোচনার সহজ উচ্ছ্বাসকে নিরুৎসাহিত করেছে।

৩:

কিন্তু সাহিত্য যেখানে শুধু ভাষাসৃষ্টি নয়, তা একই সঙ্গে সৌন্দর্যেরও সৃষ্টি—সেখানে এই অবয়বশৈলী আশ্রিত সমীক্ষা কতটা সফল হতে পেরেছে? এই প্রশ্নে এসে কালারের মতো প্রবক্তাও নিঃসংশয় নন। ১৯৭০-এর গোড়াতেই এ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন উঠে পড়েছে। ইলিয়াস শোয়ার্টস্ তাঁর **Forms of Feeling** গ্রন্থে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন, তিনি বলেছিলেন সফল সমালোচনার জন্য সাহিত্যকে ভাষার নির্মিতি হিসেবে দেখার চেয়ে কল্পনার সৃষ্টি বা "a specis of mimesis" হিসেবেই দেখা উচিত। তাঁর মতে ভাষাগত deviation-এর জন্য সাহিত্য মহৎ বা সৌন্দর্যশালী হয় না, হয় অন্য কোনো কারণে। উদাহরণ হিসেবে রবার্ট ফস্টের বিখ্যাত "Stopping by woods" কবিতাটির বিচার করে তিনি দেখিয়েছেন যে তাতে ভাষাগত উদ্ভাবন বা বৈচিত্রী তেমন কিছু নেই, ব্যাকরণ লঙ্ঘনও সামান্যই। সহজ ও স্বাভাবিক বাগ্‌ভঙ্গিতে একটি শান্ত বর্ণনা। 'প্রমুখণ' প্রায় কিছুই নেই তাতে। তা সত্ত্বেও কবিতাটি যে আমাদের অভিভূত করে, তা তার total structure-এর জন্য।

শোয়ার্টস রজার ফাউলার-এর কথা উদ্ধার করে দেখিয়েছেন যে. এই বিষয়ে স্ট্রাকচারপন্থীরা নিজেরাও একটু দ্বিধাগ্রস্ত। কালার তাঁর বইয়ের শেষ অধ্যায়ে এ বিষয়টি আলোচনা করেছেন। তিনি এখানে রোলঁ বার্তে-র সেই মারাত্মক বিবৃতিটি তুলেছেন যাতে তিনি বলছেন যে স্ট্রাকচারাল বিশ্লেষণ হল পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মতো। স্টার্নাকিয়েভিচ তাঁর পূর্বোল্লেখিত নিবন্ধে পরিষ্কার করেই বলেছেন যে যা কাব্য হিসেবে মূল্যবান তার সার্থক বিশ্লেষণ "always a matter of insight and intuition on the part of the analyst." এই insight ও intuition সকল ভাষাশাস্ত্রী অবয়ববাদীর নাও থাকতে পারে, সকল সমালোচকের যেমন থাকে না। স্টার্নাকিয়েভিচ নিজেই একজন ভাষাতাত্ত্বিকের কথা বলেছেন প্রাচীন একটি কাব্য পড়ে যিনি চোখের জল সামলাতে পারেন নি। 'কাঁদছেন কেন' জিজ্ঞেস করায় সেই ভাষাতাত্ত্বিক সাশ্রু নয়নে আপ্লুত কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন, "দেখেছ কত অপ্রচলিত শব্দ রয়েছে এ কাব্যে! এ যে সোনার খনি হে!" নিকোলাস রুয়ে খুব বিস্তৃত করে আলোচনা করেছেন কেন ভাষাতাত্ত্বিক ও শৈলীগত সমালোচনা সমালোচনার সামগ্রিক দায় বহন করতে এখনও সমর্থ হয়নি। অঙ্গসংস্থান দিয়ে beautiful বা striking-এর প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। রোমান ইয়াকবসনের সমালোচনা তত্ত্বের নানা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অসম্পূর্ণতাও তিনি দেখিয়েছেন। কালার চম্‌স্কির ট্রানসফরমেশানাল জেনারেটিভ তত্ত্বকে যুক্ত করে নিয়ে অবয়ববাদের উত্তরণ খুঁজেছেন, কিন্তু তাতে যা প্রসিদ্ধরূপে স্ট্রাকচারালিজম নামে পরিচিত তার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য সূচিত হয়নি। জন হপকিন্‌স হিউম্যানিটিজ সেন্টারের ১৯৬৬ সালের ঐ আলোচনাচক্রেই [যা The Structuralist Controversy' বইয়ে সংগৃহীত হয়েছে] সাহিত্য সমালোচনায় Structuralism-এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেককে দুশ্চিন্তা পোষণ করতে দেখি। গ্রন্থের দুই সম্পাদক ১৯৭১-এ বলেই দেন যে "Today we may question the very existence of structuralism as a meaningful concept."

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. Todorov, Tzvetan, 1972, "The Structural Analysis of Literature : The Tales of Henry James" in Robey' D. (ed.), Structuralism : an Introduction (Wolfson College Lectures, 1972), Oxford, Clarendon Press, 1973, p. 73.

2. Garvin, Paul, 1964. (সম্পা) A Prague School Reader on Esthetics, Literary Structure and Style. Washington D. C. Georgetown University Press বইয়ের vi পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য।

৩. দ্রষ্টব্য, Mukarovsky, Jan, "Standard Language and Poetic Language (17—30), এবং Havranek, Bohuslov, "The Functional Differentiation of the Standard Language", (3—16) ; Garvin সম্পাদিত (২ পাদটীকা দ্র.) পূর্ববর্তী গ্রন্থ।

৪. দ্র: আমার লেখা "বাংলা গদ্য রীতিগত অনুধাবন"। নীহাররঞ্জন রায় সম্পাদিত 'বাংলা গদ্য-জিজ্ঞাসা' (সমতট প্রকাশনী, ১৯৮১)। ৫৯—৬১ পৃষ্ঠা বিশেষভাবে দেখা যেতে পারে।

৫. Enkvist, Nils Erik, in Enkvist et al., 1964, Linguistics and Style, London Oxford University Press. p-32.

৬. Stankieviez, Edward, 1960, "Linguistics and the Study of Poetic Language", দ্র. Sebeok, Thomas A (সম্পা) ১৯৬০ Style in Language, Cambridge (Mass.), The M, I. T. Press, p. 70.

৭. ঐ।

৮. দ্র. Culler, Jonathan, 1973, Structuralist Poetics, London, Routledge & Kegan Paul, p. 134.

৯. Le'vi-Strauss, Claude, 1967, Structrural Anthropology, New York Doubleday & Company, Inc. (Anchor Books) p. 32.

১০. ঐ, p. 205,

১১. Todorov, Tzvetan, "Language and Literature" Macksey, R ও Donato, E. (সম্পা), ১৯৭০, The Structuralist Controversy, Baltimore & London, The John Hopkins Press, (125—133), p. 125.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১২. Halliday, M.A.K., "The Linguistic Study of Literary Texts,' in Lunt, H. (ed.), 1964, Proceedings of the Ninth International Congress of Linguistics, The Hague, Mouton, p. 302.

১৩. Lyons, John, "Structuralism and Linguistics", in Robey, D. (ed.), (টীকা ১) p. 6.

১৪. দ্র. Culler, J, পূর্ববৎ, pp. 10—13.

১৫. Garvin, Paul (পূর্ববৎ), p. VII.

১৬. একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ Linguistic Inquiry পত্রিকায় (M.I.T. Press) প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় রবার্ট ব্লেকের Infant Sorrow কবিতার বিচার।

১৭. Robey, D., 1973, 73—103,

১৮. Schwartz Elias, 1972 (National University Publications, Kennikat Press, Port Washington, N. Y.)

১৯ টীকা ৬-এর প্রবন্ধ।

২০. Ruwet, Nicolas, "Linguistics and Poetics", ১১ টীকায় উল্লিখিত 296—318 পৃষ্ঠা।

২১. দ্র. Macksey, ও Donato, E পূর্ববৎ. I. ix

(Foregrounding অর্থে কোনো কোনো নিবন্ধকার মঞ্চন পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন—সম্পাদক : গাঙ্গেয় পত্র)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মিখায়েল বাখ্‌তিন / পাভেল মেদভেদেভ

কবিতায় ধ্বনির সমস্যা

রূপবাদীরা (Formalist) তাঁদের কাব্য-ভাষা সংক্রান্ত তত্ত্বনির্ণয়ে সরাসরি এই সমস্যাকে ভিত্তি করেছেন।

কবিতায় ধ্বনির সমস্যা, সমগ্র কাব্য-কর্মে ধ্বনির গঠনগত অর্থের সমস্যা ছাড়া কিছু নয়।

সেই সঙ্গে এটা স্পষ্ট যে, ধ্বনির গঠনগত তাৎপর্য বিবিধ ধরনের সাহিত্য-কর্মের ক্ষেত্রে বিভিন্ন : কোনো ক্ষেত্রে এটি একটি স্বতন্ত্র গঠনগত ভূমিকা পালন করে ; আবার অনেক ক্ষেত্রে এটি শৈল্পিক গঠনার দিকে আদৌ ঝোঁকে না, বর্ণিম-এর মত শুধুই একটি নিয়মরক্ষাকারী সহায়ক অথবা একটি সূচক হয়ে থাকে। ধ্বনির অন্যান্য সম্ভাব্য-গঠনগত-অর্থগুচ্ছ এই দুই চরমসীমার মধ্যে অবস্থান করে।

রূপবাদীরা, মূল সাহিত্য-কর্মটির আলোচনা প্রসঙ্গেও বিষয়টি তুলে এই আপাত-দুরূহ ও জটিল সমস্যাটিকে আরও ঘুলিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা অযথা সমস্যাটির রূপান্তর ঘটিয়েছেন।

যদি Shklovskii-র On Poetry and Transrational Language এবং Iakubinskii-র On the Poetic Combination of Glossemes নামের প্রবন্ধ দুটি বিচার করি, তাহলে দেখতে পাব যে এই দু'জন লেখক শেষ পর্যন্ত এটাই দেখাতে চেয়েছেন যে, ধ্বনি—তা' সে উচ্চারণের জন্যই হোক বা শোনার জন্যই হোক—অর্থহীন হলেও আনন্দদায়ী হতে পারে, এবং লোকে অর্থহীন শব্দও শুনতে ভালোবাসে[১]। এই বক্তব্য প্রমাণ করতে সংবাদপত্র, উপন্যাস ও স্মৃতিকথা থেকে প্রচুর উদাহরণ দেওয়া হয়। সেই উদাহরণের কোনো ব্যতিক্রম নেই এবং সেগুলি জীবনে ভাষার আস্বাদন নেওয়া, ভাষাকে উপভোগ করার বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে নেওয়া। কিন্তু এই উদাহরণগুলো থেকে গৃহীত সিদ্ধান্ত হল যে, কবিতায় ব্যবহৃত ধ্বনিসমূহের একটা স্বতন্ত্র তাৎপর্য থাকতে পারে এবং সেগুলো এমনকি "বোধাতীত ভাষা"-র মত যদি অর্থহীন হয়, তবুও।

Shklovskii এবং Iakubinskii-র উদাহরণগুলি কাব্যিক গঠনা-র (Construction) ক্ষেত্রে কোনো কাজে আসবে না। ঐ উদাহরণগুলির গরিষ্ঠ অংশেই, দৈনন্দিন ভাষায় যে ধ্বনি সৃষ্ট হয়—তাকে আস্বাদন ও উপভোগ করা যাবে। অন্যান্য উদাহরণগুলিতে নির্ভেজাল অর্থহীন ধ্বনিই আনন্দ দেয়। শুধু এই তথ্যের উপর নির্ভর করে, কাব্যিক গঠনার বিশেষ কোনো স্তরে ধ্বনির তাৎপর্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া আদৌ সম্ভব নয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এছাড়া, সাধারণভাবে ভাষার ধ্বনি আনন্দ দেয়—এটা প্রমাণ করতে গিয়ে রূপবাদীরা দেখাতে চান যে, এই আনন্দ আসে ধ্বনির অর্থের বিনিময়ে—হয় অর্থকে সম্পূর্ণ লুপ্ত করে ("বোধাতীত ভাষা") নয়তো অর্থের গুরুত্ব কমিয়ে দিয়ে, অর্থকে প্রচ্ছন্ন রেখে। এখানেও সেই দৈনন্দিন ভাষা ও কাব্যিক ভাষা-র তফাতটাই নিয়ন্তা, যদিও "বোধাতীত ভাষা" (Transrational) মূলত দৈনন্দিন ভাষার উপর ভিত্তি করেই প্রমাণিত হয়।

দৈনন্দিন ভাষায় ধ্বনি কেবল অর্থবোধে সাহায্য করে, অর্থাৎ এখানে ধ্বনির কেবল সহায়কের ভূমিকা। দৈনন্দিন ভাষা ধ্বনিকে স্ব-মূল্য করে তোলার জন্য অপরার্থের পক্ষে প্রয়োজনীয় করে তোলো। এর ফলে ধ্বনির স্ব-মূল্যের ক্ষেত্রে বোধাতীত শব্দ-ই হয় উচ্চতম সীমা। রূপবাদীদের যুক্তিটা এইরকম।

রূপবাদীদের এই যুক্তি, কবিতায় ধ্বনির গঠতগত তাৎপর্য-সংক্রান্ত সমস্যার সঠিক সূত্রায়নের কাজ আরও দুরূহ করে তোলে। কারণ, কবিতায় ধ্বনি ও অর্থের বিপরীত সমানুপাতিকত্বের কোনো স্থান নেই; অথবা, যদি ফিউচারিস্টদের বোধাতীত পরীক্ষণের কথা ধরা হয়, তাহলেও তা' কবিতার প্রতীক হবে না।

কবিতার চরম উৎকর্ষ ঘটে তখনই, যখন ধ্বনির সঙ্গে তার অর্থের সংযুক্তি সার্থকভাবে হয়ে থাকে অর্থাৎ যখন এই দুই মানের মধ্যে প্রত্যক্ষ সমানুপাতিকত্ব থাকে। ধ্বনির গঠনগত তাৎপর্য বুঝতে কবিতার এই সর্বোত্তম রূপ থেকেই শুরু করা দরকার। সমগ্র শিল্প-কর্মের গঠনগত পূর্ণতার মধ্যে কিভাবে অর্থ ও ধ্বনি সংযুক্ত হচ্ছে তা' দেখানোও জরুরী।

অবশ্য, যখন শিল্পকর্মের মধ্যে অর্থ প্রাবিষ্ট হয় তখন সেটা দৈনন্দিন ভাষা বা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের ভাষার চেয়ে আলাদা হয়। ধ্বনির ক্ষেত্রেও একই কথা। ধ্বনি ও অর্থ একই সুরে মেশে—সে সুর হল শিল্প-গঠনা। এই জায়গায় তাদের মধ্যে একটা নতুন আন্তঃসম্পর্কের সৃষ্টি হয়—যে আন্তঃসম্পর্ক দৈনন্দিন অথবা বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন হয়, তার চেয়ে আলাদা।

ধ্বনি ও অর্থের এই নতুন আন্তঃসম্পর্কের সংজ্ঞা নির্ণয় করা অথবা তাকে বোঝার কাজ কাব্যিক-গঠনার মধ্যেই করতে হবে। এটাকে একটা মামুলি লড়াই হিসাবে দেখলে চলবে না—যেখানে পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে যুদ্ধ জেতা যায়। আর কবিতার ক্ষেত্রে যদি বা কখনও পরের ঘাড়ে বন্দুক রাখা যায়, সেটা ধ্বনি ও অর্থের মধ্যে গঠনগত আন্তঃসম্পর্কের কেবল একটি সম্ভাব্য উদাহরণ হিসাবে মেনে নেওয়া যেতে পারে। এটা কখনও প্রতীকী হতে পারে না।

Iakubinskii তাঁর "On the Sounds of Poetic Language" শীর্ষক প্রবন্ধে সমস্যাটির সঠিক চরিত্রের কিছুটা কাছাকাছি আসতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল এইরকম "কবিতার ভাষায় ধ্বনির ভূমিকা সম্পর্কিত আমার সংক্ষিপ্ত নোটের উপসংহারে আমি আমার প্রধান সিদ্ধান্তগুলির আবার উল্লেখ করব: কবিতার ভাষায়, মননে আরুদ্ধ ধ্বনিগুলি চেতনার উজ্জ্বল ভূমিতে প্রকাশিত হয়; এই প্রসঙ্গে কবিতার সঙ্গে একটা সাবেগ সম্পর্ক গড়ে ওঠে যার ফলে একটি কবিতার "সারমর্ম" ও তার ধ্বনিগুলির মধ্যে একটা নির্দিষ্ট

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নির্ভরশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়; ধ্বনির ক্ষেত্রে উচ্চারণের জন্য বাগঙ্গগুলির সঞ্চালনেরও একটা ভূমিকা থাকে।"২

এই সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে প্রবন্ধকার বিভিন্ন ছোটগল্প, উপন্যাস এবং কাব্যকথা থেকে এলোমেলোভাবে গৃহীত একগুচ্ছ উদাহরণের উপর নির্ভর করেছেন এবং বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক রচনা থেকে কাকতালীয় উদ্ধৃতি দিয়ে সেগুলিকে সমর্থন করেছেন।

এখানে যেটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তা' হল, প্রবন্ধকারের মনোবিজ্ঞানের দিকে পূর্ণ ঝোঁক—যেমন "কাব্যিক ভাষা-মনন", "সাবেগ সম্পর্ক" ইত্যাদি। যাইহোক, আমাদের পক্ষে এগুলি আঁকড়ে পড়ে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই; রূপবাদীরা তাঁদের পরবর্তীকালীন বিশ্লেষণে এই ধরনের মনোবিজ্ঞানবাদকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করতে পেরেছেন।

তা' সত্ত্বেও Iakubinskii-র বিশ্লেষণ পদ্ধতির অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে—সেটা হল, তিনি ধ্বনি ও অর্থের আন্তঃসম্পর্কের ব্যাপারটা শিল্পকর্মের স্তরে বিচার না করে ভাষার স্তরে বিচার করেছেন। কাজেই তাঁর মতে, ধ্বনি ও অর্থের আন্তঃসম্পর্ক ভাষার নিজস্ব উপাদান থেকেই বুঝতে হবে। পৃথক পৃথক শব্দ বা অঙ্গবাক্যকে বিশুদ্ধ ভাষাতাত্ত্বিক একক হিসাবে ধরে নিয়েই বুঝতে হবে, ইত্যাদি। এর ফলে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছই যে ধ্বনি ও অর্থ ভাষার মধ্যে পরস্পরের পরিপূরক এবং তাদের মধ্যে একটা স্থায়ী এবং এমনকি নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ সম্ভব, এবং উদাহরণস্বরূপ স্বরধ্বনিগুলোতে যে আবেগের সঙ্গে রঙ চড়ানো হয়, তা' ও একটা সম্ভাব্য নিরবচ্ছিন্নতা।

যদি এইরকম একটা নিরবচ্ছিন্ন সাবেগ রঙ্গন সম্ভব হয়, তাহলে ভাষার মধ্যেই ধ্বনি ও অর্থের নিরন্তর যোগাযোগ সম্ভব। Iakubinskii এবং OPOIAZ-এর অন্যান্য সদস্যের মতে ভাষার মধ্যেই একটি শব্দে ধ্বনির সঙ্গে বস্তুর সম্পর্ক থাকে: শব্দের মধ্যে ধ্বনি, অঙ্গবাক্যের মধ্যে ধ্বনি, এবং আরও এইরকম।

কিন্তু সমস্যাটির এই ধরনের বর্ণনা, অর্থ ও ধ্বনির মধ্যে যোগাযোগ সম্পর্কে একটা উদ্ভট কল্পনা। এই কল্পনা সমস্যাটির সঠিক সমাধানে পৌঁছবার পক্ষে বিরাট বিঘ্নস্বরূপ এবং এটি সম্পর্কে মোহমুক্তি বেশ সময়সাপেক্ষ। ধ্বনি ও অর্থের যোগাযোগের কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

যাইহোক, এ সমস্ত কথা কবিতায় ধ্বনির গঠনগত অর্থ-সংক্রান্ত সমস্যাটিকে স্পর্শও করে না। ধ্বনি অর্থের সঙ্গে একটা গঠনগত আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে থাকে; রচনাটি থেকে স্বতন্ত্রভাবে নেওয়া অর্থাৎ ভাষার কোনো বৈশিষ্ট্য হিসাবে নেওয়া শব্দ বা অঙ্গবাক্য বা অন্য কোনো উপাদানে থাকে না। কিন্তু বাক্যে এটিকে পূর্ণ হিসাবেই নেওয়া হয়। নিরন্তর যোগাযোগের বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না, কারণ কাব্যকর্ম স্বভাবতই অদ্বিতীয় ও অপুনরুল্লেখনীয়, এবং এর সুসংহত স্বকীয় কাব্যিক ভাবমূর্তিও অদ্বিতীয়। কেবল ঐ বিভিন্ন স্বকীয় ঐক্য-র মধ্যে যোগাযোগের বিষয়ে কথা বলা যেতে পারে। ফলে, যোগাযোগ নিজেই স্বকীয় ও অপুনরুল্লেখনীয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কাব্যিক গঠনায় ধ্বনি শুধু একটা শব্দ বা অঙ্গবাক্য বা সময়ের উপাদান নয়—সময় সাধারণত ভাষার সময়—, সমগ্র কাব্যের অপুনরুল্লেখনীয় ধ্বনিতাত্ত্বিক ঐক্য'ও উপাদান, এবং এটা ঠিক-যেন অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে গঠনগত আন্তঃসম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত।

প্রতিটি নির্দিষ্ট বাক্ একটি সুসংহত ও একক ধ্বনিতাত্ত্বিক ঐক্য। বৈজ্ঞানিক বর্ণনায় এবং নির্দিষ্ট কিছু সাহিত্যকর্মে বা উদাহরণস্বরূপ কয়েকপ্রকার উপন্যাসে প্রধান উপকরণ যে উচ্চারিত ভাষার ধ্বনি, তার কোনো শৈল্পিক বিস্তৃতি ঘটে না এবং তা কখনই কাব্যিক গঠনার মধ্যে প্রবেশ করে না। এখানে শব্দ, অঙ্গবাক্য ইত্যাদির প্রত্যেকটি ধ্বনি—ধ্বনি হিসাবেই ব্যাখ্যাত হয় অর্থাৎ এখানে অর্থবোধের জন্য একটি ধ্বনির ভূমিকা, "ভাষার একটি চিহ্নের" সহায়ক হিসাবে।[৩]

অন্যান্য কাব্যকর্মে, যেমন গীতিকবিতায়, সমগ্র কাব্যের ধ্বনি-সত্তা স্বতন্ত্র শৈল্পিক বিস্তৃতি পায় এবং গঠনগত তাৎপর্য লাভ করে। ছন্দ, স্তবক-সজ্জা, অন্ত্যমিল এবং ধ্বনির দ্বিত্ব—এগুলো সবই সেই ধ্বনি-সত্তার বিস্তৃতিরই প্রকাশ। এদের গঠনগত অর্থ কেবল সমগ্র কাব্যের মধ্যেই ধরা যায়, কারণ তারা ভাঙ্গে এবং যেন বিভিন্ন পথে সমগ্র ধ্বনি-সত্তাকে নিয়ন্ত্রিত করে।

তাদের উদ্দেশ্য থাকে বস্তুগত ঐক্যের ছবিটিকে রূপ দেওয়ার এবং সমগ্র কাব্যের ধ্বনি-সত্তার সুসংবদ্ধ প্রকৃতিকে তুলে ধরার। এই সমগ্রতা সংগঠিত হয় যথাসময়ে ও যথাস্থানে, বিশেষত যদি এটা একটা বিশাল ব্যাপ্তি নিয়ে সৃষ্ট বিশেষ কোনো কাব্যকর্ম হয়। অর্থ—তার গঠনসমভিব্যাহারে—এই বস্তুগত সামূহিকতার দিকে ঝোঁকে, এর সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক নিয়ে গড়ে ওঠে ও বেড়ে ওঠে। এই কারণেই এক ছাড়া অপরকে বোঝা যায় না। কেবল গঠনের ঐক্যেই, উপাদান-গুলির একটি হিসাবে-ধ্বনি হয়ে ওঠে কাব্যিক ধ্বনি, অর্থ হয়ে ওঠে কাব্যিক অর্থ ; তাদের আন্তঃসম্পর্ক কোনো হঠাৎ ঘটা ঘটনা নয়—বরং এটা তাদের গঠনগত আন্তঃসম্পর্ক। ভাষার নিজের মধ্যে এদের একটিও নেই—এবং মোটের উপর উচ্চারণ-সংগঠনা থেকে তাদের আলাদা করে নেওয়া হয়েছে।

কাব্যিক ধ্বনি সংক্রান্ত সমস্যাটিকে এভাবেই বর্ণনা করতে হবে।

যাইহোক, এই সমস্যাটির ক্ষেত্রে রূপবাদের যে একটা সদর্থক অবদান রয়েছে, সেটাও এখানে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। যদিও রূপবাদীরা ভুলপথে চালিত ছিলেন, তবু তাঁরা সাহিত্যের ধ্বনি-সংগঠনের[৪] যথাযথ অধ্যয়নের কাজটিকে বিস্তৃত ও গভীরতর করেছিলেন। যে ধ্বনিদ্বিত্ব, পূর্বে যেমন অনুমান করা হয়েছিল তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণে ঘটে—সেই ধ্বনিদ্বিত্ব সম্বন্ধে তাঁদের দেওয়া তথ্য নিঃসন্দেহে এক বড় প্রাপ্তি। এটা সত্যি যে সে ব্যাপারটা কেবল কয়েকটি বাহ্য বৈশিষ্ট্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল—যে বাহ্য বৈশিষ্ট্যগুলি অনেকসময় দ্ব্যর্থক বা অস্পষ্ট। তাদের অর্থ স্পষ্টতর করার জন্য প্রকৃত কোনো চেষ্টা ছিল না। তথাপি, বৈশিষ্ট্যগুলি এবং তৎসংক্রান্ত সমস্যাগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছিল এবং সেগুলিকে গবেষণাভিত্তিক অধ্যয়নের জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়েছিল।

ধ্বনির গঠনগত অর্থ-সংক্রান্ত সমস্যাটির সঠিক সূত্রায়ণের জন্য সমস্যাটির আর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিক মনে রাখা দরকার।

আমরা দেখেছি যে কাব্যের ধ্বনি-সত্তা যথার্থ কাল ও স্থানের মধ্যে সংগঠিত। এখন এটা অবশ্য উল্লেখ করতে হবে যে এই কাল ও স্থানের আধার হল সমাজ। এরা সামাজিক সংসর্গের পরিণাম।

সাহিত্য প্রাকৃতিক নয়, সামাজিক সত্যের অংশ। এর আকৃতিগত স্বরূপ নিয়ে কিছু বলার নেই। এটা আকৃতিবিশিষ্ট ধ্বনি নয় অথবা শিল্পনৈপুণ্যে সংগঠিত ভাষা ও বোধের মনো-আকৃতিগত আচরণ নয়। যেটা এখানে সংগঠিত, সেটা হল সামাজিকভাবে অর্থবান ধ্বনি, সামাজিক সংসর্গের আদর্শগত রূপ। স্বকীয় সংগঠন বা প্রাকৃতিক বন্ধনের মধ্যে থেকে ধ্বনিকে বোঝা যায় না।

কাজেই, অর্থবান ধ্বনি এবং তার সংগঠনের সমস্যা,—সমাজবদ্ধ শ্রোতার সমস্যা, বক্তা ও শ্রোতার মধ্যেকার পারস্পরিক সংগঠনের সমস্যা এবং তাদের মধ্যেকার শ্রেণীগত বৈষম্যের সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অর্থবান ধ্বনির ধ্বনি আলাদা, কারণ সেটা নির্ভর করে লোকের সামাজিক আদান-প্রদানের প্রকৃতির উপর—যেখানে নির্দিষ্ট ধ্বনিটি একটি উপাদান। অর্থবান ধ্বনি ও তার সংগঠনের প্রতি সমাজবদ্ধ শ্রোতার গঠনমূলক ভূমিকা থাকে।

রূপবাদীরা অর্থবান ধ্বনির সমাজতত্ত্বের দ্বারা উপস্থাপিত এই সমস্যাপুঞ্জের দিকে দৃষ্টি দেন নি। তাঁরা ভাষার শব্দের দ্বিমুখী ভূমিকা—অর্থাৎ শব্দকে "উৎপাদনের উপকরণ" এবং সাহিত্যের শব্দকে "স্বমূল্য শব্দ"(Samovitoe Slovo) হিসাবে তুলনা করতে গিয়ে পরবর্তী শ্রেণীটিকে স্বকীয় ব্যবহারের বিষয় করেছেন। তাঁদের দেওয়া উদাহরণের গরিষ্ঠ অংশেই ধ্বনিকল্পকে কেবল স্বকীয়ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ধ্বনি--কল্পকে যে-কোনো সংসর্গের ঊর্ধ্বে এবং উচ্চারণাঙ্গ ও শ্রবণাঙ্গ-এর অনুভূতির আওতায় বন্দী রাখা হয়েছে, অর্থাৎ স্বকীয় সংগঠনের মধ্যে প্রেয়োবাদীদের মত সুসজ্জিত (hedonistically embellished) করে রাখা হয়েছে।

Shklovskii-র বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য : অর্থহীন "বোধাতীত শব্দ" উপভোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে ভাষার উচ্চারণের দিকটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। এমন কি সাধারণভাবে এটাও হয়ত সত্যি যে কবিতায় পাওয়া এই আনন্দের বড় অংশই উচ্চারণে অর্থাৎ বাগঙ্গগুলির রকমারি চালনায় খুঁজে পাওয়া যায়।"[৫]

সবচেয়ে সরল শৈল্পিক প্রেয়োবাদের এটা একটা পেশা। Shklovskii কাব্যিক ধ্বনির প্রকৃত চরিত্রকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করেছেন। ধ্বনি—সংগঠনের মধ্যে নেই, প্রকৃতিতেও নেই ; তা' আছে সমাজবদ্ধ মানুষের মধ্যে। এই সংগঠনের সুনির্দিষ্ট অবস্থার বাইরে একে বোঝা যায় না।[৬]

সুতরাং, সাহিত্যের ধ্বনি-সত্তার সংগঠনের চর্চাকে, কার্যে রূপায়ণকারী সংগঠিত সামাজিক সংসর্গ থেকে আলাদা করে নেওয়া যায় না।

সার ১) শুধু কাব্যিক ভাষা নয়, শিল্পকর্ম বা আরও প্রারম্ভিক কাব্যিক ভাষাই সত্যকার বাস্তবতা, যেটা সাহিত্যের ধারণার সঙ্গে মিলে যায়। কাব্যিক ভাষা কেবল রূপবাদীদের বাস্তবতা থেকে দূরেই সরিয়ে দেয়। সাহিত্যতত্ত্বের লক্ষ্যই হল এই শিল্প-কর্মের নির্মাণে অবদান যোগানো।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

২) সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে সাহিত্যের সঙ্গে ভিন্ন-লিখনের তুলনা করা যেতে পারে এবং তা' করা উচিত, কিন্তু এই তুলনা প্রতিযোগিতামূলক হওয়া উচিত নয় এবং তুলনাটা সর্বদা সাহিত্যের সদর্থক উপাদানের নিদর্শন যোগে হওয়া উচিত।

৩) সাহিত্যকে কেবল বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র এবং অন্যান্য সৃষ্টির মত আদর্শবাদী সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে খুঁটিনাটি তুলনার কোনো যৌক্তিকতা নেই—কোনো দ্বন্দ্বমূলক তফাতের উল্লেখও অনাবশ্যক। সাহিত্যের সঙ্গে অন্যান্য আদর্শভিত্তিক ক্ষেত্রের প্রকৃত ও সক্রিয় মেলামেশা দেখা যায়, কিন্তু দৈনন্দিন ভাষার সঙ্গে তার যোগ সবচেয়ে ক্ষীণ। বিরল এবং ক্ষয়িষ্ণু সাহিত্য-আন্দোলনে সাহিত্যের ভাষা ও দৈনন্দিন ভাষার মধ্যে যোগাযোগই কেবল শক্তিশালী।

৪) সাহিত্য-আন্দোলনের অলৌকিক ক্ষেত্রে ফিউচারিজম্ সবচেয়ে সংকীর্ণ ও অকিঞ্চিৎকর বলে বিবেচনা করা হয়েছিল। সাধারণভাবে, নীতিশাস্ত্র ও জ্ঞানতত্ত্বের সমস্যাগুলির সূত্রায়ণ এবং আদর্শবাদী ক্ষেত্রগুলির অত্যাবশ্যক এবং ভাবগম্ভীর অবস্থাগুলির সূত্রায়ণ অজানা ছিল। উপযুক্ত মাত্রার সাহিত্য আন্দোলনের মত না হয়ে ফিউচারিজম-এর বর্তমানের সুগভীর আদর্শগত সংঘাতের থেকে দূরে সরেছিল। ফিউচারিজম ছিল একটা শখের আন্দোলন (অন্তত: বিপ্লব-পূর্ব যুগে) এবং এটা ফিলিস্তিন দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসারী ছিল; দৈনন্দিন ভাষার উপর নির্ভরশীল ছিল এবং সব বাদ দিলেও, এটি বুর্জোয়াদের পাতি ব্যবসাদারী যুক্তিকে বাইরে টেনে এনে তাদেরকে এর গোলকধাঁধার মধ্যে ফেলে চমকে দেবার চেষ্টা করেছিল। রূপবাদের যে ফিউচারিজম-এর প্রতি একতরফা সমর্থন ছিল তা' এর দৈনন্দিন ও কাব্যিক ভাষার তুলনা-পদ্ধতি থেকেই বোঝা যায়। ফিউচারিস্ট সাহিত্যতত্ত্বের প্রভাবে পড়েই রূপবাদ একপেশে ও অত্যুগ্র ধরনের তুলনা করত—এটা লক্ষ্য করা গেছে।

অনুবাদ : তরুণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

পাদটীকা

1) Iakubinskii's article 'O zvukah stikhotvornogo iazyka', Poetica (1919).
2) Ibid, p, 49.
3) Of Course, here too the phonetic whole is somehow regulated beyond its purely signifying meaning, Absolute disregard of this is not permissible. But we need not develop the point here.
4) Osip Brik, Zvukovye povtory [Sound Repetitions] in Poetika (1919)
5) Shklovskii, Poetika (1919).
6) The present discussion leaves aside a series of problems connected with poetic sound. It goes without saying that a loud sound which is heard is not always organized, and a sound which is pronounced and articulated can be organized. Finally, it is possible to organize the phonetic and articulatory possibitities of sound without intending to realise them. All of these points are very complicated and as tightly bound to the problem of the artistic audience as they are to the problem of social interaction. We have also not examined the problem of expressive intonation, which is conditioned by the nonrepeatable, unique meaning of the utteranee, as distinct from syntactic intonation or intonation in general.

Albert J. Wehrle-এর ইংরেজি অনুবাদ থেকে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মিখায়েল বাখ্‌তিন (১৮৯৬—১৯৭৫) রুশ সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্যতত্ত্বের নেতৃত্বস্থানীয় সাহিত্যতত্ত্ববিদ। বাখ্‌তিন গোষ্ঠী (School বা Circle) নিয়ে গত কুড়ি বছর সোভিয়েট দেশ থেকে আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ, জাপানে অসংখ্য আলোচনা, গ্রন্থ, অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আজকের উপন্যাসের সাহিত্যতত্ত্ব জানতে হলে বাখ্‌তিনের সাহিত্যতত্ত্বের অনুশীলন অপরিহার্য। বাখ্‌তিন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে লেনিনগ্রাদের কাছে পিটারহোফ কমিউনে বসবাস করতেন। বেলো রাশিয়ার ভিটেবস্ক (Vitebsk) শহরে পাভেল মেদভেদেভ (১৮৯১—১৯৩৮) ভলোসিনভ এঁদের দুজনের সঙ্গে আলাপ হয়, এঁরা দুজন এবং পুম্পেনস্কি বাখ্‌তিন গোষ্ঠীর সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং প্রবন্ধগুলিও বাখ্‌তিনের নামে ছাপা না হয়ে সমবেত গোষ্ঠীকর্মের সূত্রে মেদভেদেভ বা ভলোসিনভ এর নামে ছাপা হত। পরে ৬ বছর বাখ্‌তিন কাস্তানি শহরে ছিলেন। ১৯৩৬ থেকে Pedagogical Institute, Saranskএ অধ্যাপনা করেছেন। ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় মস্কোর কাছাকাছি অঞ্চলে কয়েকটি স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন। ১৯৩৮ এ অস্থিসংক্রান্ত অসুখের জন্য তাঁর একটি পা কেটে বাদ দিতে হয় ঐ সময় তিনি Rabelais বিষয়ক গ্রন্থটি রচনা করছিলেন। দস্তয়েভস্কি সংক্রান্ত বইটির প্রথম খসড়া তার কিছুকাল আগে লেখা শেষ হয়। ১৯৪৫ এ আবার Saransk এ ফিরে আসেন এবং ১৯৫৭ সালে Pedagogical Institute বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষিত হ'লে বাখ্‌তিন রুশ ও বিদেশী সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৯৬১তে অবসর পর্যন্ত ঐ পদে ছিলেন। বাখ্‌তিনের ইংরিজি অনুবাদ: **The Formal Method in Literary Scholarship** (A Critical Introduction To Socilogical Poetics) The John Hopkins University Press, Baltimore & London, 1978) বাংলা অনুবাদ অংশত এই গ্রন্থটি অবলম্বনে। মূল গ্রন্থ Formal'nyi metod V literaturovedenii (Kriticheskoe Vvedenie V Sotsiologicheskuill Poetiku) Leningrad : Priboi, 1928, এখন পাওয়া যায় না। অন্যান্য ইংরিজি অনুবাদ **Problems of Dostoevskii's Poetics** (Ann Arbor, 1973), **Rabelis and His World.** (Cambridge, Mass., & London 1968), **The Dialogic Imagination : Four Essays** (Texas Uuiversity Press, Austin, 1981). বাখ্‌তিন সম্পর্কিত গ্রন্থ: Tzvetan Todorov, Mikhail Bakhtin : **The Dialogical Principle** (University of Minnesota Press) ফরাসী থেকে অনুবাদ। Katerinea Clerk & Michael Holquist, **Mikhail Bakhtin** (Harvard University Press, Canb)। পত্রিকা **Critical Inquiry**, 1983, V. 10, No 2, p.p. 225—319, ইত্যাদি। বাখ্‌তিনের এই প্রবন্ধাংশে সমাজতাত্ত্বিক বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রূপবাদীদের গঠনমূলক সমালোচনা করা হয়েছে। আধুনিক সাহিত্যতত্ত্বের Intertextuality-তত্ত্বটির সূত্রপাত বাখ্‌তিন থেকেই। বাংলা ভাষায় বাখ্‌তিনের সম্ভবত এটাই প্রথম অনুবাদ।

—সম্পাদক

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সংকলনে ব্যবহৃত ভাষাবিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দের সংজ্ঞা

—প্রবাল দাশগুপ্ত

অঙ্গকল্প ঃ (বা কারো কারো প্রয়োগে রূপকল্প) হ'ল কোনো একটা ভাষায় কোনো অর্থবহ পদাংশের (শব্দের, ধাতুর, কিংবা প্রত্যয়ের) সেই মানসিক এক রূপ যার একাধিক বিকল্প শরীর বাস্তবে দেখা গেলেও সেই বিকল্পবাহুল্যের মায়াকে অঙ্গকল্পের মানসিক একতা সামলে রাখে। ইংরিজি ঃ Morpheme। অঙ্গকল্পের উদাহরণ হিসেবে তিনটি বিকল্পরূপ উল্লেখ করা যায়—(১) 'তুমি' (যখন কথাটি এককভাবে প্রতিষ্ঠিত) (২) 'তোমা' (যখন শব্দাংশটি 'কে' অথবা 'র' আগে থাকে—'তোমাকে', 'তোমার') (৩) 'তোম' (যখন শব্দাংশটি 'রা'-র আগে থাকে—'তোমরা')

কথন ঃ (বা কারো কারো প্রয়োগে **বলন**) ভাষার তন্ত্র বা 'ভাষা' (ফরাসী লাঁগ Langue) থেকে তার বাস্তবিক প্রয়োগ বা 'কথন' কে (ফরাসী পারোল Parole) সুইস ভাষাবিজ্ঞানী ফেয়ারদিনাঁ দ্য সোস্যুর আলাদা করে চিনতে শিখিয়েছিলেন আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের জন্মলগ্নে। কথনকে ইংরিজিতে Parole-ই বলে (আদতে ফরাসী শব্দ)।

উক্তি ঃ মানে একজনের এক পশলা কথা বলা বা লেখা। উক্তি প্রায়ই বাক্য; কিন্তু 'কীরে, তুই ?!' বলে হেঁকে উঠলে সেই হাঁক বাক্য না হয়েও উক্তি বলে গণ্য, তা ছাড়া 'আজ আমি ভাল নেই'-এর মতো বাক্য স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন উক্তি হয়ে গিয়ে বিভিন্ন অর্থ বহন করে—এইসব কারণে তফাত করি বাক্যে (Sentence) আর উক্তি (Utterance)-এ দুয়ের মধ্যে।

বচন ঃ দৈনন্দিন কথাবার্তার ঘটনাকে এবং তার ভেতরে ভাষার যে আটপৌরে প্রয়োগতন্ত্র ক্রিয়াশীল সেটাকে 'বচন' নাম দিয়ে যুগপদ পদ্য থেকে আর লিখিত গদ্য থেকে আলাদা করেছেন শিশিরকুমার দাশ। ইংরিজি ঃ Speech।

ধ্বনিকল্প ঃ হ'ল কোনো একটা ভাষায় কোনো স্বর অথবা ব্যঞ্জন ধ্বনির সেই মানসিক এক রূপ যার একাধিক বিকল্প শরীর বাস্তবে দেখা গেলেও সেই বিকল্প বাহুল্যের মায়াকে ধ্বনিকল্পের মানসিক একতা সামলে রাখে। ইংরিজি ঃ Phoneme। ধ্বনিকল্প-এই ক্ষেত্রে আমরা 'ন' ধ্বনিকল্পটির কয়েকটি বিকল্পরূপ আলোচনা করতে পারি—(১) সামান্য দন্ত্যরূপ—'বন্দর' (২) সামান্য মূর্ধণ্যরূপ—'ভণ্ড' (৩) সামান্য তালব্যরূপ—'পাঞ্জাব'

বিবৃতি ঃ শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয় 'স্বরন্যাসে'র সংজ্ঞার্থের নির্দেশ। এর ইংরিজি Statement—প্রশ্ন বা অনুরোধ থেকে আলাদা। বিবৃতিকে সত্য বা মিথ্যা বলা চলে, এ তার একটা বৈশিষ্ট্য।

রেখাগত আকল্প ঃ রেখাদের জ্যামিতিক সমবায়ে রচিত চেহারা বা সংকলিত রূপ। ইংরিজি Graphic Design / Pattern।

স্বরন্যাস ঃ 'রাম আসবে।' এই বিবৃতির সঙ্গে 'রাম আসবে?' এই প্রশ্নের তফাত কথা বলার সময়ে যে সুরের তারতম্যে প্রকাশ পায়, বাক্যে কথার সুর ওঠা-নামার সেই বিন্যাসকে বলব এক একটা বাক্যের বিশিষ্ট স্বরন্যাস। ইংরিজি ঃ Intonation।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Seme : According to Coseriu (1967), semes are the minimal distinctive features of meaning that are operative within a single lexical field, and they serve to structure the field in terms of various kinds of opposition (Coseriu & Geckeler, 1974 : 149).

Classemes :- Classemes, in contrast with semes, are very general sense-components that are common to lexemes belonging to several different lexical fields ; and they tend to be, not only lexialised, but also grammaticalized (ibid, 152). e.g. ANIMATE/INANIMATE, CAUSE/HAVE, MALE/FEMALE.

Enthymeme : An argument (syllogism) or formulated conclusion in which a premlse is understood but not stated, whether in reasoning, advertising or humor, (David Grambs, 1984. *Literary Companion Dictionary* : Words about Words London : Routledge & Kegan Paul. 113.)

Entropy : In physics, it is the name given to one of the quantitative elements which determine the thermodynamic condition of a portion of matter. In use, since 1868, because of Clausius's (1965) work. Dretske, Fred I, 1981. *Knowledge and the flow of Information*. Oxford : Basil Blackwell. pp 1—11. Dretske refers to the quantity of information *I(s)* as the average amount of information' generated at the source *s*. In the technical literature on information theory, this quantity is also referred to as the *entropy* of the source. In fact, *any* situation may be regarded as a source of information. Communication theoryis not directly concerned with the amount of information associated with the occurrence of a specific event or signal. It deals with sources rather than with particular messages. "If different messages contain different amounts of information," says George A. Miller (1953 : 'what is information measurement ?' *The American Psychologist*, Vol 8, pp 2.), "then it is reasonable to talk about

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
the average amount of information per message we can expect to get from the source—the average for all the different messages the source may select." Actually, a communication system must face the problem of handling any message that the source can produce. Warren Weaver (1949 ; 'Recent contributions to the mathematical theory of communication, in Shannon & Weaver's *The Mathematical Theory of Communication*. U. of Illinois Press, Urbana. pp 14) says : "If it is not possible or practicable to design a system that can handle everything perfectly, then the system should be designed to handle well the jobs it is most likely to be asked to do···this sort of consideration leads at once to the necessity of characterizing the statistical nature of the whole ensemble of messages which a given kind of source can and will produce." The concept of *entropy or average information* (says Dretske), as used in communication theory, does just this.

Isotopy : In Chemistry, in use since 1913, it refers to a chemical element possessing the same chemical character as another element occupying the same place in the periodic table, but distinguished from it by other ways. (In physics, Istropy means exhibition of equal physical properties or actions in all directions. Since 1864 in use.)

Culler(1975 : 79—83) says that the repetition of semes leads to the formation of classemes, and the repetition of classemos in a text enables the reader to identify a level of coherence or an 'isotopy' which unifies it. Greimas, (A. J. 1966, *Semantique Structurale*. Larousse, Paris. pp 90) says that it is extremely important for a theory of discourse to be able to account for readers abilities to choose among alternative readings and establish levels of coherence, but the process involves some rather complex notions of *vraisemblance* and appropriateness. He wrote there that "the need for a cultural grid to resolve difficulties concerning the discovery of isotopies···calls in to question the very possibility of objective semantic analysis··· in the present state of knowledge it is difficult to imagine such a grid which would meet the requirements of a mechanical analysis "and hence a lot of description is dependent on the

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
subjective decisions of the analyst. Isotopies cannot be automatically identified by noting the repetitions of classemes. After identifying the various isotopies of a text, one can in theory divide a text into its isotopic strata. Greimas has identified the basic isotopies—'the practical' which is the manifestation of the 'cosmological' or the outer world, and the 'mythic,' which concerns the 'noological' or inner world. "The principal difficulty of reading consists in discovering the isotopy of the text and in remaining at that level".

References :

1. Coseriu, E. 1967. "Lexicalische Solidaritaten." Poetica I : 290—303
2. Coseriu, E. & H. Geckeler, 1974. 'Linguistics and semantics'. In Sebeot, I. A., ed Current Trends in Linguistics, 12 : 103—71.
3. Grambs, David. 1984. Literary Companion Dictionary : Words about Words. London : Routledge & Kegan Paul.
4. Culler. Jonathan, 1983. On deconstruction : Theory and criticism after Structuralism. London : Routledge & Kegan Paul.
5. — 1951. Pursuit of signs, Semiotics, literature, deconstruction, ibid.
6. — 1975. Structuralist Poetics. Structuralism, Linguistics and the Study of Literature. New York : Cornell University Press.

সংকলক ঃ উদয় নারায়ণ সিংহ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিমলকৃষ্ণ মতিলাল ঃ জন্ম ১৯৩৫, জয়নগর-মজিলপুর। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক এবং কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির অতিথি অধ্যাপক। উল্লেখ্য গ্রন্থ—The Navyanyaya Doctrine of Negation (Harvard University Press) ; Logic, Language & Reality (Delhi, 1985) ; Perception (Oxford University Press 1986)

শিশিরকুমার দাশ ঃ জন্ম ১৯৩৬। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাবিজ্ঞানে ডক্টরেট। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাবিজ্ঞানে পোস্ট ডক্টরাল ফেলো। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের প্রধান—রবীন্দ্র অধ্যাপক। ১৯৭৬এ রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত। উল্লেখ্য গ্রন্থ—বাংলা ছোটগল্প (১৯৬৩, ২য় সং ১৯৮১), বিতর্কিত অতিথি (১৯৮৫) গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব (১৯৮৫) Early Bengali Prose (১৯৬৬), The Shadow of the Cross (১৯৭৪), The Artist in Chains (১৯৮৪) ভাষা জিজ্ঞাসা (প্রকাশিতব্য)। আরিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব (১৯৭) এউরিপিদেশ, সেফোক্লিশের বঙ্গানুবাদ। কাব্যগ্রন্থ : অবলুপ্ত চতুর্থ চরণ' (১৯৮৬)।

পবিত্র সরকার ঃ জন্ম ১৯৩৭। কলকাতা এবং শিকাগোয় সাহিত্য এবং ভাষাবিজ্ঞান পড়েছেন, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। উল্লেখ্য গ্রন্থ ঃ গদ্যরীতি পদ্যরীতি, ভাষা দেশ কাল।

প্রবাল দাশগুপ্ত : জন্ম ১৯৫৩। কলকাতা এবং নিউ ইয়র্কে ভাষাবিজ্ঞান নিয়ে পড়েছেন। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট। কিছুদিন মেলবোর্ণ এর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়ে এখন পুণার ডেকান কলেজের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের রীডার। Indian Linguistics পত্রিকার সম্পাদক। ১৯৮৬-তে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কেরিয়ার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন রবীন্দ্র ভাষা বিষয়ে উচ্চতর গবেষণার জন্য। গাঙ্গেয়পত্র, লালনক্ষত্র, বারোমাস, জিজ্ঞাসা প্রভৃতি পত্রিকায় বহু নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিতব্য গ্রন্থ 'কথার ক্রিয়া ও কর্ম'।

মৃণাল নাথ ঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বে পি. এইচ. ডি.। কিছু দিন বরোদা এম এস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে এখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। সম্পাদিত পত্রিকা : ভাষা।

উদয় নারায়ণ সিংহ ঃ জন্ম ১৯৫১। কলকাতা ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাবিজ্ঞান নিয়ে পড়েছেন, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট। বর্তমানে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের Advanced Institute In Language Planning এর ডিরেক্টর। সম্পাদিত পত্রিকা ; গাঙ্গেয় পত্র। প্রকাশিত গ্রন্থ Diglossia And Language Planning (জ্ঞানভারতী, কলকাতা, ১৯৮৩) অধ্যাপক মনিরুজ্জমানের সঙ্গে যৌথভাবে। গাঙ্গেয় পত্র, পাহড়তলী, লালনক্ষত্রে সাহিত্য ও ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। মৈথিলী ভাষায় একাধিক কাব্য ও নাট্যগ্রন্থ, ইংরিজি ও হিন্দি ভাষায় অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

অমিতাভ গুপ্ত ঃ জন্ম ১৯৪৭। ইংরিজি ভাষার অধ্যাপক। প্রকাশিত কাব্য-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গ্রন্থ—আলো, এসো আমার ঘরে, ঝরা মানুষের কবিতা, মাতা ও মৃত্তিকা খরা ও যমুনা। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় গল্প ও নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

অঞ্জন সেন ঃ জন্ম ১৯৫১। আইন ও বাণিজ্য নিয়ে পড়েছিলেন। পেশা বেসরকারী সংস্থায় চাকরি। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'কথাবার্তা' (১৯৭৪), 'পাঠ / ভারতবর্ষ' (১৯৮১)। সম্পাদিত পত্রিকা : গাঙ্গেয় পত্র, দুই বাংলার কবিতা, প্রতিধ্বনি/WIDERHALL।

য়ুরি লোৎমন Jurij (বা Yuri) Lotman ঃ রুশ দেশের এস্তুনিয়ার তার্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের রুশ সাহিত্যের অধ্যাপক। রুশ ভাষায় The Structure of the Artistic Text গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়া মাত্রই সাহিত্যতত্ত্ববিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং আলোচনা অনুবাদ শুরু হয় জার্মান, ফরাসী ও ইংরিজি ভাষায়। ইউরোপ ও আমেরিকার সাহিত্যতত্ত্ববিদরা অধ্যাপক লোৎমনের গবেষণা-কর্মগুলির অত্যন্ত উচ্চমূল্যায়ণ করেছেন। ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রেও লোৎমনের সাহিত্যতত্ত্ব বিশেষভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। অন্যান্য রুশ গ্রন্থের ইংরিজি অনুবাদ Analysis of Poetic Text (Ann Arbor, Michigan, 1976). The Semiotics Cinema (ঐ, 1976) The Semiotics of Russian Culture, বরিস উসপেনস্কির সঙ্গে যৌথভাবে (ঐ, 1984)। Soviet Semiotics (London, ১৯৭৭) এবং New Literary History পত্রিকার Vol XIV, NO. I 1982-তে লোৎমনের ইংরেজি অনুবাদ পাওয়া যাবে।

ক্লোদ লেভি স্ট্রাউস Claude Le'vi-Strauss ঃ জন্ম ১৯০৮, বেলজিয়াম। কলেজ দ্য ফ্রাঁসের সামাজিক নৃতত্ত্বের অধ্যাপক এবং ফরাসী অকাডেমির সদস্য। নৃতত্ত্বের বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক : উল্লেখ্য গ্রন্থ Anthropologie Structurale (Paris : 1951), Mythologiques (চারটি খণ্ড ১৯৬৭—৭১ এর মধ্যে প্রকাশিত)। ১৯৫৩—৬০ International Council of Social Sciences এর Secretary General ছিলেন। বিশ্বভারতী সহ পৃথিবীর বহু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানিত।

রোমান্ য়াকোবসন Roman Jakobson ঃ বিশ্ববিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী ও সাহিত্যতত্ত্ববিদ। রুশ, চেক, ফরাসী, ইংরাজি প্রভৃতি ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ এবং নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। শেষ জীবনে M. I. T-তে ছিলেন।

আশিস্ রায়চৌধুরী ঃ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের রসায়নবিদ। মূল ফরাসী থেকে কিছু সাহিত্যিক কৃতি অনুবাদ করেছেন।

বীরেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ জন্ম ১৯৪৩। পেশা সরকারি চাকরি। বিভিন্ন পত্রিকায় গল্প এবং প্রবন্ধ লিখে থাকেন।

তরুণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ঃ জন্ম ১৯৫৬। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করছেন। 'ভাষা' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। পেশা সরকারি চাকরি।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar